আমি লুসির উত্তরপুরুষ

আমি লুসির উত্তরপুরুষ

কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

নবার্ক ॥ ডি সি ৯/৪ শাস্ত্রীবাগান, দেশবন্ধুনগর, কলকাতা ৭০০ ০৫৯

প্রকাশক : শ্রী প্রশান্ত মিত্র
নবার্ক। ডি সি ৯/৪ শাস্ত্রীবাগান, পোঃ দেশবন্ধুনগর
কলকাতা ৭০০ ০৫৯

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৭০

মুদ্রক : শ্রী অসীমকুমার সাহা
দি প্যারট প্রেস
৭৬/২ বিধান সরণী (ব্লক কে ১)
কলকাতা ৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদচিত্র : শ্রীমতী স্মিতা রায়

প্রচ্ছদ ব্লক ও মুদ্রণ : শ্রী সৌরীন্দ্র দাশগুপ্ত
রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট
৭/১ বিধান সরণী, কলকাতা ৭০০ ০০৬

মুখবন্ধ

অনেক সময় অনেক বই পড়েই আমি মুগ্ধ হই। সর্বদাই মনে প্রশ্ন জাগে, যাঁরা ইংরেজি এসব বই পড়েন না তাঁরা কতটা বঞ্চিত হচ্ছেন। মানুষের বিবর্তন নিয়ে যখন কিছু পড়ছিলাম আর যখন হঠাৎ পর্দার পর পর্দা আমার কাছে খুলতে শুরু করলো— আমরা কে, আমাদের চিন্তা ভাবনার কোথায় শুরু, আফ্রিকার কোন্ হ্রদের খাতে আমাদের ইতিহাসের গোড়ার কথা— তখন মনে ইচ্ছে যে আমি যদি তথ্য ও তত্ত্ব সাজিয়ে বিনোদনের ভাষায় বাংলায় এর সারাংশ পরিবেষণ করি, হয়তো অনেকেই আমার মতো আনন্দ পাবেন। আমি তাই লিখবার চেষ্টা করছি এমন একটা ভাষায় আর ঢং-এ, যেন কিশোরোর্দ্ধ স্ত্রী-পুরুষ সবাই এর রসগ্রহণ করতে পারেন। আমি কতটা সার্থক হয়েছি তা অবশ্য পাঠক-পাঠিকা বিচার করবেন। তাছাড়াও নায়িকার মন্তব্যে কিছুটা নারীকেন্দ্রিকতাও আমি লিখেছি। মেয়েদের মনে কিছুটা স্বনির্ভরতা সঞ্চারের জন্যে।

কবি শ্রী বিরাম মুখোপাধ্যায়কে যখন লেখাটা দেখিয়েছিলাম, তখন যে উনি সহজেই এর প্রকাশের ভার গ্রহণ করলেন, তাতে ওঁর মুক্ত মনের পরিচয় পাওয়া গেল। বলাই বাহুল্য, শিল্পের জগত থেকে একটু সরে এসে বিষয়-বৈচিত্র্য ও বিনোদন-বিজ্ঞান প্রকাশেরও যে আজকের ভারতবর্ষে একটি বিশেষ ভূমিকা আছে সেটা হয়তো শ্রী মুখোপাধ্যায় বিচার করেই আমাকে সর্বপ্রকারে উৎসাহিত করেছেন। আমি ওঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

এই বইয়ে ব্যবহৃত কিছু তথ্য, তত্ত্ব, চিত্র ইত্যাদি ব্যবহারের ব্যাপারে মূল প্রকাশক সংস্থাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও সব অনুমোদন হাতে এসে পৌঁছোয় নি। এজন্য আমি সকলের কাছেই ঋণ স্বীকার জানিয়ে কৃতজ্ঞ রইলাম।

শ্রীমতী মমতা চাকী অত্যন্ত যত্ন করে অল্প সময়ের মধ্যে বইটির সম্পূর্ণ প্রুফ দেখে দিয়েছে। তার জন্যে আমার অসীম স্নেহ রইল।

পরিশেষে পাঠক-পাঠিকাদের কাছে নিবেদন কোনো তথ্যে যদি তাঁরা অসংগতি লক্ষ করেন তা অনুগ্রহ করে জানালে পরবর্তী সংস্করণে যথাকর্তব্য সংশোধন করা হবে।

কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

উ ৎ স র্গ

আমার মা
শ্রীমতী উষারাণী চট্টোপাধ্যায়কে

পূর্ব-তরঙ্গ

এতক্ষণ প্লেনটা মাটিতে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ ইঞ্জিনটা আর্তনাদ বাড়িয়ে দিল। আর আমাদের প্লেনটা গমগম করে উঠলো। পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি বেঁকে গিয়ে আমরা আকাশমুখো হলাম। যে-চেয়ারে বসে আছি, মনে হ'ল সেটা থেকে উঠতে গেলে পড়ে যাব। নিচে আলো-অন্ধকারে আব্ছা-আব্ছা একটা বম্বে শহর। বাতির মালা লাইনের পর লাইন। আলোছায়ার সমুদ্রটা দেখতে পেলাম। আর দেখতে পেলাম ঢেউয়ের সারি। ফ্যাকাসে সাদা রঙের একটা আঁকাবাঁকা রেখা।

আমার পাশে এক বর্ষীয়সী ভদ্রমহিলা বসে। বিদেশিনী। আমার দিকে ফিরে হেসে বললেন, "বাড়ির জন্য মন কেমন করছে ?" শুনে আমার মনে পড়ল বাড়ির কথা। কলকাতার ওপারে হাওড়ায় একটা পুরনো দোতলা বাড়ি। একতলাটা তার ঘুপ্সি অন্ধকার। শ্যাওলা-ধরা কেউ বিশেষ থাকে না। দোতলাটা তার খোলামেলা। লম্বা বড় লাল পাথরের বারান্দা। ফাটল-ধরা মেঝে। বড় বড় জোড়া থামের ওপর সবুজ কাঠের ঝিলিমিলি। ঝিলিমিলির ফাঁকে-ফাঁকে চড়ুই পাখির বাসা।

বাড়ির জন্য কী আর মন খারাপ করছে ? সত্যি বলতে কি, বিদেশ-ভ্রমণের আশাতীত সুযোগে আমি কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছি। আমার মতো পুরনো কালের একটা বাড়ির অল্পবয়সী মেয়ে একা-একা বিদেশে চলেছি। আমাদের বাড়িতে আগে আর এরকমটি ঘটে নি। সব মিলিয়ে এমন একটা তাড়াহুড়োর মধ্যে এই ভ্রমণটার আয়োজন হয়েছে যে সময়ই পাওয়া যায় নি। ভাববো কখন ? মন খারাপ করবো কখন।

এখন প্রশ্নটা শুনে মনে হ'ল, মন খারাপ করা উচিত ছিল। আর-কারও জন্য মন খারাপ না করলেও ভাইটি আর ঠামার (ঠাকুরমার) জন্য মন খারাপ করার কারণ ছিল যথেষ্ট।

আসার সময় আমি যখন সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছিলাম ভাইটির হাত

ধরে ঠামা তখন ঠিক সিঁড়ির নিচটাতে দাঁড়িয়ে। আমি প্রণাম করলাম। ঠামা চোখে আঁচল চাপা দিলেন। ভাইটি একটু করুণ হাসলো। আমি পেছন ফিরে চলে এলাম। এতক্ষণ শুধু আনন্দই ছিল। উত্তেজনা ছিল। এখন একটা অপরাধ-বোধের উদয় হ'ল মনে।

প্লেনটা এখন অনেক ওপরে উঠে গিয়েছে। সমান সোজা চলেছি আমরা। আকাশের কোনায় একটু রুপালি মেঘ। তার নিচে একটা ছোট চাঁদ। জলে সেই চাঁদের মলিন ছায়া প্লেনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পিছু-পিছু চলছে। আরব সাগরের তীর ধরে চলতে থাকলাম আমরা। প্লেনের চালক আমাদের কোমরের বেল্ট খুলতে অনুমতি দিলেন। যাঁরা-যাঁরা ধূমপান করেন তাঁরা ধূমপাম করতে পারেন, সে-কথাও জানালেন। ধূমপান শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক বলে প্লেনের শুধু দুই-একটা জায়গাতে বসেই ধূমপান করা চলে।

জীবনে এই প্রথম আমার প্লেন-যাত্রা। অবস্থাপন্ন বাড়ির মেয়ে হলে কী হয়, বেড়াতে যাওয়া মানেই বিরাট-বিরাট বিছানা বাঁধা। বাক্স-ট্রাঙ্কের স্তূপ। গাড়ি ভাড়া করা হয়েছে। কাজের লোক বিছানা-বাক্স বেঁধে তৈরি। রান্নার সরঞ্জাম, হাতা-খুন্তি, কড়া পর্যন্ত। ঠামা, জ্যাঠা-বাবুর মুখে চিন্তার ছায়া। দুটো-তিনটে গাড়ি বোঝাই করে আমরা হাঁপাতে-হাঁপাতে ট্রেন ছাড়ার দু-তিন ঘণ্টা আগে এসে পৌঁছুই স্টেশানে।

এ ছাড়াও আর একরকমের ভ্রমণ আছে আমাদের বাড়িতে। বাবা যখন কাজে যান— দু-চার দিনের জন্য বড়-বড় শহরে যাওয়া। বড়-বড় হোটেলে থাকা। ছোট্ট স্যুটকেস, তাতে শুধু একটা স্যুটের জায়গা। দু-তিনটে জামা-প্যাণ্ট। অফিস থেকে গাড়ি আসে। দমদম বিমান-বন্দরে প্লেন ছাড়ে ভোরে কাক না-ডাকার আগে। সে-সব দিন ঠামা নিজে বাবার জন্য সকালের চা করে দেন। কারণ ঠামার মতো অত দুপুররাত্রে আমাদের বাড়িতে আর কেউ ঘুম থেকে ওঠে না। এমনকি জ্যাঠাবাবুও না।

আগে কাকু তাঁর বন্ধু-বান্ধবরা মিলে হল্লা করতে-করতে এধার-সেধার বেড়াতে যেতেন। একবার মাকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। মা কিছু বলেন নি। কিন্তু ফিরলেন যখন, মুখ দেখেই মনে হয়েছিল অসম্ভব আনন্দ করেছেন মা। যদিও কাকু আর কাকুর বন্ধুরা বলতে থাকলো— মেজবৌদির রান্না অখাদ্য, মুখে দিলে মরা মানুষও লাফিয়ে বেঁচে উঠবে।

আমার পাশের ভদ্রমহিলা নিজের কোমরের বেল্ট খুলে আমাকেও দেখিয়ে দিলেন কী করে বেল্ট খুলতে হয়। আমরা স্বচ্ছন্দ হয়ে বসলাম। প্লেনে এতক্ষণে একটা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। কথাবার্তা হাঁটাচলাও আরম্ভ হয়েছে। ভদ্রমহিলা আমার চেয়ারের হাতলের একটা ছোট যন্ত্র দেখিয়ে বললেন যে, ওটা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে আমি সংগীত শুনতে পারি। স্থেটোসকোপের মতো একটা বস্তু। কানে দিয়ে বোতাম ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শুনলাম কোথাও রবিশঙ্করের সেতার, কোথাও বিদেশী যন্ত্রসংগীত।

ভদ্রমহিলা জিজ্ঞেস করলেন, "প্রথমবার বিদেশে যাচ্ছ?"

প্রশ্নটা শুনে ভাবতে শুরু করলাম। আমার বড়মাসী ক্যানাডার টরেন্টো শহরে থাকেন। মেজোমাসী থাকেন লণ্ডনে। আমার দাহু নেই, দিদা আছেন। তিনি থাকেন বড়মাসীর কাছে। এই মাসের শেষের দিকে দিদার পঁচাত্তর বৎসরে পদার্পণ-দিবস। সবাই মিলে একত্র হবার জন্য বড়মাসী আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। যার-যার মেয়ে এবং স্বামী সহ উপস্থিত থাকার জন্য। আমার মা-র পক্ষে যাওয়া সম্ভব হ'ল না। ব্যাঙ্কের অফিসারদের একটা ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। মাকে সেটার ভার দেওয়া হয়েছে। আয়োজন হয়েছে বিভিন্ন শাখা থেকে বিভিন্ন অফিসারদের আসবার। সুতরাং ট্রেনিংয়ের দিন তারিখ পালটানো এখন আর সম্ভব না। মা আসতে পারলেন না। শুনে বাবাও দু-চারটে ওজর খুঁজে বের করে বললেন, তিনি যাবেন না। বিদেশে যাবার ব্যাপারে বাবার একটা মহা ভয়। প্রসঙ্গত বলেন—"যখন ছাত্র অবস্থায় ওদেশে ছিলাম তখন উচিত শিক্ষা আমার হয়ে গিয়েছে। ভদ্রলোক থাকার মতো ওদেশটা নয়।"

এ-ব্যাপারে মেজোমাসী আর বাবার মধ্যে আমি অনেক বচসা শুনেছি। বাবা বলেন, "দূর! টাকা ছাড়া ওদেশে আছে কী?" মেজো-মাসী বলেন, "যেহেতু তোমার পূর্বপুরুষের সঞ্চিত টাকা আছে তুমি তো একথা বলবেই।" বাবা বলেন, "আসলে তোমরা মেয়েরা একবার ওদেশে গেলে আর ফিরতে চাও না।" মেজোমাসী বললেন, "এ-দেশে মেয়েদের হাল দেখেছো? স্বায়ত্তশাসনের অর্থ কি জানো? শব্দটার অর্থ হচ্ছে আমার জীবন আমি কি ঢং-এ চালাবো সেটা আমার বিবেচনার আয়ত্তাধীন। আমাদের দেশে মেয়েদের কি সেটা আছে?" বাবা বলেন, "কেন তোমার বোনের তো আছে। তবে কি জানো, একসঙ্গে থাকতে

গেলে কিছু তো মিলজুক করে থাকতেই হয়। অফিসেও সবাইকার সঙ্গে মিলজুক করে থাকতে হয় না, সেবেলা ?'' মেজোমাসী বলেন, "আমি তোমার বৌয়ের কথা বলছি না। আমি সাধারণ আর-পাঁচটা মেয়ের কথা বলছি।" বাবা বলেন, "তা তোমাদের মতো প্রগতিশীলারা যদি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান, তো, তাতে এদেশের কোন্ সুবিধাটা হচ্ছে।" মেজোমাসী বলেন, "যে যুদ্ধে জয়ী হতে আরো হাজার বছর কেটে যাবে সেটা আমার যুদ্ধ নয়। তাছাড়া আমি যোদ্ধাও নই। আর যেখানে আমার স্বামী, মেয়ে, সেটাই আমার স্বদেশ।"

এসব সময় সঙ্গে যদি কাকু থাকেন তো তর্ক আরও জমে। কাকু মেজোমাসীকে সমর্থন করে বলেন, "আরে বিদেশে থেকে তোমরা স্বদেশে মদত দিচ্ছ, এটাই তো সব থেকে বড় কথা। তোমরা আমাদের জন্য বিদেশী মুদ্রা অর্জন করছো, আমাদের অর্থনীতিতে সাহায্য করতে শুরু করছো, এটা কি চাট্টিখানি কথা ? তোমাদের অবদান আরও বাড়বে। তোমরা মহৎ কাজ করছো।"

বাবা রেগে যাবেন। বলবেন,—"তুই এখন বিদেশে যাবি বলে ওদের তৈলমর্দন করছিস।"

কাকু বলবে, "তা না। তুমি আসলে একটা অপদার্থ ভারতীয় পুরুষ মানুষ, মা-র আহ্লাদে-ছেলে। হাত পুড়িয়ে রান্না করে খেতে পারতে না। তোমার অভিযোগগুলো ব্যক্তিগত। আমি সেটা ভালোভাবেই জানি।" বাবা রণে ভঙ্গ দিয়ে বলবেন, "তুই যা না। নিজের হাতে কেমন পোলাও কালিয়া রেঁধে খাবি, দেখব। বাপ রে বাপ, কী কষ্টটাই না পেয়েছি। আমি বাবা আর দু'বার যাব না। একবারই পিতৃদত্ত জান্‌টা নিয়ে ফিরতে পেরেছি এই যথেষ্ট।"

আমার মেজোমাসী আর মেজোমেসো ভারি আমুদে লোক। অথচ দু'জনেই বিরাট পণ্ডিত। এখন নাকি মেজোমেসোর নাম জগৎ বিখ্যাত। মেজোমাসীও ফেল্‌না নন।

মেজোমেসোর খ্যাতি মানুষের জন্ম, ইতিহাস উদ্ধার করার ব্যাপারে। আগে-আগে, যখন আমি জন্মাই নি, মেজোমেসো বছরের পর বছর আফ্রিকা মহাদেশে থাকতেন। আমার ছোটবেলাতেও মেজো-মেসোর বেশির ভাগ সময়ই কাটতো ঐ-মহাদেশে। এখন অবশ্য উনি বৎসরে মোটে একবার করে আফ্রিকাতে ধান টহল মারতে।

সে-সময় একবার করে ভারতবর্ষেও ঢুঁ মেরে যান। কোনো কোনো বৎসর সে-সময়ে মেজোমাসীও ভারতবর্ষে আসেন। এখানে এলে ওঁরা ওঠেন আমাদের বাড়িতে। যে-ক'টা দিন থাকেন, আমাদের বাড়িতে একটা উৎসব পড়ে যায় যেন। সারা দিন লোক আসছে। ফোন বাজছে অনবরত। টেলিগ্রাম আসছে ঘন-ঘন। কাগজে, বেতারে নাম বার হচ্ছে। দূরদর্শনের খবরে মেজোমেসোর ছবি দেখানো হয়। মেজোমেসো ফিরছেন স্বদেশে।

মেজোমেসো বলেছিলেন—"দূর! কলকাতাটা আবার কবে থেকে আমার স্বদেশ হ'ল? বিলেতে যাবার আগে এ-শহরটাকে আমি চোখেও দেখি নি। আরে, তখনকার দিনে তোদের এই কলকাতার লোকেরা কি আমাদের মতো বাঙালদের সঙ্গে কথার আদান-প্রদান করতেন? তখনকার কালে পশ্চিমবঙ্গর কী রমরমা! আমাদের গ্রামে বসে আমরা আলাপ-আলোচনা করতাম যে, কলকাতার অন্দরমহলে নিমন্ত্রণ খেয়েছে, এইরকম সৌভাগ্য আমাদের গ্রামে কার কার হয়েছে। যাক্ গে, সেসব দিন চুকে-বুকে গিয়েছে। এখন আর মনে কোনো খেদ নেই। দেশ-ভাগের পর সে যে কী জ্বালা, সে-জ্বালাও ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। ঐ যে-দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা কলকাতা শহরে এসে উঠেছিল, ভাই-বলে কেউ তোরা পশ্চিমবঙ্গের লোক ভালোবাসার হাত বাড়িয়েছিলি তাদের দিকে? এই হতভাগা বাঙালী জাতটা শুধু সেই অভিশাপে আজ এইরকম হতশ্রী।"

মেজোমেসোর জ্বলন্ত চোখ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। বলেন, "কী বলতে কী বলে ফেললাম। আরে যখন জাহাজ নিয়ে সোজা চট্টগ্রাম থেকে লণ্ডন পাড়ি দিলাম, তখন কতটুকু বয়স আমার? আর কী হাঁদা ছিলাম! লণ্ডন শহর দেখে ভয়ে তো আমার চোখ কপালে উঠলো। মনে হ'ল, এক্ষুনি ফিরে যাই আমার সেই ছোট্ট গ্রামখানিতে। আমার প্রফেসার আমাকে দু'চার দিন বাজিয়ে দেখেই সঙ্গে করে নিয়ে চলে গেলেন আফ্রিকাতে। তখন সবে ওখানে বর্ষা নেমেছে। ইথিওপিয়ার বর্ষার সঙ্গে যেন দেশের কিছুটা চেনা মিল খুঁজে পেলাম। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।"

কত রকমের গল্প করেন মেজোমেসো। দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকান প্রত্যেকবার, যতবার আফ্রিকা মহাদেশের নাম উচ্চারণ করেন,

বলেন, "নমস্কার করবো না? সোজা একটা দেশ? বাপ রে বাপ। শিম্পাঞ্জী থেকে মানুষের সবটুকু বিবর্তন হয়েছে মোটে ওই একটা দেশে। কে জানে, ও-দেশটা যদি না থাকতো তো আমরা শিম্পাঞ্জীর স্তরেই হয়তো রয়ে যেতাম।"

আমি বলেছিলাম, "শিম্পাঞ্জী?"

মেজোমেসো বলেছিলেন—"যতদূর বোঝা যাচ্ছে, মনে হচ্ছে তিনটি প্রাণী ছিল। তার থেকে বেশিও ছিল হয়তো। সঠিক জানি না। একটা হচ্ছে শিম্পাঞ্জী। আর-একটা গরিলা। আর তৃতীয়টা হচ্ছে সেই প্রাণীটা যেটার থেকে বিবর্তিত হতে হতে মানুষের উদ্ভব হয়েছে। সেই প্রাণীটা ঐ শিম্পাঞ্জী গরিলার মতোই নিচু স্তরের কিছু একটা প্রাণী ছিল। অথচ প্রশ্ন হ'ল, যদি এই তিনটে ভাইয়ের মধ্যে তুটো ভাই পিছিয়ে শিম্পাঞ্জী আর গরিলার স্তরেই রয়ে গেল তবে তৃতীয় ভাইটা কী করে হঠাৎ এমন অসম্ভব দ্রুতগতিতে বদল হতে হতে তোমার আমার মতো মানুষ হয়ে গেল।"

আমি বললাম, "নিচু স্তর আর উঁচু স্তর"—

মেজোমেসো একটা ছবি দেখালেন। ফোটোগ্রাফ না। হাতে-আঁকা একটা রঙিন ছবি। সেখানে একপাশে একটা শিম্পাঞ্জীর মতো প্রাণী দাঁড়িয়ে আর তার পাশে পর পর আঁকা অনেকগুলো প্রাণী। যেন শিম্পাঞ্জীটা ধীরে ধীরে বদলে মানুষ হয়ে যাচ্ছে, মাথার খুলিটা হয়ে যাচ্ছে বড়। মাথার খুলিটা আগে যেমন ঝুঁকে পড়েছিল সামনে বুকের দিকে শিরদাঁড়া থেকে, সেটা যেন আস্তে-আস্তে শিরদাঁড়ার উপর সমান হয়ে খাড়া হয়ে গেল। এবার মানুষটা সোজাসুজি তাকাতে পারছে। শিম্পাঞ্জীর মতো নিম্নমুখী দৃষ্টি না। চোয়ালটাও ধীরে ধীরে চ্যাপ্টা হয়ে গেল। চোখ তুটো সামনে এগিয়ে এলো নাকের পাশে-পাশে। হাত তুটোও ছোট হয়ে এল। আজানুলম্বিত রইল না। আর ছবিটার মধ্যে সব থেকে যেটা চোখে পড়বার মতো, সেটা হচ্ছে যে শিম্পাঞ্জীটা ধীরে ধীরে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে সোজা হ'ল। আধা-খাড়া, আধা-হামা অবস্থা থেকে সে হয়ে গেল খাড়া একটা দ্বিপদ জীব। শিরদাঁড়াটা কোমরের কাছে ভাঙা না। একদম সোজা। ছবিটাকে দেখলাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তাজ্জব ব্যাপার সত্যি।

মেজোমেসো বললেন—"এ-নিয়ে বন্ধুরা কত তর্ক করেছি জানিস?

আমার একটা বন্ধু ছিল— এক ফরাসী প্রফেসার। সে বলতো শিম্পাঞ্জী থেকে মানুষ হবার মূলে মানুষের মগজটা বেড়ে যাওয়া। যেটাকে বলে— মগজ-বিস্ফোরণ। শিম্পাঞ্জীর তুলনায় মানুষের মগজটা বিরাট। অন্য দিকে, আমাদের এক ভারতীয় বন্ধু ছিলেন। তিনি আবার উল্টো বলতেন। বলতেন— শিম্পাঞ্জী থেকে মানুষ হবার মূলে মানুষের হাত শিম্পাঞ্জীর হাতের বুড়ো আঙুলটা হাতের বাকি চারটে আঙুলের পাশাপাশি। আমাদের মতো দরকার হলে বুড়ো আঙুলটা হাতের অন্য চারটে আঙুলের মুখোমুখি করা যায় না। সুতরাং কোন একটা জিনিস ধরতে গেলে শিম্পাঞ্জীরা সেটা হাত দিয়ে পাকিয়ে ধরে। আর আমরা ধরি মুঠো করে। তিনি বলতেন— মুঠো করে ধরতে শিখেছি বলেই আমরা জিনিসপত্র গড়তে পারি, বদলাতে পারি। শিম্পাঞ্জীর হাতটা থেকে আমাদের হাতটা ভিন্ন বলেই আমরা মানুষ— শিম্পাঞ্জী না।

আমি বললাম, "তুমি কি বলো ?"

মেজোমেসো বললেন, "আগে একরকম বলতাম। এখন আরেক-রকম বলি। আমাদের মাথার খুলির নিচে একটা ফুটো[১] আছে। শিম্পাঞ্জীদের মধ্যে খুলির এই ফুটোটা পেছন দিকে সরানো। সেইজন্য শিম্পাঞ্জীদের মাথাটা সর্বদা ঝুলে থাকে। মানুষের খুলির ফুটোটা ঠিক খুলির মাঝ-বরাবর। শিরদাঁড়াটা ফুটোর ভিতর দিয়ে পরিষ্কার উঠে যায়। তাই মাথাটা খাড়া হয়ে থাকে শিরদাঁড়াটার উপর। সুতরাং আমরা সোজা সামনের দিকে তাকাতে পারি। আর আমাদের চোখ দুটো যেহেতু নাকের পাশাপাশি, আমরা যে কোনও জিনিস ঠিক কতটুকু দূরে আছে সেটা অনেক দূর থেকেই ভালো করে বুঝতে পারি। তাই আমরা দূর থেকে শত্রু দেখতে পাই, আর তাই আগে থেকেই সাবধান হতে পারি। সেইজন্য মাঝে-মাঝে আগে আমি ভাবতাম যে, আমরা মানুষ হয়েছি তার কারণ আমাদের মগজটা বড়, তা নয়। কিংবা তার কারণ আমাদের হাত দুটো মুঠো করা যায়, তাও নয়। তার কারণ হচ্ছে, আমাদের চোখ বহুদূর অবধি দেখতে পায়। কোন্ জিনিসটা কত দূরে, সেই গভীরত্ব দূর থেকে বুঝতে পারি। আর বুঝতে পারি কোন্ জিনিসটার কী রং। সুতরাং আমি প্রথম দিকে ভাবতাম যে আমরা মানুষ হয়েছি তার কারণ আমাদের মাথা নয়, আমাদের হাত নয়, আমাদের খুলির নিচের ফুটোটা, আর আমাদের চোখ।"

আমি বললাম, "আগে ভাবতে, আগে ভাবতে বলছো কেন ? তার মানে এখন আর তুমি সেকথা ভাব না ?"

মেজোমেসো বললেন, "এখন মনে হয় মানুষ যে মানুষ হয়েছে তার কারণটা অন্য । এই তিনটের একটাও না ।"

দুই

খাবার দিয়ে যাচ্ছে । পাশের ভদ্রমহিলা বললেন, "মাছ-মাংস খাও তো ?" বুঝলাম নিষিদ্ধ মাংস খেতে দেবে । নয়তো নিরামিষ । আমাদের বাড়িতে মুরগীর ডিম অবধি নিষিদ্ধ খাদ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত । কাকু কতসময় ঠামাকে খ্যাপান । বলেন, "মা, একটা দেশ আছে সেখানে সাপের মাংস বিক্রি হয় । দোকানের সামনে জ্যান্ত জ্যান্ত সাপ টাঙানো থাকে । খরিদ্দার পছন্দ করে দিলে তারই একটা নামিয়ে ঝট্ করে মাথাটা কেটে সেখান থেকে এক টানে ছালটা লেজ অবধি ছাড়িয়ে দেয় দোকানদার । সাপটার তখনও ধড়ে প্রাণ থাকে । ব্যথায় সাপটা দোকানদারের হাতটা শক্ত করে প্যাঁচ দিয়ে জড়িয়ে উঠে । ওদের তো আর মুখ নেই যে কেঁদে উঠবে চীৎকার করে ।"

ঠামা "দুগ্‌গা দুগ্‌গা" বলে ওঠেন । কাকু বলেন, "যখন কই, মাগুর রান্না করো, তখন কখনও ভেবেছো তেলে ছাড়লে ওদের কেমন কষ্ট হয় ?"

কাকু আমাকে একবার বলেছিলেন যে আফ্রিকার একটা দেশে পুষ্টিকর খাদ্যের খুব অভাব । সেখানে ওরা গোরু পোষে । নিয়ম হচ্ছে গোরুগুলোর কণ্ঠনালি মাঝে মাঝে কেটে সেখান থেকে রক্ত বার করে সেটা টাট্‌কা-টাট্‌কা পান করা । কাকু বলছিলেন, "মহাভারতে ভীম দুঃশাসনের রক্ত পান করে এমন কী আর অন্যায় করেছিলেন !" আমার এসব শুনলে বাবার কথা মনে পড়ে । বাবা বলেন, "বুঝলি স্বর্ণ, খাওয়া ব্যাপারটা দেশাচারগত, একেবারে অখাদ্য কিংবা একেবারে কুখাদ্য বলে কিছু নেই ।"

আমাদের বাড়ির কথা যদি বলতে যাই তো বলতে হবে যে সমস্ত বাড়িটা আমাদের ভাইটিকে কেন্দ্র করে রয়েছে । ভাইটি আমার জ্যাঠাবাবুর ছেলে । আমার অনুজ । ভাইটির এক দাদা ছিল । সে ছোট বেলাতেই মারা গিয়েছে । তখনও আমি জন্মাই নি ।

ভাইটি যেদিন জন্মেছিল, দিনটা আমার আব্ছা-আব্ছা মনে পড়ে। আমি সম্ভবত ছাতে খেলছিলাম তখন। কে যেন এসে খবর দিল যে, আমার একটা ভাই জন্মেছে। এক্ষুনি গেলে ওকে হাসপাতালে দেখতে পাব। নিচে নেমে দেখি, ঠামা ঠাকুরঘর থেকে বার হচ্ছেন। আমাকে বললেন, "যা, দৌড়ে গিয়ে তোর হলুদ ফ্রকটা পরে আয়। আমরা হাসপাতালে যাব।"

হাসপাতালে গিয়ে দেখি মা-বাবা সবাই আফিস থেকে ছুটি নিয়ে এসেছেন। জ্যাঠাবাবু তখনও এসে পৌছন নি। হাওড়া-ব্রীজের জ্যামে হয়তো আটকে গিয়েছেন। জেঠিমার মা ঠামাকে দেখে বললেন, "আপনার নাতিকে কিন্তু ঠিক স্বর্ণর মতো দেখতে হয়েছে।" ভেতরে গিয়ে দেখলাম কাপড়ে-জড়ানো একটা নেড়িমুণ্ডি এত্তটুকুন পুতুলের মতো প্রাণী। চোখ বন্ধ করে বড়-বড় নিশ্বাস নিচ্ছে। এত ছোট্ট বাচ্চা এর আগে আর আমি দেখি নি। খুব অবাক হয়ে ভেবেছিলাম, ওকে আমার মতো দেখতে, কী করে বলছে? না-আছে ওর মাথায় একগাছি চুল, না ওর চোখ দুটো আমার মতো বড়-বড়। আসলে মানুষের মতোই দেখতে ছিল না ও। কেমন একটা অদ্ভুত বাঁদরের মতো আদল।

ধীরে-ধীরে বাচ্চাটা বড়ো হতে থাকলো। প্রথমদিকে আমি ওকে মোটেও পাত্তা দিতাম না। কিন্তু বাচ্চাটা আবার আমাকে দেখলেই সব থেকে বেশী চঞ্চল হয়ে উঠতো। ওর চোখ দুটো দিয়ে ও আমাকে অনুসরণ করতো। সব কান্না ওর আমার কোলে উঠলেই বন্ধ হয়ে যেত। আমাকে দেখলে ও এক-মুখ হাসি হেসে অভ্যর্থনা করতো। আমার কাছে ও খেলে পেট ভরে খেত। আমার হাতে ও চান করলে ওর মুখে মাথায় সাবান মাখাতে দিত। আমার কোলে ছাড়া ও কারো কোলে পার্কে বেড়াতে যেতে স্বীকার হ'ত না। আমি ওকে প্রথম অ আ ক খ শেখালাম। ওকে আমি নামতা শেখালাম। প্রথম দিন হাতে ধরে ওকে আমি পাড়ার ইস্কুলে নিয়ে গেলাম। তখন ওর তিন বছর মোটে বয়স।

তারপর একটা দুর্ঘটনা ঘটলো। একদিন স্কুলে হঠাৎ ও পড়ে গিয়ে হাঁটুর কাছটাতে কেটে ফেললো। ছোট্ট একটুখানি আঁচড়। আমার-তোমার সবাইকার ঐটুকু কাটা সারতে বেশি সময় লাগতো না। কিন্তু ঐ ছোট্ট কাটাটুকু থেকে ভাইটির রক্তপাত আর বন্ধ হ'ল না।

প্রথম-প্রথম কেউই ব্যাপারটাকে গ্রাহ্য করেন নি। কিন্তু ভাইটি

যেন কেন বিবর্ণ, ফ্যাকাসে, ক্ষীণপ্রাণ হয়ে যেতে থাকলো। জ্যাঠাবাবু কাজের মানুষ। আমাদের মাছের ভেড়ি আছে কলকাতার কাছেই। সেখানে কোন সমস্যা নিয়ে তিনি ভীষণ ব্যস্ত ছিলেন। জেঠিমা রান্না-খাওয়া ছাড়া সংসারের অন্য কোন সমস্যার ধার ধারতেন না। অন্য সব দায়িত্ব মা-র ওপরেই ন্যস্ত। বাবা ছিলেন ট্যুর-এ। একদিন দেখি, মা বিভাসমামুকে নিয়ে বাড়ি এসেছেন আফিস থেকে। বিভাসমামু ডাক্তার। সাধারণ ডাক্তার নন। বেশ নাম-করা ডাক্তার। উনি জেঠিমার দূর-সম্পর্কের দাদা। বিভাসমামু বললেন, "কই রে, তোদের বাড়ির দস্যি ছেলেটাকে দেখি। সেটার নাকি হাঁটুতে চোট লেগেছে। জ্বর এসেছে।" আমি ঘরে বসে ভাইটিকে টুনটুনির গল্প পড়ে শোনাচ্ছিলাম। গত চার-পাঁচ দিন যাবৎ ওর জ্বর এসেছে ঘুষঘুষে। পায় পট্টি বাঁধা। হাঁটু ফুলে গিয়েছে প্রচণ্ড। এখনও রক্তক্ষরণ চলেছে।

বিভাসমামু ওকে অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন। তারপর বললেন, "কাল একবার আমাদের মেডিকেল কলেজে এসো। ওকে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।" দাদাকে কাছে পেয়ে জেঠিমা ভালোমন্দ রাঁধতে বসলেন। রাত্রিবেলা ভুরিভোজন করে বিভাসমামু চলে গেলেন।

পরের দিন মা ভাইটিকে নিয়ে হাসপাতালে চলে গেলেন। কিন্তু দেখলাম সব কাজ ফেলে জ্যাঠাবাবুও সঙ্গে চললেন। জেঠিমা বেশ অবাক হয়ে গেলেন। বললেন,—"তুমি আবার চললে কোথায়?" কিন্তু যখন জ্যাঠাবাবু উত্তর না দিয়ে ভাইটিকে নিয়ে গাড়িতে গিয়ে বসলেন, তখন জেঠিমা ঠামাকে জিজ্ঞেস করলেন, "অসুখ কি তবে বেশি। উনি কাজ ফেলে তো সহজে যান না কোথাও।"

দুদিন বাদ থেকেই ভাইটির চিকিৎসা হঠাৎ বেড়ে গেল। ওকে শুইয়ে ফেলে রক্ত দেওয়া সুরু হ'ল। সকাল-বিকেল ডাক্তার আসা শুরু হ'ল। ঠামা, জেঠিমার কেমন ভ্যাবাচাকা মুখ। কিছুতে বুঝতে পারছে না যে অতটুকু আঘাতের জন্য অতশত করা হচ্ছে কেন? বাবা ট্যুর থেকে ফিরে এসেছেন কাজ ফেলে। রোগীর ঘরে মা আর কাকু সমানে একজন না একজন তদারকি করছেন।

ধীরে ধীরে ভাইটি ভালো হয়ে গেল। জ্বর নামলো। রক্তপাত বন্ধ হ'ল। কিন্তু শুনলাম যে, ভাইটি ভীষণ অসুস্থ। ওর শরীরে রক্ত বন্ধ

হবার যে মাল-মশলা থাকা উচিত ছিলো সেটা নেই। সুতরাং কোন প্রকার আঘাত লাগা ওর চলবে না। কারণ, ওর রক্তপাত সহজে বন্ধ হবে না। আঘাত শুধু শরীরের বাইরেই লাগতে পারে, তা না। শরীরের ভিতরেও অলক্ষে আঘাত লাগতে পারে।

যে-শিশুটি তার ক'দিন আগেও দৌড়ঝাঁপ, দস্যিবৃত্তি করেছে হঠাৎ তার ওপর কড়া পাহারা বসে গেল। সে যেন আস্তে আস্তে হাঁটে, আস্তে আস্তে চলে। সব কাজ যেন ধীরে সুস্থে করে। ব্যাপার-স্যাপার দেখে আমি আর ভাইটিও অবাক হয়ে গেছি। কী হচ্ছে কিছুই বুঝলাম না।

কিন্তু ভাইটি বোঝাবুঝির ধার ধারে না। সে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলো। অর্থাৎ কি না দৌড়ঝাঁপ আরও বাড়িয়ে দিল। কারুর ভালো কথা, শাসন সে শুনতে রাজী নয় এবং তাতে করে দুর্ঘটনাও ঘটতে থাকল একের পর এক। কখনো থুতনি কেটে যাচ্ছে, কখনও কব্জি। একবার পেনসিল কাটতে গিয়ে আঙুলের পাশটা কেটে গেল। দুর্ঘটনা-গুলো ছোট ছোট। কিন্তু তাদের পরিণাম সুদূরপ্রসারী। ভাইটি এত অসুস্থ হয়ে পড়া সুরু করলো, এত ঘন-ঘন শয্যাশায়ী হতে থাকলো, এত রক্ত দেওয়া, গ্লুকোজ দেওয়া, ঔষধ, ইনজেকশান চললো ; এত জ্বর-জারি হাত-পা ফোলা, দুর্বলতা, মরণাপন্ন হয়ে যাওয়া সুরু হ'ল যে, বাড়িসুদ্ধ সবাই, কাজের লোক থেকে ঠামা, জেঠিমা, জ্যাঠাবাবু, এমনকি আমিও ভাইটি অসুস্থ বুঝে নিয়েছিলাম। ভাইটি ঠিক আর অন্য পাঁচটা শিশুর মতো স্বাভাবিক না।

ভাইটির স্কুলে বলে দেওয়া হ'ল যেন ও বেশি দৌড়ঝাঁপ না করে। খেলাধুলা করবে না, স্কুলের শিক্ষকরাও কড়া পাহারায় বসে গেলেন। ওর অন্যান্য বন্ধুরা সব ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল। ওরা আর খেলবার সময় ভাইটিকে ডেকে নিয়ে যায় না। বলে না যে তুই আজ ব্যাটিং করবি। বলে না যে, চল দৌড়ে দেখি কে প্রথম হই। আজকাল ভাইটি বারান্দাতে একা একা দাঁড়িয়ে ওদের খেলা দেখে, নয়তো বই নিয়ে একপাশে পড়তে থাকে।

যত ওর ঘরে-বাইরে খেলা বন্ধ হতে থাকলো, যত ওর ওপর নিষেধ আজ্ঞা বাড়লো, তত ও ভালো হতে থাকলো লেখাপড়ায়। আমি ওর থেকে বেশ অনেক বড়। কিন্তু আমি যেসব বই পড়ি, যেসব চিন্তা ধারণা

আলাপ-আলোচনা করতে ভালোবাসি— ভাইটি আমার মতো সব বই পড়ে বুঝতে শুরু করলো। আমরা যেন সমবয়সী। চিন্তার জগতে আমরা দুই বন্ধু।

কিন্তু আমি যে ওর দিদি সেটা আমি ভুলতে পারলাম না। ওর জন্য মমতার আমার শেষ নেই। বাইরের জগৎটা ওর যত একা মোকাবিলা করা বন্ধ হয়ে গেল, ততো আমি পালা করে কোনদিন কাকুর সঙ্গে, কোনদিন বাবার সঙ্গে ওকে নিয়ে চিড়িয়াখানা, গড়ের মাঠ, লেক, আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবের বাড়ি, দোকান-বাজার, বই মেলা, সিনেমা-থিয়েটার, এমনকি ফুটবল খেলায় নিয়ে যেতে লাগলাম। আমার তত্ত্বাবধানে ও ক্রিকেট খেলা দেখতে যেত। আমার তত্ত্বাবধানে ও নৌকা-বাইচ দেখতে যেত। আগের থেকে হিসাব করে আমি আর ও ব্যবস্থা করে রাখতাম কোন্ কোন্ দিন গাড়ি পাওয়া যাবে। কারণ, ভাইটিকে আমার মতো বাসে ট্রামে চলতে দেওয়া হ'ত না। জ্যাঠাবাবু ঘন-ঘন গাড়ি পাঠিয়ে দিতেন। নিদেন পক্ষে বাবা। ভাইটির জীবনের অপূর্ণতা আমরা পুষিয়ে দেবার সর্বপ্রকার চেষ্টা করতাম।

অনেকবার কথা হয়েছে ভাইটিকে মা মেজোমেসোর কাছে লণ্ডন শহরে নিয়ে যাবেন কিনা। চেষ্টা হবে কিনা নতুন-নতুন পদ্ধতির চিকিৎসার। কিন্তু আরও একটু বড় হোক। নিদেন পক্ষে বারো বৎসর বয়স হোক, তবে বিলেত যাবে। এসব ভেবে— শুধুই দিন পিছিয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে ভাইটি ওর পৈতের দিন অসম্ভব বেশিরকম অসুস্থ হয়ে পড়লো। সবাই বলছিল যে, ওর আর বাঁচবার আশা নেই। ওকে রক্ত দেওয়া চলছিল। অনেকে ভয় পাচ্ছিল যে ওর দুর্বল শরীর অতটা বাইরের রক্ত গ্রহণ করতে পারবে না।

এবার আমরা একটি নতুন ডাক্তারের সংস্পর্শে এলাম এবং ডাক্তারের চিকিৎসা গুণে একটা অসম্ভব ফ্যাকাশে হাড়-বের-করা ভাইটি হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে এল। ঠামা, জেঠিমা—সবাইকার মুখে আর কথা নেই। ঠামা বসে রইলেন ঠাকুরঘরে। জেঠিমা রান্নাঘরে একটা পিঁড়িতে বসে উদাস হয়ে জানালার বাইরে তাকিয়ে রইলেন। সামনে ভাতের হাঁড়িতে ভাত ফুটতে ফুটতে গলে পাঁক হয়ে গেল। যখন ধরা গন্ধ বার হ'ল তখন জেঠিমা দমাস করে ভাতের হাঁড়িটা মেঝেতে নামিয়ে মা-র হাত ধরে কেঁদে ফেললেন। বললেন, "মেজো ওর দিকে আর

চাইতে পারছি না। ওর সমস্ত ভার তুই নে। আমি অলক্ষ্মী। আমার একটা ছেলে গিয়েছে। এটাকে হারাতে রাজী নই। তুই এটাকে নে। ও হয়তো প্রাণে বেঁচে যাবে।" আমরা সবাই জানতাম যে নেওয়া দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আমি আগেই বলেছি যে এতদিনে আমাদের বাড়ির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে ভাইটি। ওর শরীর ভালো কি মন্দ সেই অনুযায়ী জ্যাঠাবাবু কাজে যান, বাবা ট্যুরে যান, মা আফিস যান, কাকু কলেজে যান। ওর শরীর ভালো থাকলে আমরা হাসি, গান করি, আনন্দ উৎসব করি। ওর শরীর ভালো না থাকলে আমরা দিনরাত্রি হাসপাতালে থাকি, বাড়িতে রান্নাবান্নার পাট অবধি বন্ধ হয়ে যায়। সবাই বিনিদ্র রজনী একজোটে নীরবে পাশাপাশি বসে কাটিয়ে দি।

কিন্তু এত যে অসুখ, এত যে চিকিৎসা, এত যে বাড়িসুদ্ধ লোকের ওর জন্যে দুশ্চিন্তা, ভাইটির কিন্তু এসবের জন্য কোন মাথাব্যথা ছিল না। ও বলতো যে ওর মৃত্যু হবার কোনও প্রশ্ন নেই। ও শুধু বাঁচবে তা নয়, ও সুদীর্ঘ কাল কর্ম-জীবনযাপন করবে।

আমার বড়মেসো স্বদেশী আমলের ছেলে। বড়মেসো যতবার কলকাতায় আসেন, ওঁর মুখে ইংরেজদের অত্যাচার, ভারতবাসীর অসহায় অবস্থা শুনে শুনে ভাইটির মধ্যে জেগে উঠেছিল অসম্ভব রকমের একটা স্বদেশ-প্রেম। এ-ব্যাপারে ওর সব থেকে বড় সঙ্গী ছিল বড়-মেসোর মেয়ে টুটুল। ওদের দু'জনের ধ্যান, জ্ঞান সব-কিছু ছিল ভারত-বর্ষকে কি করে আবার মহিমামণ্ডিত করা যায় সেই চিন্তা।

এক একবার ভাইটি মরণাপন্ন হয়ে যেত। তখনকার কথা আলাদা। কিন্তু এতটুকুও সুস্থ ও যখন হয়ে উঠতো, ভাইটি লেগে যেত প্রচণ্ড উৎসাহে সেই ধান্দায় যাতে ওর মন সর্বদা টানতো। কত রকমের বই যে ও পড়ে ফেলেছে ওর ঐ ছোট্ট জীবনে, কত রকমের লোকের সঙ্গে যে ও মেশে, তা আমাদের পাড়ার বস্তির কাঠের মিস্ত্রিই হোক, আর হাসপাতালের কোনও রিক্সাওয়ালাই হোক, তার হিসাব নেই। ওর শরীরের অসুখ সম্বন্ধে কারুর অজানা নয়। সবাই ওকে ভালোবাসে। সবাই ওদের সমস্যা, গ্রামের সমস্যা, সমাজের সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা ভাইটির কাছে এসে গল্প করতো। ভাইটি বড় বড় চোখের চাহুনি নিয়ে ওদের গল্প শুনতো। আমার বিদেশে আসার কথায় আবার কথা উঠে-ছিল যে ভাইটি এইসঙ্গে বিদেশে যাবে কিনা। কিন্তু যে-হাসপাতালে

ভাইটি লণ্ডনে ভর্তি হবে সে-হাসপাতালে জায়গা পেতে লেগে যায় প্রায় ২।৩ মাস। তাছাড়া এখন নতুন ডাক্তার বলছেন যে, ভাইটি কিছুটা সামলিয়েছে। শরীরেও ওর কিছুটা বল ফিরেছে, কিছুটা মাংস লেগেছে ওর কোটরে ঢোকা চোখের কোণে, গালের পাশে, হলুদ বিবর্ণ মুখ টাতে। কিছুটা গোলাপি আভাস এসেছে ওর গায়ের রঙে। নতুন এই ডাক্তারের চিকিৎসাতে ভাইটি আজকাল ভালো আছে। ডাক্তারটি খুব নবীন। সবে বিদেশ থেকে পড়া শেষ করে ফিরেছেন। তিনি যা বলেন— ভাইটি গুণমুগ্ধ ভক্তের মতো তাঁর সব আদেশ, নিষেধ মান্য করে চলে। ডাক্তার ভাইটির জন্য রকম বেরকমের খেলনা নিয়ে আসেন। নিজে বসে ওর সঙ্গে দাবা খেলেন, ভাইটির কাছে হেরে গিয়ে হাহা করে হাসেন। ওর তৈরি মেকানোর ব্রীজ দেখে বলেন, দু'নম্বর হাওড়া ব্রীজ শেষঅবধি তোমার আমলে সমাপ্ত হবে। আমাদের আমলে তো আর হ'ল না। ভাইটির লেখা গল্প পড়ে বলেন, আরে তোমার লেখায় তো দেখছি বাঙালীর নয়া জাগরণের ইঙ্গিত। তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। কিন্তু আমি তো দেখছি বাঙালীর নাভিশ্বাস উঠেছে।

আসার আগে ভাইটি আমাকে একটা লম্বা লিস্ট করে দিয়েছে। বলেছে, দিদি, তুই ওদেশে গিয়ে নিজের চোখে এগুলো দেখে আসবি। আমি তোর নিজের মুখ থেকে শুনতে চাই। প্রবাসী ভারতবাসীরা আমাদের দেশকে ভালোবাসে কিনা। তারা আমাদের ভারতবর্ষের মানুষ, সে-কথা ভেবে গর্ববোধ করে কিনা। আমরা বিদেশে উপনিবেশ বানাবো এই জিদ তাদের আছে কিনা। শুধু এই নয়, বিরাট একটা লম্বা ফর্দ। এটা দেখে এসো। ওটা যাচাই করে এসো। বস্তুধর্মী হওয়া নিশ্চয়ই ভালো, কারণ তাতে মানুষ পেট পুরে খেতে পায়। বিনা চিকিৎসাতে মরে না। অজ্ঞতার অন্ধকারে থাকে না। তাহলে তুমি দেখে আসবে আমেরিকা, ইংলণ্ডে অত মারামারি কাটাকাটি কেন! ওদের কিছু মানুষ অত স্বার্থপর কেন! কেন আবার ওদের কিছু মানুষ তার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে।

আমি বলি— তুই তো ভারি পাকা হয়েছিস। এই কঠিন কঠিন প্রশ্নর উত্তর বিরাট বিরাট মনীষী দিতে পারেন নি। আর আমি তার উত্তর জানবো? আর যদি-বা উত্তর জানি, তো তুই বুঝতে পারবি? ভাইটি বলেছিল, কেন, কাকু বলেছে না যে আমাদের ছোটদের মতো

বোঝা আমরা বুঝবো। ক্রমশ বড়দের বোঝার মতো বড় হলে বুঝবো। অনেক স্তরের বোঝাবুঝি আছে। বড়মেসো বলেছেন, ইংলণ্ডে যে-কোন বিষয়, তা ঘাসই হোক, আর পাহাড়-সমুদ্রই হোক, প্লেনই হোক কিংবা সমুদ্রযানই হোক, বিভিন্ন বয়সের উপযোগী. বিভিন্ন বই আছে।

মাকে বলেছিলাম, মা, তোমার কি মনে হয় ভাইটি বিদেশ যাবে। গেলে সুস্থ হবে? মা মাথা নেড়েছিলেন, বলেছিলেন, ভাইটি সম্পূর্ণ সুস্থ কোনদিনই হবে না। এই রোগের চিকিৎসা এতটুকুই আছে। রক্তক্ষরণ যতক্ষণ বন্ধ না হবে ততক্ষণ রক্ত দিয়ে যেতে হবে শরীরে। যে-কারণে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয় না, সে-কারণটা জানা আছে কিন্তু কারণটার উপশম হয় এমন কোনও পদ্ধতি চিকিৎসাশাস্ত্রে জানা নেই। খুব আধুনিক কালে এর ওপর গবেষণা অনেক পরিমাণে হচ্ছে। বড়মাসী নাকি এই বিষয়ে বড় বড় বৈজ্ঞানিকের অধীনে কাজও করছেন। হয়তো কোন এক সুদূর ভবিষ্যতে এই রোগের উৎপত্তি উপশম আবিষ্কার হবে। তবে এখনও তা সুদূর ভবিষ্যতে। সুতরাং বিদেশ যাওয়া, এটা এ-রোগের মুখ্য কথা না। এ-রোগের মুখ্য কথা এই যে, বৈজ্ঞানিকরা এখনো এর প্রতিকার আবিষ্কার করতে পারেন নি। আর তাছাড়া নতুন ডাক্তার আধুনিক অনেক চিকিৎসা জানেন। তার চিকিৎসাধীনে থাকা খুবই সৌভাগ্যের বিষয়। বিদেশ যাবার প্রয়োজন ভাইটির এখনই নেই।

তিন

মেজোমেসো বলেছিলেন কেন ওঁরা মাত্র আফ্রিকা মহাদেশেই কাজ করেন। বলেছিলেন, কেন ঐ সময়কার পুরোনো কালের ফসিল আফ্রিকা মহাদেশেই বেশি করে পাওয়া যায়। সেটা বলতে গিয়ে মেজো-মেসো আমাদের এই ভারতবর্ষের ভূতত্ত্বের কথাও বলেছিলেন। বলে-ছিলেন, আজ যেখানে উত্তর ভারতবর্ষটা আছে, আগে সেখানে একটা বিরাট গহ্বর ছিল। নোনাজলে ভরা। নাম দেওয়া হয়েছে সেটার 'তেথিস সাগর'[২]। তার উত্তরে হিমালয় পর্বতমালাটা ছিল না। সেখানে সমুদ্রবিস্তৃত ছিল সোজা মধ্যএশিয়া অবধি। দক্ষিণে অবিশ্যি দক্ষিণ-ভারতের ভূখণ্ডটা ছিল[৩] পুরোনো কাল থেকেই। এই দক্ষিণ-ভারত

ভূখণ্ডটা একদিন ভাসতে ভাসতে গিয়ে ঠেকলো মধ্যএশিয়ার ভূখণ্ডে। তখন দক্ষিণ-ভারত ভূখণ্ডটা মধ্যএশিয়ার ভূখণ্ডটার নিচে নেমে গিয়ে ওপর দিকে চাপ দিতে লাগল প্রচণ্ড। ঠেলা খেতে খেতে তেথিস সমুদ্রের জলটা উপছিয়ে চলে গেল, আর গজিয়ে উঠল সেখানে ধীরে ধীরে এক সারি পর্বতমালা। তারপরও ঠেলা চলতে লাগল। এক একবার ঠেলা বাড়ছে, আর একটু-একটু করে কুঁচকিয়ে উঠছে দক্ষিণ-ভারত আর মধ্য-এশিয়ার মধ্যিখানের মাটিটা। শুরু হ'ল হিমালয়ের সৃষ্টিপর্ব। ঠেলা চলল বার বার। আর উঁচু থেকে উচ্চতর হতে থাকলো হিমালয়-শ্রেণী।

আমি বললাম— "তুমি আজকাল সত্যি একটি মিথ্যুক তৈরি হয়েছো। মেজোমাসী যে বলেন, যে তুমি সর্বদা অফিস থেকে দেরী করে বাড়ি ফেরো আর তারপর বাড়ি এসে মিথ্যে মিথ্যে হেন হয়েছে, তেন হয়েছে বানিয়ে বলো, এখন বুঝতে পারছি যে মেজোমাসী একটুও বাড়িয়ে বলেন না। মাটির খণ্ড ভেসে ভেসে সমুদ্র ডিঙিয়ে চলেছে, পাড়ি দিচ্ছে একদেশ থেকে আর একদেশে— এসব মিথ্যে কথা নয়তো কি? জগৎটা কি হ য ব র ল?"

মেজোমেসো করুণ হয়ে গেলেন। বললেন— "বিশ্বাস কর, এতটুকুও এর মধ্যে অতিরঞ্জিত নেই। সত্যি সত্যি আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিকরা বলেন যে, মাটির খণ্ড ভেসে ভেসে বেড়ায় সমুদ্র ডিঙিয়ে।" মেজোমেসো বলেছিলেন, পৃথিবী কীরকম জিনিস দিয়ে তৈরি। সেটা তবে খুলে বলি: বলেছিলেন—পৃথিবীর চারপাশ ডিমের খোলার মতো একটা শক্ত জিনিস আছে। সেই খোলসটার ভেতর দিকে আছে একটা তরল পদার্থ। অনেকটা জলে-ভরা বেলুনের মতো। তবে পৃথিবীর খোলাটা বেলুনের খোলার মতো না। পৃথিবীর খোলাটা শক্ত। খানিকটা ডিমের খোলার মতো। কিন্তু ডিমের খোলাটা টানটান সমান না। ডিম সেদ্ধ করার পর ডিমের খোলাটা যেমন ফাটিয়ে দেওয়া যায় বড় বড় টুকরোতে, সেরকম পৃথিবীর খোলাটা ফাটা ঐরকম বড় বড় টুকরো দিয়ে। এই টুকরো-গুলো বেশ পুরু, তবুও ওরা ভেসে বেড়ায় ভেতরকার ওই গরম, তরল পদার্থটার ওপর দিয়ে। মেজোমেসো বললেন, "এতটুকুও মিথ্যে বলছি না। সত্যি ওরা ভেসে বেড়ায়।" ব'লে মেজোমেসো জিজ্ঞেস করলেন, "গরম মোমের ওপর মোমের সর দেখেছো কত সময় ভেসে বেড়ায়। ঠিক সেই রকম ভেসে বেড়ায় আমাদের পৃথিবীটার ভাঙা জমির টুকরোগুলো

কত সময় এরা একজন আর-একজনকে ধাক্কা দিতে থাকে। কত সময় এরা একজন আর-একজন থেকে তফাতে ভেসে চলে যেতে থাকে।

কখনও কখনও এই টুকরোগুলোর চলাচলি বেড়ে যায়। তখন এরা কিছুটা তাড়াতাড়ি চলতে থাকে। পৃথিবীর ভেতর দিকে তরল পদার্থ-টার মাঝে কত অদল-বদল হচ্ছে। আর সেইসঙ্গে ওপরে উঠে আসছে একটা চাপ। সেই চাপের ধাক্কাতে টুকরোগুলো চলাচলি করতে থাকে। এই চলার ফলে হিমালয় পর্বতমালার সৃষ্টি হয়েছে। শুধু তাই নয়, মহাদেশও কত সরে গিয়েছে একদিক থেকে অন্যদিকে। সে-সবের একটা তালিকা আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিকরা তৈরি করছেন।

কিন্তু সর্বদা শুধু মাটির নিচে মাটি ধাক্কাই দেয় না ; কখনও-কখনও খণ্ডগুলো একটার থেকে আর একটা তফাতেও সরে যায়। যখন দুটো ভূখণ্ড একটার থেকে আরেকটা সরে যেতে থাকে তখন মাটিতে প্রথমে একটা ফাটল ধরে। যদি তারা আরো সরে যেতে থাকে, তবে ফাটলটা ক্রমশ চওড়া হতে[৪] থাকে। ধীরে ধীরে একটা সমুদ্রের সৃষ্টি হয়ে যায় যদি ফাটলটা ক্রমশ বাড়তেই থাকে। এ-ঘটনাটা ঘটছে অসম্ভব ধীরে-ধীরে। তাই আমাদের চোখে পড়ে না। কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা হিসাব করে কোন্ মহাদেশ বছরে ক' ইঞ্চি করে সরে যাচ্ছে তা বলে দেবার জন্য এখনও পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন।

পুরাকালে আফ্রিকা মহাদেশে উত্তর-দক্ষিণ লম্বালম্বি এইরকম একটা ফাটলের সৃষ্টি হয়েছিল। পূর্বদিকের খণ্ডটা ভেসে যাচ্ছিল আরো পুবদিকে। এদিকে পশ্চিম দিকের খণ্ডটা ভেসে চলে যাচ্ছিল আরো পশ্চিম দিকে। তার ফলে দুটো খণ্ডের মাঝখানে উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বি একটা বিরাট ফাটল তৈরি হ'ল।[৫] ফাটলটা আরো চওড়া হলে হয়তো কোনদিন ওখানে একটা সমুদ্র গজিয়ে যেতে পারতো। কিন্তু আপাতত ওখানে আছে কতগুলো হ্রদের লম্বা একটা শেকল। পর পর অনেক-গুলো হ্রদ, উত্তর থেকে দক্ষিণে। এই খণ্ড দুটো যখন দুদিকে চলে যাচ্ছিল তখন ফাটলটাতে একটা টান পড়ছিল। আর সেই টানের চোটে ফাটলটার নিচ থেকে, পৃথিবীর ভূগর্ভ থেকে বার হয়ে আসতে লাগলো গলগল করে তরল গরম লাভা। সেই লাভার স্রোত বয়ে গিয়ে ঢেকে দিল ফাটলটার দু'দিকের পার। এরকম লাভার স্রোত শুধু একবার মাত্রই বয় নি। যতবার ফাটলটাতে টান ধরেছে ততবারই লাভার পর

লাভার স্রোত বয়ে গিয়েছে আফ্রিকাতে। শুধু লাভার স্রোতই নয়, মাঝে মাঝে ফাটলটা থেকে বর্ষণ হয়েছে ছাই। ঠাণ্ডা হয়ে জমে-যাওয়া লাভা আর ছাইয়ের পরত জমছে ফাটলের দু'ধারে। ওরা জমে জমে খাড়াই পাহাড় উঠেছে। দু'ধারের পাহাড়ের মাঝখানে থেকে গিয়েছে ফাটলটা। যেন একটা উপত্যকা। ফাটলটাতে আগ্নেয়গিরিও ছিল বহু। এখন ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে সেসব আগ্নেয়গিরির বেশীর ভাগই। আগ্নেয়-গিরির বাটির মতো মুখগুলোতে বৃষ্টির জল জমে হ্রদের সৃষ্টি হয়েছে।

মেজোমেসো বললেন, "এই যে ভিন্ন ভিন্ন লাভা কিংবা ছাইয়ের পরত, তাদের প্রত্যেকটার কত বয়স তা তোর বাবার মতো ভূতাত্ত্বিকরা বলে দিতে পারেন। তোর বাবার সঙ্গে তো এই করেই আমার আলাপ হয়েছিল। ওদের বিলেতের কলেজে আমি যেতাম লাভার প্রত্যেকটার স্তরের বয়স জানবার জন্য। তখন তোর মা আমাদের বাড়িতে থেকে পড়াশুনো করতো। তোর বাবাকে আমি পইপই করে বলেছিলাম—লেখাপড়া করতে এসেছো, লেখাপড়া শেষ করে লক্ষ্মী ছেলের মতো দেশে ফিরে যাও। মেয়েছেলেদের মুখের দিকেও তাকিয়ো না। তা এমন হাঁদা গঙ্গারাম তোর বাবা যে তিনি ভাবলেন আমি বুঝি মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছি।"

আমি এসব মা আর বাবার গল্প মেজোমেসোর কাছে লক্ষ লক্ষ বার শুনেছি। কথাটা ঘুরে যাচ্ছে দেখে আমি মেজোমেসোকে আবার মনে করিয়ে দিলাম—"তা লাভা আর ছাইয়ের পরতের বয়স জেনে তোমারই বা লাভ কি?"

মেজোমেসো বললেন—"তা বললে কী করে হবে। ওসব স্তরের বয়স জানলেই তো আমরা জানতে পারবো যে, যেসব ফসিল আমরা পাচ্ছি তাদের বয়স কত। যে-স্তরের যে-ফসিল আছে তার বয়স সে-স্তরের বয়সেরই সমান।"

মেজোমেসো আবারও বললেন—"বুঝতে পারছিস না? আচ্ছা, তার আগে একটা কথা বলি। আমরা আলোচনা করছি শিম্পাঞ্জীও না, মানুষও না এমন একটা প্রাণীর কথা। ধর্ তার নাম দেওয়া হ'ল মানুষবৎ।[৬] আমরা এখন অবধি চার রকমের মানুষবৎ পেয়েছি। কেউ বলেন আরও বেশীরকমের মানুষবৎ ছিল। কেউ বলেন—না, আরও কমরকমের ছিল। সেসব কূট তর্ক থাক। এ ছাড়াও আমরা পাঁচরকম

মানুষের স্তর পেয়েছি। বৈজ্ঞানিকরা এদের সবাইকে মানুষ বলেন।" মেজোমেসো আমাকে বললেন, "স্বর্ণ, তুমি যেহেতু এখনও বেশী জানো না, বুঝবার জন্য যদি তুমি চাও তো এদের ভাগ করে নিতে পার। প্রথম দু'জন হবে তাহলে পুরোনো মানুষ। তুমি ইচ্ছে করলে আধা-মানুষও বলতে পার। পরের দু'জন হবে জ্ঞানী মানুষ। আর সর্বশেষে হবে আধুনিক মানুষ।"

মেজোমেসো বললেন— "বুঝতে পারছিস না? আচ্ছা, তার আগে একটা কথা বলি। আধা-মানুষ দু'রকমের ছিল। জ্ঞানী মানুষ তিন রকমের। এর শেষেরটাতে আমরা পড়ি[৭]।"

"এখন কোন্ মানুষবৎ-এর কিংবা আধা-মানুষের বা জ্ঞানী মানুষের কার কত বয়স, কোন্ মানুষবৎ আগে ছিল, কে পরে এসেছে, সেটা জানা যাবে কী করে? এসব বেশীর ভাগই বিচার হয় ওদের ফসিল-লাভা কিংবা ছাইয়ের কোন্ স্তরে পাওয়া গেছে সেটা যাচাই করে। ওপর দিকে যেসব মানুষবৎ আমরা পেয়েছি আমরা বলি যে তারা পরের যুগের, নিচের দিকে যাদের পেয়েছি তাদের বলি যে তারা আগের যুগের। অবশ্য ঘটনাটা এত সহজ না। ধরো, আফ্রিকার ঐ ফাটলটার দু'ধারের খাড়াই পাহাড় যা আসলে একটার পর একটা লাভা-স্রোতের পরিণাম। আমরা তো আর কয়লাখনির কুলির মতো মাটি খুঁড়তে এগোই না। খুঁড়বো কোথায় রে বাবা? জায়গাটা তো হাজার-হাজার মাইল জুড়ে। আমরা বসে থাকি বর্ষা কখন আসবে সেই আশায়। বছরের পর বছর বর্ষায় ধুয়ে খাড়াই পাহাড় ঢালু হয়ে যায়। প্রত্যেক-বার বর্ষার পর আমরা দৌড়াই ওদেশে। বর্ষায় মাটি ছাই ধুয়ে মুছে যায়। ফাঁকে-ফাঁকে চকচক করে বেরিয়ে আসে ফসিল। আর আমরা কপাল ঠুকে নেমে পড়ি ফসিল-শিকারে।

"একবার করে নতুন কোনও মানুষবৎ কিংবা আধা-মানুষ কিংবা জ্ঞানী মানুষের ফসিল পাই, আর ধন্য ধন্য করে উঠি আমরা একজন আর-একজনকে।

"কত সময় পাহাড়ের ঢালু গড়িয়ে ওপরের স্তরের ফসিল নিচের স্তরে গিয়ে গুঁজে বসে থাকে। তখন আমাদের হিসাব করে দেখতে হয় যে ফসিলের গায়ে-লেগে-থাকা মাটিটা সত্যি করে কোন্ স্তরের। সেটা বিচার করাও অসম্ভব কঠিন কাজ। অণুবীক্ষণ-যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করে

নির্ধারণ করতে হয়। বড় হাঙ্গামার কাজ সেসব।"

আমি বললাম— "তাহলে বাবার মতো ভূতাত্ত্বিকের সাহায্য তোমাদের নিতে হয়? তাই না?"

মেজোমেসো বললেন— "দূর! তোর বাবা তো খনিজ-তেলের উপর বিশারদ। তোর বাবা পয়সা ছাড়া কোন-কিছু বোঝে? সে শুধু বোঝে খনিজ-তেল পেলে আমাদের মতো একটা গরিব দেশও রাজা বনে যাবে। আমি বাপু ওসব টাকা আনা পাই পয়সার মধ্যে নেই! আমি বুঝি আমার শিম্পাঞ্জী, আমার মানুষবৎ আর আমার লুসিকে!"

চার

খাবার ট্রে তুলে নিয়ে গিয়েছে। প্লেনের আলো নিভিয়ে দিয়েছে। রাত আর কাটছে না। কী করে রাত কাটবে, আমরা সেই রাত তিনটেতে বম্বে শহর ছেড়েছি। আর চলছি প্রায় উত্তর-পশ্চিমমুখো। রাত্রিটা যে শেষ হয়ে সকাল হবে তার সুযোগ দিচ্ছে কোথায়? রাত্রিটার পিছু পিছু ধাওয়া করতে-করতে চলছি আমরা।

প্লেনের সবাই যে-যার চেয়ারে কম্বলে পা ঢেকে শুয়ে পড়েছে। পাশের ভদ্রমহিলা বললেন, "জানো, তোমাদের কলকাতা শহরের একটা খাবার আমার খাওয়া হ'ল না। অথচ ঐ-খাবারটা খাবো বলেই আমি শুধু কলকাতা শহরে গিয়েছিলাম। ওখানে গিয়ে শুনি ওটা শুধু শীত-কালে পাওয়া যায়। একবার শীতকালে কলকাতা শহরে যেতে হবে ওটা খেতে।" ব'লে একটা নোটবুক খুলে তিনি দেখালেন। দেখলাম, ইংরাজী হরফে বাংলা শব্দ লেখা আছে, "নলেন গুড়ের সন্দেশ।"

মেজোমেসো বলেছিলেন— যা যা, তোর বাবাদের আর এখন আমরা পাত্তা দিই না। ফসিলের বয়স জানতে হলে আরও কত রকম-বেরকমের পরীক্ষা আজকাল আবিষ্কার হয়েছে। হায় রে, সেসব পরীক্ষা যদি সেসব সময়ে আবিষ্কার হ'ত তো তোর বাবাটার তোর মা-র হাতে এমন বেঘোরে প্রাণ হারাতে হ'ত না। আমার এ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই।

মেজোমেসো আরও বলেন, "কীসব দিনই গিয়েছে, সে আর কি

বলি! আমি আমার প্রফেসারের সঙ্গে আফ্রিকা মহাদেশের একদিক থেকে অন্যদিক দৌড় করে বেড়াচ্ছি। ধুধু করছে মাঠ। ঠাঠা করছে রোদ্দুর। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যেত। রাতে কতদিন সিংহের গর্জন শুনতাম। সারাদিন ধুলোতে মাখামাখি করে দুপুরে একটু হ্রদের জলে নামবো, তো ইয়া বড়-বড় কুমির। তখন তো আর রিসার্চে এত টাকার ছড়াছড়ি ছিল না। কত কষ্টে দিন কাটিয়েছি। আমার প্রফেসার তো টাইফয়েড রোগে বিনা চিকিৎসাতে মারা গেলেন। নেহাৎ আমার বঙ্গসন্তানের পেট। নয়তো আর তোর বাবার সর্বনাশ করতে বেঁচে থাকবার সুযোগ পেতাম না। কত অজানা ভয়ে রাত কাটিয়েছি। এদিকে কাজেও সফলতা পেতাম না। একটা হতাশার দিনের পর, আর-একটা হতাশার দিন আসতো। চাপা কান্নায় বুক ভেঙে যেত। দিনের পর দিন ঠাঠা-পোড়া রোদ্দুরে শুধু ফসিল খুঁজে বেড়াতাম। কিছুই পেতাম না। তারপর ধীরে-ধীরে খুঁজে পেতে লাগলাম পুরোনো দিনের মানুষ। তাদের চিহ্ন। মানুষ বললে তাদের ভুল বলা হবে। অথচ শিম্পাঞ্জী বললেও ভুল বলা হবে। তাই আমি বলি 'মানুষবৎ'। এই মানুষবৎ-এর বিভিন্ন স্তরের চিহ্ন ধীরে-ধীরে খুঁজে পেতে লাগলাম আমরা। চুল, নখ, মাংস কিংবা ঘিলু তো আর এত লক্ষ লক্ষ বৎসর পর পাবার কথা নয়। কবে সেসব কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে মিশে গিয়েছে মাটিতে। খুঁজে পেতে লাগলাম তাদেরই হাড়গোড়। হাত পায়ের আঙুলের এক টুকরো হাড় কিংবা খালি খানিকটা চোয়াল, নয়তো কয়েকটা দাঁত। অথবা হয়তো কোমরের হাড়ের কিছুটা অংশ। ধীরে-ধীরে সাজাতে লাগলাম সেইসব মালমশলা। ধীরে-ধীরে তৈরি হতে লাগলো একটা গল্প। মানুষ আগে এইরকম ছিল— মাঝে এইরকম হ'ল। এখন এইরকম হয়েছে। গল্প একটু করে লিখি, আবার নতুন কিছু হাড়গোড় আবিষ্কার হয়। আবার গল্প নতুন করে ঢেলে সাজাই। এমনি করতে করতে একদিন আমাদের নাম হ'ল। বিভিন্ন সংস্থা থেকে রিসার্চের জন্য আসতে লাগলো টাকা। বিদগ্ধ-মহলে সাড়া পড়লো। লোকে আমাদের চিনলো। ততদিন আমারও চুলে পাক ধরেছে। আমি বুড়ো হয়েছি।

"একদিন তোর মেজোমাসীর সঙ্গে আলাপ। গুণমুগ্ধ ছাত্রী। যত-বার দেখতাম ততবার বুঝতে পারতাম যে মনে-মনে আমাকে পুজো

করছে প্রায়। আমাদের বিয়ে হ'ল। বুবলার জন্ম হ'ল। এদিকে আমিও নামীদামী হয়েছি। আফ্রিকাতে বেশী সময় থাকতে পারি না। লণ্ডনেই স্থায়ীভাবে থাকতে হয়। গাড়ি হয়েছে। বাড়ি করেছি। আফ্রিকাতেও যখন যাই, হেঁটে বার হবার দরকার পড়ে না। জীপ্ গাড়ি হয়েছে আমাদের। কিন্তু সত্যি কথা বলছি, স্বর্ণ, ছাত্র-জীবনের সেই আনন্দ, আগের জীবনের সেই সার্থকতা কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে। ইউনিভারসিটিতে, বিদ্যাজগতে ভীষণ দলাদলি। ওপরওয়ালাদের সন্তুষ্ট রাখার নীচ চেষ্টা, রিসার্চের টাকা তোলার দালালির কোন্ নীচুতলায় স্থান পেয়েছে, সত্যের মুখোমুখি একা মোকাবিলা করার দুঃসাহস। আর সেই সঙ্গে শেষ হয়েছে আমার জীবনের আনন্দ।"

সেজোমেসো নিজের মনে বলে চললেন—"আমার নৃতাত্ত্বিক (anthropologist) বন্ধু ছিলেন লুই লিকি। উনি আর ওঁর বউ প্রত্নতাত্ত্বিক (archaeologist) মেরী লিকি। মেরী লিকি একদিন খুঁজে পেলেন মানুষবৎ-এর পদচিহ্ন। দেখে বোঝা গিয়েছিল যে ওর মধ্যে একজন মানুষবৎ ছিল চার ফুট আট ইঞ্চি লম্বা। কারণ, সাধারণত মানুষের উচ্চতার পোনেরো শতক লম্বা হয় তার পদচিহ্ন। আর একজন ছিল প্রথম মানুষবৎটির থেকে অল্প-কিছুটা বেঁটে। পদচিহ্ন দেখে বোঝা গিয়েছিল যে ওরা দু'জনেই ছিল দ্বিপদ-প্রাণী। ভালোভাবে ওরা হাঁটতে পারতো। পায়ের পাতার ছাপ, মাঝখানের অন্য ছাপ, গোড়ালির চিহ্ন সবকিছু মনে হয় দ্বিপদ মানুষের। ঠাণ্ডা জমে-যাওয়া ছাইয়ের পরতের উপর সেই লক্ষ লক্ষ বৎসর আগেকার হেঁটে-যাওয়া মানুষবৎ-এর পদচিহ্ন। সেদিন হয়তো আফ্রিকার বিরাট ফাটল দিয়ে ছাইয়ের বর্ষণ হয়েছিল, গরম ছাইয়ের ওপর সেদিনও হয়তো বৃষ্টি হয়েছিল। ভেজা ঠাণ্ডা ছাইয়ের ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়েছিল কত রকম-বেরকমের সেকালের জন্তু-জানোয়ার। আর তাদের অনুসরণ করে পিছু চলেছিল সেই মানুষবৎটা, যার পায়ের চিহ্ন মেরী লিকি খুঁজে পেলেন। মানুষবৎটা অনেকটা হেঁটেছে। তার পর একবার থমকিয়ে দাঁড়িয়েছে। পায়ের চিহ্নটা সে-জায়গাটায় বেঁকে গিয়েছে বেশ খানিকটা। হয়তো মানুষবৎটা কোনও সিংহের গর্জন শুনে থম্‌কে দাঁড়িয়েছিল। হয়তো হাতির বৃংহণ শুনেছিল। কে জানে কী শুনেছিল! তারপর বুঝতে পারছিল যে ভয়ের কোন কারণ নেই। আবার মানুষবৎটা হেঁটে

চলেছে। এবার আর থমকিয়ে দাঁড়ায় নি ও।

"সেদিনকার সেই ভেজা ছাইয়ের ওপরকার পদচিহ্ন সময়ের সঙ্গে জমে শক্ত হয়ে পাথর তৈরি হয়ে গেল একদিন। তারপর কত লাভা আর কত ছাই বর্ষণ হয়েছে। কোন্ অতলে চাপা পড়ে গিয়েছিল ঐ বিশেষ পদচিহ্ন-দেওয়া স্তরটা। তারপর একদিন, বহুদিন পরে, ফাটলের টানা-পোড়েন বন্ধ হ'ল। শান্ত হ'ল পৃথিবী। তখন আবার শুরু প্রকৃতির অন্য এক খেলা। আকাশের বুক থেকে বর্ষা নেমে আসে আর বেরিয়ে আসতে থাকে পরতের পর পরত লাভা আর ছাইয়ের স্তর। তারপর এল ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ। আমি সে-বছর আফ্রিকাতে যাই নি। খবরের কাগজে পড়লাম মেরি লিকি নাকি মানুষবৎ-এর পদচিহ্ন খুঁজে পেয়েছেন। সে কী আনন্দ! সে কী উৎসব! তক্ষুনি টেলিগ্রাম পাঠালাম মেরিকে। ওর ছেলে রিচার্ড ওখানে ছোট থেকেই আছে। বিরাট নাম-করা বৈজ্ঞানিক একজন। জন্ম থেকেই ফসিল ঘাঁটছে। ওর বৌও[৮] অসাধারণ গুণের মেয়ে। সাধারণত আমরা তো আর পুরো একটা কঙ্কাল পাই না। প্রথম কথা, কঙ্কালটার অনেক হাড়গোড়ই বেপাত্তা হয়ে যায়। হয়তো জন্তু-জানোয়ার খেয়ে ফ্যালে। তারপরও যতটুকু কঙ্কাল পড়ে থাকে তা ফসিল হয়ে এমন গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে মাটির সঙ্গে মিলেমিশে যায় যে, তাদের জোড়া দিয়ে একটা আধ-খাওয়া কঙ্কাল, কিংবা এমনকি, শুধু একটু আধ-খাওয়া খুলি কিংবা বুকের হাড়ের খাঁচা তৈরি করতেও অসম্ভব অধ্যবসায় লাগে। প্রথমত বোঝা যায় না যে কঙ্কালটা একটা মানুষবৎ-এর কি না। কিংবা, একটা জন্তুর কি না। তারপর বোঝা যায় না ফসিলের কোন্ টুকরোটা হাতের আঙুলের, কোন্‌টা পায়ের আঙুলের, কোন্‌টা নাকের হাড়ের, কোন্‌টা শিরদাঁড়ার হাড়ের। যেসব বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন জন্তু কিংবা মানুষের হাড়ের তুলনামূলক কাজ করেন, কত সময় তাঁদের সাহায্য নিতে হয়। একটা বড় কাচের ফুলদানি যদি হাজার হাজার টুকরো হয়ে ভেঙে যায়, আর, তার মধ্যে অর্ধেক টুকরোই যদি হারিয়ে যায়— ফসিলের টুকরো জোড়া দিয়ে মানুষবৎ-এর কঙ্কাল তৈরি করা সেই ফুলদানিটা জোড়া দেবার থেকেও অনেক কঠিন কাজ। রিচার্ডের বৌ এ-কাজ বড় ভালো পারতো।

"মেরির হাতে গিয়ে আমার টেলিগ্রামখানা পৌঁছলো। টেলিগ্রাম পেয়ে মেরি আমাকে উত্তর দিল— 'পদচিহ্নর ছবি তুলেছি আমি।

তোমাকে ছবিগুলো পাঠাচ্ছি।' ভুলে গেলাম সব রোদ-বৃষ্টির দিনগুলো। পরিষ্কার খাবার-জলের অভাবে কত কষ্ট পেয়েছি— সেসব দিনগুলো। লুই লিকি, মেরি লিকি দুই জনের কেউই এখন আর বেঁচে নেই। তবু কাজ করে চলেছে ওদের ছেলে, রিচার্ড। কত নাম হয়েছে তার। সে আফ্রিকার কেনিয়া দেশের নাগরিক হতে চেয়েছিল। কেনিয়া দেশও ওকে নাগরিত্ব দিয়ে ধন্য হয়েছে।"

পাঁচ

প্লেনে যে এত মানুষ এমন অঘোর অচেতন হয়ে ঘুমোতে পারে তা আমি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। আচ্ছা, ওদের আনন্দ হয় না? অবাক লাগে না ভাবতে যে হু হু করে হাওয়া দিয়ে একটা নক্ষত্রের মতো ছুটে চলেছি আমরা এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্তে। কে জানে, আমি এসব সন্তুষ্ট ও চাঞ্চল্যবিহীন প্রাণীদের বুঝতে পারি না। আমার প্রাণে এত উচ্ছ্বাস, এত অনুভব, সাধারণ দৈনন্দিন তুচ্ছ জিনিসকেও রঙিন করে, আলোয় উদ্ভাসিত করে দেখার ক্ষমতা আছে যে এদের আমি বুঝতে পারি না। এরা আমার বোঝার ওপারের মানুষ। কত কত ঘটনা শুনলে যে আমার শিহরন হয়, বুকটা আনন্দে ভরে যায়, চোখে জল আসে, এদের সেকথা বোঝাব কী করে!

ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয় আমার এখনও সেদিনকার কথা, যেদিন আমি প্রথম লুসির কথা শুনেছিলাম। নিছক গাধার মতো মেজো-মেসোকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "লুসি কি তোমার কোন বান্ধবীর নাম? এত অসম্ভব ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিলেন মেজোমেসো প্রশ্নটা শুনে, কিছুক্ষণ উত্তরই দিতে পারেন নি। তারপর একবার হা হা করে হেসে ফেললেন। দম লেগে যায় আর কী! বললেন— "অমন গাধা বাবার মেয়ে না হলে কি আর এমন গাধার মতো প্রশ্ন কেউ করে! আরে, লুসি বান্ধবী হতে যাবে কোন্ দুঃখে? আমি তো বলে সিংহ-কুমির, কলেরা-টাইফয়েডের মধ্যে বহাল তবিয়তে বেঁচে রইলাম। তা হলে আর বলছি কি। লুসির বন্ধু হবো কি করে? লুসি তো একটা ফসিল। আজ থেকে তিরিশ লক্ষ বৎসর আগেকার ফসিল।"

লুসি-আবিষ্কারের গল্প করছিলেন মেজোমেসো। বলছিলেন—"যিনি লুসিকে আবিষ্কার করেছিলেন তাঁর সঙ্গে আলাপ আছে আমার। ভদ্রলোকের নাম ডোনাল্ড জোহনসন। একদিন উনি আর ওঁর এক ছাত্র[৯] ফসিল শিকারে বার হয়েছেন।[১০] সারাদিন জন্তুর ফসিল ছাড়া এক টুকরোও মানুষবৎ-এর ফসিল খুঁজে পান নি দু'জনে। দুপুর পার হয়ে গিয়েছে। মধ্যাহ্নের সূর্য-তাপে দাউদাউ করে জ্বলছে উঁচু নিচু মাটির খোয়াই। চারপাশের হাওয়া সেই গরমে তেতে আগুন। ওঁরা দু'জনে এবার ভাবছেন বাড়ি ফিরবেন। বাড়ি ফিরে স্নান করবেন। এমন সময় ঐ যে দেখা যায় এক টুকরো হাড়—মনে হ'ল যেন মানুষবৎ-এর হাতের হাড়ের একটুকরো অংশ। সেটাকে চিনতে যতটুকু সময় নিয়েছে ততক্ষণের মধ্যেই ডোনাল্ড দেখতে পেলেন আর-একটুকরো হাড়। যেন খুলির একটুকু অংশ ওটা। হঠাৎ মনে হ'ল খোয়াই-এর ঢালে যেন ব্যাঙের ছাতার মতো ফসিলের টুকরো গজাতে আরম্ভ করলো। এখানে একটুকরো জানু, এখানে একখণ্ড শিরদাঁড়া, কোথাও কিছু পাঁজর, দূরে একটুখানি কোমরের হাড আর এতটুকু গালের খানিকটা। তিন সপ্তাহ লেগেছিল সেই কয়েক শো টুকরো হাড়ের কঙ্কালটা খুঁজে বার করতে। এতখানি প্রায়-সম্পূর্ণ মানুষবৎ-এর কঙ্কাল[১১] তার আগে পাওয়া যায় নি। দেখা গেল, কঙ্কালটি একটি পূর্ণবয়স্কা মহিলার। লম্বায় সে তিন ফুট আট ইঞ্চি। যখন বেঁচে ছিল হয়তো পয়ষট্টি পাউণ্ড ওজন ছিল। ওকে যখন জোড়া দেওয়া হচ্ছিল, তখন ডোনাল্ডদের তাঁবুতে বিট্‌লদের নতুন গান 'লুসি ইন দ্য স্কাই উইথ ডায়মণ্ডস' বাজছিল রেকর্ডে। ওঁরা কঙ্কালটার নাম দিলেন লুসি।"

এতটা শুনেও আমার কিচ্ছু মনে হয় নি। আমি খাটের ওপর গুড়ি-সুড়ি মেরে শুয়েছিলাম। মেজোমেসো চেয়ারে বসে পায়ের নখ কাটতে-কাটতে আমাকে ডোনাল্ড জোহানসন্-এর গল্প করছিলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ওটা যে পূর্ণবয়স্কা মহিলার তোমরা সেটা জানলে কী করে?"

মেজোমেসো বললেন, "যে-কোন কঙ্কালের বুক কোমর এসবের হাড় দেখলে কঙ্কালটা একটা ছেলের না একটা মেয়ের সেটা বোঝা যায়। মেয়েদের কোমরের হাড় আর পাঁজরার হাড় এমন ছড়ানো মেলানো হয়, যাতে মেয়েদের পেটের মাঝখানে অনেকটা জায়গা খালি

থাকে। সেই জায়গাটাতে ন'মাস ধরে মেয়েদের গর্ভের শিশুকে ধরে রাখতে হয়। ছেলেদের হাড়গুলো সেই তুলনায় অন্যরকমের। ব্যাটাদের তো আর বাচ্চা গর্ভে ধরার দায়িত্ব নেই! ছেলেদের বুকের আর কোমরের হাড় খাটো ও আঁটো আঁটো ছোট হয়।"

আমি আবার বললাম, "আর সেই কঙ্কালটি যে পূর্ণবয়স্কার তা তোমরা জেনেছিলে কী করে?"

মেজোমেসো বললেন, "সাধারণত দাঁত দেখে কঙ্কালের বয়স জানা যায়। দুধ-দাঁত হলে বাচ্চার কঙ্কাল। আসল দাঁত উঠেছে দেখলে বুঝতে হবে আরো বেশী বয়স হয়েছে। কষের দাঁত, আক্কেল-দাঁত পেলে তো কথা নেই। তা ছাড়া দাঁত সময়ের সঙ্গে ক্ষয়েও যায়। যত বয়স হয়, দাঁত তত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। দাঁতগুলো কতটা ক্ষয়েছে, সেটা দেখেও বয়স বোঝা যায়। দাঁত ছাড়াও আমরা অন্যসব হাড় দেখেও অনেক সময় কঙ্কালের বয়স বলে দিতে পারি।"

আমি ততক্ষণে খাটের ওপর উঠে বললাম— "তা লুসি নিয়ে তুমি এত গর্ব করছো কেন? কী এমন বিশেষ খবর আছে লুসির ব্যাপারে যাতে করে লুসি নিয়ে এত নাচানাচি। এত লাফালাফি!"

ছয়

প্লেনে করে এখন আমরা যে যে-শহর পার হচ্ছি, সে-সে শহর ভোরের আলোয় ওপর থেকে দেখা যাচ্ছে। আর বাতির মালা দেখে বুঝতে হচ্ছে না যে নিচে একটা শহর আছে। আসলে রাতটা সকাল হয়ে যাচ্ছে। প্লেনের টয়লেটে লাইন পড়েছে যাত্রীর। মনে হবে এটাও যেন একটা ট্রেন। প্রাতরাশের সময় হয়েছে। খাবার দেবার জোগাড় হচ্ছে। চা কফি দিয়ে যাচ্ছে সবাইকে। আমার পাশের ভদ্রমহিলা আমাকে ব্যাগটা দেখতে বলে বাথ্‌রুমে চলে গেলেন।

আমাদের বাড়ির পাশের বস্তিতে নির্মলা বলে আমার এক বান্ধবী থাকে। নির্মলার এক বৌদি আছে। শেফালী বৌদি। শেফালী বৌদিকে ওরা বাড়ির সবাই মিলে এত নির্যাতন করে যে সে-কথা ভাষায় বলে বোঝানো যাবে না। মানুষ বলে ওর যে কোনরকমের অধিকার আছে

সেটা ওদের বাড়ির কেউ জানে না। ও যদি দশ পয়সার মুড়ি কিনে খায় তো ওর শ্বশুর ওকে বলবেন যে ও কী পয়সা রোজগার করে যে মুড়ি কিনে খাবে। অথচ, ঐ যে ভাত-না-খেতে-পাওয়া একটা দরিদ্র বাড়ি, তাদেরও এমন মিথ্যে একটা বোনেদীয়ানা, যে ওদের বৌরা নাকি চাকুরি করবে না বাইরে বেরিয়ে। তাছাড়া, অবিশ্যি এ-কথাও সত্যি যে, শেফালী বৌদির এমন কী যোগ্যতা আছে যে সে-যোগ্যতা দেখিয়ে চাকুরি পাবে। তাকে না শেখানো হয়েছে পড়াশুনো, না শেখানো হয়েছে কোনও কারিগরি-বিদ্যা। ওর বাবা, দাদারা ওকে পড়ান নি, কারণ, শত হোক বিয়েতে তো এক গাদা টাকা এমনিতে নষ্ট হবে। নষ্ট অবশ্য সত্যিই হয়েছে, কারণ নির্মলার দাদার মতন এমন একটা বদমাইস নিষ্ঠুর মস্তান সহজে দেখা যায় না।

নির্মলা বলে, "জানিস ? বৌদি সর্বদা আত্মহত্যা করতে চান। আমিও চাই রে, যে, বৌদি আত্মহত্যা করুক। চোখে দেখে ওর কষ্ট সহ্য করা যায় না। কতদিন নির্মলা নিজে ওর বৌদিকে কেরাসিন কিনে দিয়েছে। শেফালী বৌদি কতবার বলেছে, আজ আত্মহত্যা করবো, আজ আত্মহত্যা করবো। শেষ অবধি কোনদিনই আত্মহত্যা করতে পারে নি। প্রত্যেক বারই ভয়ে পিছিয়ে এসেছে। শেফালী বৌদি বলে, "বড্ড ভয় করে রে। হাতটা কাঁপতে থাকে। কেরাসিনের বোতলটার ছিপিটাও খুলতে পারি না, হাতটা এত কাঁপে। মরে যেতে বড্ড ভয় করে।"

ভাইটি বলে, "আচ্ছা দিদি, তোর মনে হয় না যে আমাদের দেশে এই যে অসহায় অত্যাচার মেয়েদের উপর হয় সেটাতে শেষপর্যন্ত দেশের সবাইকারই ক্ষতি হয়? তুই ভেবে ছাখ মেয়েদের উপর অত্যাচার করার মানে যে ভারতবর্ষের অর্ধেক লোকের উপর অত্যাচার করা। ছেলে আর মেয়েরা সংখ্যায় তো প্রায় সমান-সমান। একটা জাতি যদি তার অর্ধেক মানুষের উপর অবিচার করে চলে তবে সে-জাতিটা গড়ে উঠবে কি করে বল্ তো ?"

ভাইটি অনেক কথাই বলে। বলে, "বেঁচে থাকতেই তুই দেখবি দিদি, আমি মেয়েদের জন্য কত আন্দোলন করবো। মেয়েদের শিক্ষা দিলে, স্বাস্থ্য দিলে, সাহায্য দিলে আমাদের দেশের চেহারাটাই পাল্টে যাবে। ইস্কুলে পড়ে আর মানুষের কতটা শিক্ষা হয়। মানুষের আসল

শিক্ষা বাড়িতে। সেখানে যদি একটা অজ্ঞলোক, একটা পীড়িত লোক তত্ত্বাবধান করে বাচ্চাদের, তো বাড়িতে কি শিক্ষা হবে মানুষের বাচ্চাদের? ভারতবর্ষের গোড়াতেই তো বেশ ঘুণ ধরেছে। এ-ঘুণধরা জাতের আগায় এখন জল দিয়ে কি হবে? গাছটা বাড়বে কি করে?"

টুটুলের সঙ্গে ভাইটি চিঠিপত্রের আদানপ্রদান করে। বুবলার সঙ্গেও। তবে টুটুলের স্বদেশ-প্রীতি বুবলার থেকে বেশি। কী করে আমাদের দেশের কতগুলো অন্যায় রীতিনীতি বদল করা যায় তাই নিয়ে দু'জনের কত চিঠি চালাচালি। টুটুল দেশে এলে দু'জনে নিভৃতে কত কল্পনা, মন্ত্রণা। ভাইটি টুটুলকে বলবে—"কবে তুমি দেশে ফিরবে? ও-দেশে পড়া শেষ করে ফেরার কি দরকার? আমাদের দেশে কি আর পড়ে শিক্ষিত হওয়া যায় না! আমরা কি সব মূর্খ?"

টুটুল বলে, "ভাইটি, তুই কবে বড় হবি? আমি আর তুই ঝাণ্ডা নিয়ে নেমে যাবো। আমাদের সঙ্গে চলবে দেশের সব প্রগতিশীল মানুষজন। সব নিপীড়িত নারী।"

ভাইটি বলবে— "টুটুলদি, শুধু সেই দিন দেখবার জন্যেই আমি বেঁচে থাকবো। কিছুতেই মরবো না। আমার এ-রোগ সারবেই সারবে। তোকে বলেদিলাম টুটুলদি। নয়তো আমি জন্মেছি সেটা নিরর্থক হয়ে যাবে। আমি জন্মেছি শুধু ঐ শেফালী-বৌদিদের মতো মানুষদের দুঃখ দূর করবো বলে।"

যেদিন কাকু আমাকে গল্প করেছিলেন যে পৃথিবীর ইতিহাসে নারী জাতিই খুবসম্ভব কৃষির প্রথম আবিষ্কার কর্ত্রী— সেদিন আমি বিশ্বাসই করি নি যে কাকু ঠাট্টা করছেন না। আমার অবিশ্বাসে-ভরা-মুখ দেখে কাকু আমাকে বলেছিলেন— "কি রে? বিশ্বাস হচ্ছে না নাকি? তুই তো আচ্ছা নারীবিদ্বেষী দেখছি। নিজের প্রসংশা শুনে নিজেই ঘাবড়িয়ে যাচ্ছিস!"

সত্যি নাকি তাই। মহিলারাই নাকি ধান, গম, ভুট্টার আবিষ্কার-কর্ত্রী। মানুষ তার আগে জঙ্গলে ঘুরে ফলপাকড়, কন্দ, শেকড় কিংবা শাকসব্জি কুড়িয়ে খাবার জোগাড় করতো। অন্য জন্তুর ফেলে-যাওয়া অর্ধভুক্ত জন্তুর মাংস, পাখির ডিম কিংবা পোকামাকড়— এসব কুড়িয়ে বেড়াতো। তাছাড়া কখনও কখনও শিকারও করতো।[১২] কিন্তু মানুষের গায়ের জোর ছিল কম। শিকার ভালো জুটতো না। তাই

শিকার কারও এমনকিছু খাবার জোগাড় সে করতে পারত না। কত সময় খাদ্যের অভাবে অনাহারে মৃত্যু হ'ত তার। আর তাছাড়া শিকারের পেছনে-পেছনে ঘুরতে-ঘুরতে মানুষকে ছুটে বেড়াতে হ'ত এক দেশ থেকে অন্যদেশে। সে ঘর বাঁধবে কি করে? এক জায়গায় কি স্থায়ীভাবে থাকতো সে? ঘর না থাকায় রাত্রে বনে-বাদাড়ে ঘুমোতে হ'ত। রাত্রে মানুষকে বাঘে, সিংহে খেত। নিঃশব্দে থাকতে পারতো না। বাচ্চা কেঁদে উঠতো। জন্তু-জানোয়াররা সাড়া পেয়ে যেত। গন্ধ শুঁকে বলে দিত, কোন্ গাছের পিছনে কোন মানুষটা শুয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। চারটে দেওয়ালের আড়াল তো আর ছিল না। শিকার করা তো দূরের কথা, নিজেরাই বেশির ভাগ সময়ে শিকার হ'ত জন্তু-জানোয়ারের।

এদিকে মেয়েরাও সর্বদা শিকারে যেতে পারত না। সাধারণত তাদের দু'চারটে ছোট ছেলে মেয়ে সর্বদাই সঙ্গে সঙ্গে থাকতো। গর্ভেও থাকতো হামেশাই একটা অনাগত সন্তান। এসব শিশুদের নিয়ে কোথায় কী করে তারা পুরুষদের সঙ্গে শিকারে যাবে। গেলে শুধু নিজেরা বিপর্যস্ত হবে। পুরুষদেরও বিপন্ন করবে। খালি হাতে ফিরে আসতে হবে শিকার না-পেয়ে। জন্তু ধাওয়া করে আসবে। বিদ্বানরা বলেন যে, মেয়েরা নাকি যখন শিকারে যেতে পারতো না সে-সব অবসর সময়ে ক্রমে ক্রমে তারা লক্ষ করতে শিখলো যে একরকমের ঘাস-জাতীয় ওষধী আছে যার বীজগুলো শস্য। ফুটিয়ে খাওয়া চলে। গুঁড়ো করে, শেঁকেও খাওয়া চলে। হয়তো প্রথম প্রথম যে-যে সময় শিকার পাওয়া যেত না— যেমন বর্ষাকালে— শুধু সেইসব সময় মেয়েরা শস্য জোগাড় করে এনে ফুটিয়ে কিংবা গুঁড়ো করে খাওয়া শুরু করলো। কিন্তু ধীরে-ধীরে ওরা বুঝতে শিখলো যে, শস্য জমিয়েও রাখা চলে। দু'একদিনের মধ্যে মাংসের মতো শস্য নষ্ট হয়ে যায় না। তারপর সারা বৎসর ধরে সে-সব শস্য খাওয়া চলে।

শস্য ফলাতে হলে এক জায়গায় পত্তন করতে হয়। আগে মাটি তৈরি হবে। পরে বীজ বুন্‌তে হবে। তারপর কিছুদিন বাদে অঙ্কুর বের হবে। অঙ্কুরের বৃদ্ধি হবে। তবে তো সবশেষে ফলন আসবে। এক জায়গায় না থাকলে চলবে কি করে? ব্যস, মানুষ স্থায়ী হ'ল। আর ভবঘুরে রইল না। সে বাসা বাঁধতে শিখলো। খেতে পেল পেট পুরে।

বাচ্চাকাচ্চারা এখন আর অকালে মরে যায় না। বাচ্চাকাচ্চারা পেট পুরে খেয়ে নিজেরাও বংশ বৃদ্ধি করতে শুরু করলো। মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকলো ক্রমশই। মানুষ স্থিতি পেল। তার স্থিতির সঙ্গে-সঙ্গে এল সভ্যতা। সভ্য হ'ল মানুষ। আর এ-সমস্তের মূলে নারী জাতি, একথা ভুললে চলবে না মানুষ সভ্য হবার মূলে নারী।

সাত

লণ্ডন বিমানবন্দরে আমরা নামলাম। এখানে আমাকে প্লেন বদল করতে হবে। হাতে সময় শুধু এক ঘণ্টা। পাশের ভদ্রমহিলা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। বললেন, "টরোণ্টোতে তো আমিও যাচ্ছি। কী আশ্চর্য যোগাযোগ দেখ! চলো, তুমি আর আমি একসঙ্গে যাই। দাও, দাও, তোমার হাতব্যাগটা আমার হাতে দাও। আমার বুড়ো হাড়ে এখনো খুব জোর আছে। তোমার ব্যাগটা আমি টেনে নিয়ে যেতে পারি। তাছাড়া ওতে তো চাকা লাগানো আছে।"

প্লেনে যাচ্ছি হলে কী হয়! আমার লটবহরের আর শেষ নেই। হাতে একটা ধাক্কোর কোট। গলায় ঝোলানো একটা ক্যামেরা, সবাইকার পাঠানো নানা উপহারে ঠাসা এই ব্যাগটা। তার উপর আছে হুকুমমাফিক বহু জিনিসপত্র কিনে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া। যেমন মির্জাপুরী কার্পেট একটা। ইয়া বড়। কাশ্মিরী কাঠের টেবিল। মাঝখান থেকে আমার জামাকাপড় এনেছি কম। টুটুল নাকি আমাকে জামাকাপড় ধারে পরতে দেবে। আরে বাপু, ওরা তো সব সাহেব-মেমসাহেব ব'নে গিয়েছে। আমার মতো কী আর বঙ্গললনা ওরা, যে ওদের জামাকাপড় চেয়ে আমি পরবো। আর তাছাড়া টুটুলটা গতকাল না হয় আমার মতো কৃশকায় ছিল, কে জানে আজ হয়তো একটা তালগাছ হয়ে গিয়েছে। শত হোক, লোকে বলে আমেরিকার জলে আর আমাদের দেশের দুধে সমান খাদ্য-পুষ্টি।

ট্রানজিট্ লাউঞ্জ লোকে ঠাসা। একরাশ ছোট্ট বাচ্চা দৌড়দৌড়ি করছে। ওরা নাকি স্কুল ছুটি হওয়ায় বোর্ডিং থেকে বাড়ি ফিরছে। পাশের ভদ্রমহিলা বললেন, "ওদের মা-বাবারা এমন সব দেশে চাকরি করেন যেখানে ভালো ইস্কুল-কলেজ নেই। সুইট্জারল্যাণ্ড-এ স্কুলে

পড়ে ওরা। এখন হয়তো কেউ দক্ষিণ আমেরিকা, কেউ আফ্রিকা, কেউ নেপাল, কেউ ভারতবর্ষে ফিরে যাচ্ছে। মা-বাবার কাছে ছুটিতে।

একদল ময়লা-ময়লা জামাকাপড়-পরা আমার বয়সী মেয়ে একধারে বসে ছিল। ক্লান্ত সব চেহারা। স্তূপীকৃত মাল তাদের চার পাশে ছড়ানো। পেরেক দেওয়া জুতো, দস্তানা, টুপি। তাঁবুও অনেকগুলো রয়েছে বাঁধা। আর স্লিপিং-ব্যাগ (sleeping bags)।

ভদ্রমহিলা বললেন, "ওরা সব সুইট্জারল্যাণ্ডে পাহাড়ে চড়তে গিয়েছিল। যাকে বলে mountaineering, এক-দু'হপ্তা পাহাড় বেয়ে এখন বাড়ি ফিরছে।" ভদ্রমহিলা আরো জানালেন যে সুইট্জারল্যাণ্ড থেকে নিশ্চয়ই একটা প্লেন এইমাত্র এসেছে।

ব্যস্ত সব ভদ্রলোকেরা অ্যাটাচিকেস হাতে হনহন করে এগিয়ে চলছে। ভদ্রমহিলারাও এখানে কম ব্যস্ত নন। তাঁরাও চলছেন হনহন করে। একদল ছেলেমেয়ে বসে আছে। ওরা সবই পত্রিকা-অফিসের যুদ্ধের সংবাদদাতা। প্রাণের মায়া নেই। সবাই চলেছে ইরাক, ইরানে। সেখানে যুদ্ধ হচ্ছে, টাটকা খবর চাই।

ভদ্রমহিলা আমাকে আইসক্রিম কিনে খাওয়ালেন। তারপর বললেন, "তুমি একটু বোসো। আমি টয়লেট থেকে একবার ঘুরে আসি। প্লেনে আমি বাথরুমে ভালো করে ব্যবহার করতে পারি নি।

আবার আমরা নতুন প্লেনে চড়লাম। আবার আমাদের প্রাতরাশ দেওয়া হ'ল। আবার আমরা প্রাতরাশ খেলাম পেট ভ'রে। ভদ্রমহিলা বললেন, "সব যাত্রী তো আর বম্বে থেকে আসে নি। যেসব যাত্রী নতুন করে এখানে প্লেনে উঠেছে, তাদের তো প্রাতরাশ খেতে দিতে হবে। কোন্ ভোর সকালে সব এসেছে বিমানবন্দরে। অবিশ্যি প্রাতরাশ খাবার পক্ষে অনেক বেশী বেলা হয়ে গিয়েছে।"

প্রাতরাশের পালা চুকিয়ে মনে মনে ভাবলাম, বিদেশে যাচ্ছি বলে একটা উন্নতি আমার হয়েছে, খাবার দেখলেই খিদে পেয়ে যাচ্ছে।

এবারের প্লেনে আমাদের পাশে একটি বাচ্চা ছেলে উঠেছে। ছেলেটি বসে-বসে নিঃশব্দে কাঁদছিল। খাবার মুখেও তুললো না। খালি বলতে থাকলো যে পেটে ব্যথা করছে। আমার পাশের ভদ্রমহিলা বাচ্চাটিকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এক-গেলাস দুধ খাওয়ালেন।

প্রত্যেকটি এয়ার-হোসটেসই এবার নতুন। এতক্ষণে আমারও ঘুম পাচ্ছে একটু-একটু। নিচে অতলান্তিক সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। শুধুই জল। কয়েকটা জাহাজ চলছে একটার পর একটা লাইন করে। ফেনার লম্বা-লম্বা ফিতে প্রত্যেকটা জাহাজের পেছন দিকে।

অনেকক্ষণ বাদে দেখলাম, বাচ্ছা ছেলেটি বুকপকেট থেকে দুটো রঙিন ফোটোগ্রাফ বের করলো সন্তর্পণে। প্রথম ছবিটিতে মা আর বাবার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বেলুন-হাতে ছেলেটি। আর দ্বিতীয় ছবিটিতে একপাশে একটি বাচ্চা মেয়ে, আর তার পাশে ছেলেটির মা। ছেলেটি বলল— বাচ্চা মেয়েটির নাম মলি। মলি ওর বোন্। বলল, "মলি মা-র সঙ্গে থাকে।" ব'লে আবার নিঃশব্দে কাঁদতে থাকলো। ছেলেটি আরও বলল যে, ওর বাবা-মা'র বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে। ওর মা এখন লণ্ডন-শহরে থাকেন। ছেলেটি মা-র কাছে ছুটির বন্ধে বেড়াতে এসেছিল। এখন ফিরে যাচ্ছে টরোনটো শহরে ওর বাবার কাছে। পাশের ভদ্রমহিলা বুঝিয়ে বললেন, "ছবিগুলো এখন তুলে রাখো। পরে দেখবে।" ছেলেটি তাঁর কথা শুনল না। বলল, "মা এখন পিটারকে বিয়ে করেছে। মলি মা-র সঙ্গে থাকে", বলে আবার কাঁদতে থাকলো।

মেজোমেসো বলছিলেন, "আমরা যেসব ফসিল পেয়েছি তাতে দেখেছি যে সাধারণত গড়পড়তা বাইশ বৎসরের মধ্যেই তখনকার দিনের মানুষবৎরা মরে যেত। তার থেকে আমরা এটাই অনুমান করি যে, সামাজিকভাবে ছোট শিশুদের ভরণপোষণ করার রেওয়াজ আমাদের মধ্যে সেকালেই উদ্ভব হয়েছিল। কারণ, বাইশ বৎসর বয়সে যে-ভদ্রমহিলা মারা যাবেন, আশা করা যায় যে, তাঁর বাচ্চার বয়েস কিছুতেই আট, নয় বৎসরের বেশি হতে পারে না। অথচ এই আট নয় বয়সের শিশুটি নিশ্চয়ই নিজে কুড়িয়ে কিংবা শিকার করে নিজের ভরণপোষণ করতে পারতো না। সুতরাং, আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে— তখনকার কালে হয়তো আমাদের মধ্যে সামাজিকভাবে অনাথ আত্মীয়দের ভরণপোষণ করার রেওয়াজ ছিল।"

আমি বললাম, "কী করে জানলে যে তখনকার দিনের মানুষবৎদের গড়পড়তা আয়ু মোট বাইশ বৎসর ছিল?"[১৩]

মেজোমেসো বললেন, "যতই কেন না আমরা খুঁজে বেড়াই

ফসিল তো আর আমরা বেশি পাই না। যা পাই তার মধ্যে বেশির ভাগই দাঁত। দাঁতই সবচাইতে মজবুত জিনিস। সহজে নষ্ট হয়ে যায় না। বাঘে সিংহেও খেতে পারে না। দ্বিতীয় স্তরের মানুষবৎ-এর কমপক্ষে চারশো পাটি দাঁত আমরা পেয়েছি। আর সে-সব দাঁতের বয়েস হিসাব করে আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছি, যে তখনকার দিনেব মানুষবৎ-এর গড়পড়তা আয়ু ছিল বাইশ বৎসর।

মেজোমেসো বললেন, "তাছাড়া আর-একটা মজা কি জানো? একটা পূর্ণবয়স্ক শিম্পাঞ্জীর মগজের ওজন এক পাউণ্ড। সে-তুলনায় একটা নবজাত শিশু যদি দশপাউণ্ড ওজনেরও হয়, জন্মের সময়ই শুধু তার মগজের ওজন হবে প্রায় এক পাউণ্ডের মতন। অথচ দেখ, একটা সাবালক শিম্পাঞ্জী তার ঐ একপাউণ্ড ওজনের মগজ নিয়ে লাফ-ঝাঁপ, বাচ্চা মানুষ করা, শিকার করা, নিজেকে রক্ষা করা, মা-র সঙ্কেত ভাষায় কথা বলতে শেখা— সব করতে পারে। অথচ ঐ একপাউণ্ড মগজ থাকা সত্ত্বেও একটা নবজাত শিশু কী অসম্ভবভাবে অসহায়। সে মাথা তুলতে পারে না, পাশ ফিরতে পারে না, দেখে চিনতে পারে না।[১৪] এককথায় শিম্পাঞ্জীর তুলনায় সে একটা অপদার্থ। যতদিন না সে অনেকটা বড় হচ্ছে তাকে কাউকে না কাউকে দেখে রাখতে হয়। তার যদি নিজের মা না থাকে তো আশপাশের সবাইকে তাকে দেখে খাইয়ে পরিয়ে রাখতে হয়।

বাচ্চাটা যত বড হবে, পূর্ণবয়স্ক হওয়া অবধি তত বড় হতে থাকবে ওর মগজটা। একটা পূর্ণবয়স্ক পুরুষ মানুষের মগজের ওজন হয় প্রায় সোয়া-তিন পাউণ্ড। একটা পূর্ণবয়স্ক মহিলার মগজের ওজন তার থেকে একটু কম। কারণ, পুরুষ মানুষদের থেকে মহিলাদের গায়ের ওজনও কম।

আসলে কিন্তু শুধুমাত্র মগজের ওজনের ওপর বুদ্ধি নির্ভর করে না। রাশিয়ান লেখক টুর্গেনিভের মগজ ছিল বিরাট বড়। আবার ফরাসী লেখক আনাতোল ফ্রান্স-এর মগজ ছিল অসম্ভব ছোট। আইন-স্টাইনের মগজ ছিল মাঝারি।

মেজোমেসো বলেন যে, "রিচার্ড আমাকে একটা কথা বলেছেন। সবাই বলে মগজ-বিস্ফোরণের জন্যই মানুষ ধীরে-ধীরে হাতিয়ার তৈরি করতে শিখলো। এই হাতিয়ার শুধু যুদ্ধ করার হাতিয়ার নয়। এটা তাকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করে। এই হাতিয়ার দিয়ে সে জন্তু

জানোয়ারের ছাল ছাড়ায়, মাংস টুকরো-টুকরো করে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটরা করে খায়। এই হাতিয়ার ঠুকে ঠুকে সে আগুন জ্বালায়। নিজেকে জন্তু জানোয়ারের ভয় থেকে রক্ষা করে। পরে যখন সে কৃষিকর্ম আরম্ভ করলো তখনও এই হাতিয়ার দিয়ে সে মাটি খুঁড়তে শিখলো, ধান কাটতে শিখলো, ঘর বাঁধতে শিখলো। আর রিচার্ড বলেন যে, মগজ-বিস্ফোরণের সঙ্গে এই হাতিয়ারের সম্পর্ক আছে সেটা ভুল নয়। কিন্তু প্রচণ্ড বেশি রকমের সম্পর্ক ছুটোর মধ্যে নেই কিন্তু। সাধারণত বলা হয় যে, মগজ একটু বেড়েছে। সেইসঙ্গে নতুন-নতুন হাতিয়ার আবিষ্কার হয়েছে। এইসব হাতিয়ার চালনা করতে গিয়ে মগজের কোষের আবার বৃদ্ধি হয়েছে। অর্থাৎ মগজটা বেড়েছে। আর আবার তাই নতুন-নতুন আরও-আরও হাতিয়ার আবিষ্কার হয়েছে।

"মগজ থেকে হাতিয়ার। হাতিয়ার থেকে মগজ। এইরকম করতে-করতে বিরাট একটা মগজের উদ্ভব হয়েছে আমাদের। যাকে বলে মগজ-বিস্ফোরণ। আগেই বলেছি যে, আমার ভারতীয় বন্ধুটি বলে যে মানুষবৎ থেকে মানুষ হয়েছে, তার মূল কারণ মানুষের হাত হাতিয়ার ধরেছে। হাতিয়ারের জন্যই মানুষবৎ মানুষ হয়েছে। কিন্তু রিচার্ড সেকথা মানেন না। এর সম্বন্ধে রিচার্ড বলেন যে, — আজ থেকে তিরিশ লক্ষ বৎসর আগেকার মানুষবৎ-এর বসতি খুঁজে ওঁরা পেয়েছেন শুধু ছুটো-একটা পাথরের চাঁই কিংবা শুধু কয়েক রকমের পাথরের পাতলা খুর-জাতীয় হাতিয়ার।[১৫] তার তুলনায় আজ থেকে দশ লক্ষ বৎসর আগেকার মানুষবৎ-এর বসতিতে ওঁরা পেয়েছেন বড় জোর গোটা বারো হাতিয়ার। অথচ প্রথম মানুষবৎ-এর পূর্ণবয়স্ক মগজ থেকে দ্বিতীয় মানুষবৎ-এর পূর্ণবয়স্ক মগজের আয়তন প্রায় ছ'গুণ বেশি। যখন মগজ বেড়েছে ছ'গুণ, তখন যে-কেউই আশা করবে যে হাতিয়ারও বাড়বে বহুল পরিমাণে। অথচ তা হয় নি। সেইজন্য রিচার্ড আর একটার ওপর নির্ভর করে না। তেমনি দশ লক্ষ বৎসর আগেকার হাতিয়ারের সঙ্গে তুলনা করলে আজ থেকে আড়াই-লক্ষ বৎসর আগেকার হাতিয়ার দেখলে দেখা যায় যে এবার তো হাতিয়ারের সংখ্যা বেড়েছে খুব যৎসামান্য। অথচ এই সময়ের মধ্যে মগজের আয়তন বেড়েছে প্রায় তিন ভাগের একভাগ। রিচার্ড বলেন, আসলে মগজ বেড়েছে, কারণ মানুষ সামাজিক জীব। একসঙ্গে সমাজবদ্ধ হয়ে

বাঁচতে গেলে প্রয়োজন পড়ে একজনের আরেকজন কী ভাবছে সেটা আন্দাজ করবার। একটা গাছ কী করে ধীরে-ধীরে সময়ের সঙ্গে বড় হবে, কিংবা একটা শিকার কী করে সামনে থেকে দৌড়ে পালিয়ে যাবে, এসব জানতেও বুদ্ধি লাগে। সে-সম্বন্ধে মতভেদ নেই। কিন্তু তার থেকেও অনেক বেশি বুদ্ধি লাগে জানতে, যে একটা মানুষ এক্ষুনি কী করে বসবে, কিংবা কখন রেগে যাবে হাউমাউ করে, কখন হেসে উঠবে খিলখিল করে, কখন বজ্জাতি করবে, কখন ভালো মানুষটি হয়ে যাবে। অথচ এই যে আট নয় বয়সের অনাথটির কথা বলছিলাম, ওর সবটুকু বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন, ওর বুঝতে শেখা যে ওর চারপাশের আত্মীয়স্বজন সবাই কে কেমন মেজাজে আছে, কেমন-কেমন চিন্তা ওদের মাথায় খেলে বেড়াচ্ছে। কেমন-কেমন ভালোমানুষি দেখালে ওরা ওদের আনা কুড়ানো খাবার থেকে কিংবা শিকার থেকে এক টুকরো কচু, কিংবা পাখির একটা ডিম কিংবা একটা মাংসের টুকরো ওই অনাথটিকে খেতে দেবে।

"রিচার্ড বলেন— অনেক কারণেই মগজ-বিস্ফোরণ হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে একটা মুখ্য কারণ হ'ল মানুষের সামাজিক জীবন-যাত্রা। তাদের অসহায় শৈশব আর তাদের স্বল্প আয়ু। সেইসব বাচ্চারাই বেঁচে থেকেছে যাদের হঠাৎ করে মগজের কোষের বৃদ্ধি হয়েছে যাতে করে চার পাশের সবাই কে কী ভাবছে সেটা বাচ্চাটা বুঝতে পেরেছে। যত সে বুঝতে চেষ্টা করবে ততো সে মগজকে বেশি খাটিয়েছে। ততো তার মগজের কোষের প্রয়োজন বাড়ছে। বড় মগজ হয়েছে বলে সে বুঝতে শিখেছে, আর বুঝতে শিখেছে বলে তার মগজের আকার বড় হয়েছে। প্রথমটার জন্য দ্বিতীয়টা হয়েছে, আর দ্বিতীয়টার জন্য প্রথমটা হয়েছে। রিচার্ডের মতে মগজ-বিস্ফোরণের কারণ মানুষের সামাজিক জীবনযাত্রা।"

আমি বললাম, "তুমিও কি সেই একই কথা বলো?"

মেজোমেসো বললেন, "হ্যাঁ। তবে ক'দিন আগেও আর-একটা কথা আমি বলতাম। সে-কথাটা আগে তোমাকে বলবো। যদিও এখন মনে হয় যে রিচার্ডই হয়তো ঠিক কথা বলছেন। কারণ রিচার্ডের মতো এখন আরও দু'চারজন বৈজ্ঞানিকও একই কথা বলছেন। বিজ্ঞান-জগতে তো আর শেষ কথা জানা যায়না। নতুন-নতুন মতামত সময়ের সঙ্গে

পালটাতে-পালটাতে চলতে থাকে। শেষ কথা আমি নিজেও জানি না। তোমাকেও বলতে পারবো না।”

মেজোমেসো আরও বললেন —“আমাদের বৈজ্ঞানিকদের খোলা মন নিয়ে কাজ করতে হয়। যখন-যখন যেমন-যেমন সন্ধান আমরা পাবো, যখন-যেমন আবিষ্কারের খবর আমাদের কাছে পৌঁছোবে, তখন-তখন তেমন-তেমন মতবাদ আমরা তৈরি করবো। আমি তোমাকে আগেই বলেছি যে, মানুষের জন্মকাহিনী কতবার কতরকমের ক্রমনিকা করে সাজিয়েছি। এই সাজানোর শেষ সাজানো নেই। আমরা মনের দরজা সর্বদা খুলে রাখি। রাজনীতিজ্ঞদের মতন এই কথাটাই শেষ কথা, এটা বলবার মতো স্পর্ধা আমাদের নেই। আসলে আমরা এ-ব্যাপারে দার্শনিকের পর্যায়ে পড়ি। আমাদের শুধু অন্বেষণ। শুধু পথ-পরিক্রমা। তীর্থে পৌঁছানো আমাদের ঘটে ওঠে কখনো-সখনো।”

সিনেমা দেখাচ্ছে প্লেনে। বাচ্চা ছেলেটি এতক্ষণে একটু ঘুমিয়েছে। কতরকমের যে খেলনা দিয়ে গেছে ওকে হোসটেস্‌রা কতবকমের, ওর সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করতে চেষ্টা করছে। ও মাথা নিচু করে বসেছিল। একটা খেলনাতেও হাত দেয় নি। সবগুলো ওর পায়ের কাছে এখন ছড়িয়ে পড়ে আছে। বাচ্চাটি ঘুমুছে এখন। চোখের কোণে ওর জলের অস্পষ্ট রেখা। আমার পাশের ভদ্রমহিলা একটা কম্বল চেয়ে নিয়ে বাচ্চাটির শরীরটা ভালো করে ঢাকা দিয়ে দিলেন। বেশ শীত-শীত করছে।

আট

সবাই সিনেমা দেখবে বলে প্রস্তুত। আমাকেও এয়ার-হোস্‌টেস জিজ্ঞেস করে গেল, আমি চেয়ার বদল করে ভালো জায়গায় গিয়ে বসতে চাই কিনা সিনেমা দেখবো বলে। কানের যন্ত্রটা লাগিয়ে কী করে সিনেমার কথা শোনা যায় সে-কথাও বুঝিয়ে দিল। আমি ধন্যবাদ দিলাম, কিন্তু বললাম— আমি জানালার পাশেই বেশ আছি। জানালা দিয়ে যদিও সমুদ্র ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছিল না।

মেজোমেসো বলছিলেন— “ছ্যাখো, মগজের আসল ওজনের ওপর বুদ্ধি নির্ভর করে না। তাহলে একটা হাতি কিংবা একটা তিমি মাছ

একটা মানুষের থেকে অনেক বেশি চালাক হ'ত। যখন একটা মানুষের মগজের ওজন প্রায় সোয়া-তিন পাউণ্ড, একটা হাতির মগজের ওজন প্রায় উনিশ পাউণ্ড। অথচ একটা হাতি কিংবা একটা তিমি কি আর একটা মানুষের মতো চালাক? তা না। আসলে ওজনটাই সবচেয়ে মুখ্য কথা নয়। সবচেয়ে মুখ্য হ'ল যে শরীরের ওজনের তুলনায় মগজটার ওজন কত? এটা জানলে আমরা জানতে পারি কে কতটা চালাক! কার কতটা বুদ্ধি।

"একটা পূর্ণবয়স্ক মানুষের ওজন ধরো একশো পঞ্চাশ পাউণ্ড। আর তার মগজের ওজন হবে তিন পাউণ্ডের একটু বেশি। তাহলে অঙ্ক কষে অনুপাতে আমরা বলবো যে, মানুষের শরীরের অনুপাতে মগজ পঞ্চাশ—এক-একটা হাতির শরীরের ওজন সাধারণত আমরা দেখি প্রায় এক টনের মতো। একটা তিমির শরীরের ওজন প্রায় পাঁচ টন। তাহলে হিসেব করলে অনুপাতে দেখা যাবে যে হাতির আর তিমি মাছের খুব কাহিল অবস্থা। মানুষের সবচাইতে নিকট-আত্মীয় শিম্পাঞ্জীর অবস্থা অবশ্য মানুষের থেকে অনেক খারাপ। তবু হাতি কিংবা তিমি মাছের তুলনায় সে অনেক উঁচু স্তরে আছে। একটা পূর্ণবয়স্ক শিম্পাঞ্জীর ওজন প্রায় একশো পঞ্চাশ পাউণ্ড। তাহলে অনুপাতে দাঁড়ায় ওদের শরীর, মগজ – ১৫০ : ১।"

আমি বললাম, "তাহলে বলছো, আমাদের অনুপাতটাই সব জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে সবচাইতে বেশি?"

মেজোমেসো বললেন, "না, আরও কতগুলো জীব আছে যাদের শরীরের অনুপাতে মগজটা মানুষের থেকেও ভালো। একরকমের ছোট বাঁদর আছে যাদের এই অনুপাতটা হচ্ছে ১৭ : ১। এরা যদি মানুষের মতো বড় শরীরের হ'ত তবে এদের মগজটার ওজন হ'ত সাড়ে-আট পাউণ্ড। হামিং বার্ড (Humming bird) বলে একরকম টুনটুনির থেকেও আরও ছোট পাখি আছে, তাদেরও শরীরের তুলনায় মগজটা বিরাট।"

আমি বললাম, "কিন্তু ওরা তো আমাদের থেকে বেশি বুদ্ধিমান না। ওদের তো সভ্যতা নেই। ওদের তো ঘরদোর, খেত-খামার, কল-কারখানা কিছুই নেই। ওদের বিজ্ঞান নেই। ওদের কলাবিদ্যা নেই, ওরা ছবি আঁকে না। সেতার বাজায় না। ওরা দার্শনিক হয় না।"

মেজোমেসো বললেন, "মগজের মধ্যে বিরাট-বিরাট ভাগ আছে। এর মধ্যে বিস্তৃত একটা অংশ জুড়ে কাজ চলছে অহরহ, শুধু শরীরটা পোষণ করার জন্য। ফুসফুস নিশ্বাস নিচ্ছে। পাকস্থলী হজম করছে। রক্ত পাঠানো হচ্ছে হৃদযন্ত্র দিয়ে শরীরে, মাথা থেকে পা অবধি। আঙুলটা কেটে গেলে জোড়া লাগছে আবার। অসুখে রোগা হয়ে গেলে পরে আবার মোটা হচ্ছি আমরা। আমরা যে দু'পায়ে খাড়া হয়ে আছি, ধপাস করে পড়ে যাচ্ছি না সেটাও মগজকে কষ্ট করে বজায় রাখতে হয়। শরীর যে ৯৮° তাপমাত্রায় থাকে, সেটাও মগজকে কষ্ট করে বজায় রাখতে হয়। মগজ কত লক্ষ লক্ষ কাজ করে। লিস্ট করে লিখে দিলে পাতার পর পাতা শেষ হবে। এসব কাজকে বলা হয় মগজের গৃহস্থালির কাজ। শরীরটা যেন মগজের গৃহ। মগজটা যে গৃহকর্ত্রী। মগজকে সারাটা জীবন শরীরটার দেখাশুনো করতে হয়।

"এসব গৃহস্থালীর কাজের জন্য মগজের একটা নিম্নতম আয়তন আছে। তার থেকে মগজ যদি আরও ছোট হয়, তাহলে এসব বিশ্বাস নেওয়া, রক্ত-সঞ্চালন করা, খাবার হজম করা, ইত্যাদি ছোটোখাটো গৃহস্থালীর কাজও মগজ করতে পারবে না। তা তার শরীর আর মগজের অনুপাত যতই কিনা উঁচুদরের হোক। আর সেই জন্যই ছোট বাঁদর কিংবা হামিং বার্ড-এর শরীর মগজ উঁচুমান-অনুপাত হওয়া সত্ত্বেও সেটা ওদের কোন কাজে দেয় না। ওরা আমাদের থেকে বেশি চালাক নয়। বরং অনেক নিচুস্তরের প্রাণী। ওদের মগজ গৃহস্থালির কাজই শুধু করে উঠতে পারে।"

মেজোমেসো আরও বলেছিলেন— "এ-অবধি আমরা মোট দুটো প্রাণী পেয়েছি যারা হয়তো বা মানুষের সমকক্ষ হলেও হতে পারে। ওরা ছোট বাঁদর কিংবা হামিং বার্ড-এর মতো এত অসম্ভব ছোট না যে ওদের মগজ শরীরের অনুপাতে যতই কেন না বড় হোক, সেই মগজটা শুধু শরীরের গৃহস্থালীর ন্যূনতম কাজটুকু করে উঠতেই হিমসিম খেয়ে যাবে। এবার যাদের নাম করবো তারা যথেষ্ট বড় সব। অথচ এদের শরীর আর মগজের অনুপাত-এর হারটাও মানুষের মতো উঁচুদরের।"

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম— কোন্ কোন্ প্রাণী এ দুটো?

মেজোমেসো উত্তর দিয়েছিলেন—.এরা শুশুক জাতীয় প্রাণী। এরা তিমি মাছের স্বগোত্রীয়। এদের মধ্যে কেউ-কেউ মানুষের থেকে

আকারে বড় হয় না। অথচ অনেক সময় মানুষের থেকে এদের বড় মগজ হয়। এমনকি পোনে-চার পাউণ্ড অবধি বড়। আর মগজের খাঁজগুলোও এদের অনেক বেশি ঢেউ-খেলানো।

আমি শুনে তো থ মেরে গেলাম। অভিমান করে বললাম—"তবে ওরা কি মানুষের মতো চিন্তাশীল? ওরা কি আমাদের মতো কথা বলতে পারে? ওদের মধ্যে কি কেউ মহাভারত লিখেছে? ওদের মধ্যে কেউ কি আইনস্টাইন হয়েছে? ওদের মধ্যে কেউ কি রানা-প্রতাপের মতো যুদ্ধ করেছে?"

মেজোমেসো বললেন— "হ্যাঁ, এটাই বৈজ্ঞানিকদের কাছে একটা কুহেলিকা। ওদের ঐ বিরাট অনুপাতের বড় মগজটা দিয়ে ওরা যে কী করে, সেটা বোঝা যাচ্ছে না এখনও। শুশুক নাকি মনের ভাব আদান-প্রদান করতে পারে। লিলি নামক এক বৈজ্ঞানিক বললেন যে, ওদের ভাষা আছে। সে-ভাষা আমাদের মতোই তাৎপর্যপূর্ণ। আবার অনেকে বলেন যে, নিয়ানডারথাল মানুষের মতো শুশুকের মগজের গঠনটা অন্য ধরনের। সুতরাং বড় হলেও ওদের মগজটা অন্যভাবে কাজ করে। মানুষোচিত চিন্তা ওরা করতে পারে না। ওদের চিন্তা-পদ্ধতিটাই ভিন্ন রকমের।

"আমরা আমাদের পাঁচটা ইন্দ্রিয় দিয়ে যেটা না পাই সেটা বুঝতে পারি না। হয় আমাদের দেখতে হবে, নয় আমাদের শুনতে হবে কিংবা শুঁকতে হবে, চাটতে হবে কিংবা স্পর্শ করে জানতে হবে। অথচ ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য অনেক-কিছু পৃথিবীতে ঘটে। মৌমাছিরা আলট্রা-ভায়োলেট রঙে রং করা জিনিস দেখতে পায়। সেটা কেমন দেখা আমরা জানি না। আমরা যেসব শব্দ শুনতে পাই তার থেকেও উঁচু আলট্রাসনিক আওয়াজ বা গান ইঁদুর, বাদুড় কিংবা পাখিরা শুনতে পায়। অথচ সেসব শব্দ আমরা কখনও শুনতে পাই না। চামচিকেরা শব্দের বান ছুঁড়ে ছুঁড়ে সে-শব্দের প্রতিধ্বনি শুনে বুঝতে পারে কোন্ জায়গাটায় কোন্ বাধাটা আছে। আমরা কখনও এইরকম করে শুনতে পাব না। তবে যতটুকু পরিধির মধ্যে মানুষের কান শুনতে পায়, সেটুকুর মধ্যে আমরা শুনি অসম্ভব ভালোভাবে। আমরা যতরকমের ভাষা বা যন্ত্রসংগীতের তারতম্য বুঝতে পারি, তেমন অন্যান্য পশুরা পারবে না। শুধু যদি বুঝতে না পারতো তবে ভাষা কিংবা সংগীতের

উদ্ভব হ'ত না মানুষদের মধ্যে। সেইরকম হয়তো এসব শুশুকদের মগজ দিয়ে ঠিক কোন্ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে তারা বাস করে তার খবর কে পাবে! এরা নাকি অপূর্ব সব সংগীত রচনা করে জলের ঢেউয়ে ঢেউয়ে। একজন আর-একজনকে নাকি গান শুনিয়ে বেড়ায়। আর তাছাড়া চিন্তাশীল হওয়াটাও কত রকম-বেরকমের হতে পারে। কিংবা কে জানে হয়তো তারা আমাদের থেকেও অনেক বেশি অনুভূতিশীল। আমরা ভয় পাই, ভালোবাসি, রাগ করি, আরও কত কী! ওরা না জানি কি-কি করে। আমাদের সীমিত অনুভূতি নিয়ে হয়তো সে-সবের খবর কোন-দিনও আমরা পাবো না। হয়তো ওরা দার্শনিক। সংগীতে দর্শন রচনা করে। হয়তো সৌন্দর্যের পূজারী। কে জানে, ওদের মগজ ওদের কাছে পৃথিবীটা কেমন রঙে রঞ্জিত করে দেখায়। কিছু-একটা নিশ্চয় করে। নয়তো ওদের মগজটা এত ভালো অনুপাতের কী করে হ'ল?"

নয়

হঠাৎ চমকে উঠে ঘুমটা ভেঙে গেল। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানতেও পারি নি। দেখলাম সিনেমা দেখানো শেষ হয়েছে। এয়ার-হোসটেস্‌রা দ্বিপ্রহরের খাবার দিচ্ছে। কাঁটা-চামচের টুংটাং আওয়াজ। বিভিন্ন রকমের মুখরোচক খাবার গরম করার সুগন্ধ দূরের প্যানট্রি থেকে ভেসে আসছে। আমাদের পাশের বাচ্চা ছেলেটি ঘুম ভেঙে অনেকক্ষণ জেগে উঠেছে। পাশের ভদ্রমহিলার সঙ্গে খুব নিচু গলায় কথা বলছে এখন। শুধু তাই না, বাচ্চাটির মুখে হাসির নির্মল আলোও দেখা যাচ্ছে। ওরা দু'জন গল্প করছে টরোন্টো শহরের। কোথায় যেন দু'জনে একবার সাঁতার কাটতে একই দিনে গিয়েছিল। গত গ্রীষ্মের ছুটিতে। কী আশ্চর্য কথা। একই দিনে দু'জনে ঐ একই পার্কে সারাদিন ছিল। নৌকো চালিয়েছে। সাঁতার কেটেছে। ভদ্রমহিলা জিজ্ঞেসা করলেন—"বুড়ির মাথার পাকা চুল খেয়েছিলে তুমি? আমি খেয়েছিলাম দুটো।" ছেলেটি হেসে উঠল বেশ জোরে। বলল— "আমি শুধু একটা খেয়েছিলাম। কিন্তু আইসক্রীম খেয়েছিলাম দুটো।"

এবার হাসবার পালা ভদ্রমহিলার। তিনি বললেন— "না আমি মোটে একটা আইসক্রীম খেয়েছিলাম।" ভদ্রমহিলা জিজ্ঞেস করলেন

"তোমার নৌকোর কি রং ছিল ?" ছেলেটি অনেকক্ষণ ধরে ভেবে বলল, —"বোধহয় হলুদ।" ভদ্রমহিলা হেসে উঠবার আগে ছেলেটি আবার জোরে হেসে উঠলো। ভদ্রমহিলা বললেন—"কী আশ্চর্য দেখ। আমার নৌকোর রঙটাও··· ।"

ওরা গল্প করেই চলল। ছেলেটি গল্প করতে করতে খাওয়া শেষ করলো বেশ পরিপাটি করে। এতক্ষণে ও ভুলে গিয়েছে ওর মা'কে ছেড়ে আসার ব্যথা। মলিকে ছেড়ে আসার দুঃখ।

মেজোমেসো বলছিলেন, "মানুষের মগজটা যে শুধু বড় তাই নয়। মানুষের স্মরণশক্তিও অসম্ভব বেশি। মানুষের মগজে দশ বিলিয়ান খবর সংগ্রহ করবার মতো কোষ আছে[১৬]।" বিশদ বোঝাবার জন্য বলছিলেন— "ধরো, একটা পাতার রং সবুজ, এটা জানা একটা সংবাদ জানা। একটা টেবিলের চারটে পা আছে। এটা জানলেও একটা সংবাদ জানা হ'ল। চারটে বাজলে ইস্কুলের ছুটি হয়, সকালবেলায় দাঁত মাজতে হয়, দিল্লি যেতে হলে ট্রেনে চড়তে হয়। পুজার সময় শিউলি-ফুল ফোটে, দূরদর্শনে একটা ভালো গান বাজবে—এই প্রত্যেকটাই একটা করে সংবাদ জানা। মানুষের মগজ কম করে ১০০,০০,০০০^{৩} (trillion 10) সংবাদ জেনে মনে রাখতে পারে। অনেক খবর সে ভুলে যায় জন্মের মতো। অনেক খবর তার মনের মধ্যে চাপা পড়ে থাকে। দরকার মতো উদ্ধার করতে পারে। অনেক খবর তার অহরহ মনে থাকে। নিজের নাম। বাড়ির ঠিকানা। বাবা-মা-র চেহারা, চিরুনিটা কোথায় রেখেছে কিংবা তার শোবার ঘরের আলো জ্বালাবার সুইচগুলো কোথায়।

"একটা বেজির মতো প্রাণী আছে যার নাম রেকুন[১৭] (Racoon), সে আধ-মিনিটের বেশি কোন-কিছু মনে রাখতে পারে না। একটা বাঁদর সে-জিনিসটা পুরো একটা দিন মনে রাখতে পারে। অথচ মানুষের কী অসম্ভব স্মরণশক্তি দেখ। তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি।" বলে মেজোমেসো বারান্দার ওপাশে ঠামা ছিলেন তাঁর কাছে আমাকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। ঠামা রোদে বড়ি শুকোতে দিচ্ছিলেন। মেজোমেসোকে দেখে মাথায় ঘোমটা তুলে দিলেন। বললেন, "চা খাবে বাবা ?" মেজোমেসো বললেন, —"না, চা খাবো না। আপনার সব থেকে ছোটবেলার বন্ধুর কথা কি আপনার মনে আছে ? সেই বন্ধুর কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি।"

ঠামা বললেন, "তা মনে আছে বৈ কি!" ঠামা খুব আস্তে-আস্তে মনে করে-করে বলতে থাকলেন— "তখন আমরা গ্রামে থাকতাম। পেনেটির কাছে একটা গ্রাম। মেয়েটির নাম ছিল নূপুর। কালো রঙ। হাতে সোনার মোটা-মোটা ছটো বালা পরতো। সর্বদা আলতা লাগাতো পায়। ওর মা খুব পান খেতেন। জর্দা আনাতেন কাশী থেকে। ওর বাবার কলকাতাতে খুব বড় একটা কাপড়ের দোকান ছিল। নূপুররা চোদ্দ ভাইবোন। ও ছিল বারো নম্বর। ওর কাকার একটা পা খোঁড়া, বাড়িতে ওদের একটা জাম গাছ ছিল। প্রচুর জাম হ'ত। সেই জাম ওর মা নুন লঙ্কা দিয়ে মেখে আমাদের কাঁসার বাটিতে করে খেতে দিতেন।"

মেজোমেসো বললেন, "থাক, থাক। আর বলবার দরকার নেই।" তারপর মেজোমেসো ঠামার বয়স জিজ্ঞেস করলেন। বললেন— "মাসীমা, আপনার তো বোধহয় সত্তরের কাছাকাছি বয়স, তাই না? কত বয়সে ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল আপনার?"

ঠামা বললেন, "তা নূপুর বেশিদিন বাঁচে নি বাবা। পুজোর আগে ওর টাইফয়েড হ'ল। তখনকার কালে বলতো সান্নিপাত জ্বর। এত ওষুধ-বিষুধও তো ছিল না তখন। অষ্টমীর দিন রাত্রে মারা গেল ও। তারপরের বছর পুজোর আগে আমার বিয়ে হ'ল। আমার বিয়ে হয়েছিল দশ বছর বয়সে।"

মেজোমেসো আবার জিজ্ঞেস করলেন, "নূপুরের কথা ভাবেন নাকি প্রায়ই?"

ঠামা অবাক হলেন। বললেন, "না বাবা। কবে সব ভুলেটুলে গিয়েছি। এই এখন তুমি জিজ্ঞেস করলে বলে মনে পড়লো।" ঠামা আরও বললেন, "আমার স্মরণশক্তি আজকাল একেবারে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। টেলিফোনের নম্বর কোনও কালে মনে রাখতে পারতাম না। আজকাল আবার লোকের নামও ভুলে যাচ্ছি। একটা নতুন কাজের লোক এসেছে। কিছুতেই নাম মনে করতে পারছি না। কেবল মনে হচ্ছে ওর নাম ভোম্বল। কিন্তু ভোম্বল তো আমার ভাসুর-ঝি-জামাই-এর নাম। সে শুনলে কী ভাববে বলো তো?" ঠামা বলেই চললেন।

মেজোমেসো বলছিলেন—"মানুষের মগজের মধ্যে দুটো বিশেষ স্থান আছে কানের পাশের দিকে। প্রথমটার নাম ব্রোকার স্থল[১৮]।

ব্রোকা এক বৈজ্ঞানিকের নাম। উনিই প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন যে মগজের এই জায়গাটা দিয়ে আমরা শব্দ তৈরি করার জন্য যেসব বাতাস ছাড়তে হয়, কিংবা টানতে হয়, কিংবা বন্ধ করতে হয় সে-সব পরিচালনা করতে পারি। আবার মগজের এই একটা জায়গা দিয়ে গলার কণ্ঠ-নালীর সংকোচন, প্রসারণ, পরিচালনা করা যায়। আর এই একই জায়গা দিয়ে ঠোঁট, জিব, এদেরও চালনা করা যায়, অর্থাৎ কিনা মগজের এই জায়গাটার দৌলতে আমরা উচ্চারণ করতে পারি। শব্দের সঞ্চার করতে পারি। বাক্য বলতে পারি। এছাড়াও মগজে আরো একটা জায়গা আছে। সেটাকে বলে ওয়েরনিকের স্থল[১৯]। মগজের এ জায়গাটা পরিচালনা করে ব্যাকরণের সাহায্যে কেমন করে শব্দ দিয়ে বাক্য রচনা করা হবে সেটা। একবার কি ব্যাকরণে কি বাক্যে বলবো সেটা ঠিক হলে, খবর যাবে মগজের ব্রোকার স্থলে। তখন ঠোঁট, জিব, কণ্ঠনালী আর বাতাসের সহযোগে সেসব বাক্য আমরা উচ্চারণ করে নিজের মনের খবরাখবর একজন আর-একজনকে জানাতে পারবো।

"এই দুটো স্থলই আমাদের মগজের বাঁ-পাশে আছে। মগজের যেখানে এ দুটো জায়গা অবস্থিত, সেখানে মাথার খুলিটাতে ফোলা-ফোলা আবের মতো আভাস পাওয়া যায়। যেন খুলির এই আবের আবরণের নিচে মগজটা ও-দুটো জায়গায় উঁচু-উঁচু ছিল। অনেক কিছু কাজ মগজকে এ-দুটো জায়গা দিয়ে করতে হয়। কথা বলা মানুষের একটা মুখ্য হাতিয়ার। কথা বলে প্রাচীণ কালে মানুষের একজনের আর-একজনকে জানাতে হ'ত কোন্ জায়গাটাতে সে আজ সকালে একটা হাতি দেখেছে, সেটাকে কী উপায়ে শিকার করতে হবে। কথা বলে তাকে সবাইকে জানাতে হ'ত সেই হাতিটাকে শিকার করতে হলে জঙ্গলের কোন্ জায়গায় কত বড় একটা গর্ত খুঁড়ে রাখতে হবে। কেমন করে গর্তটা ঘাস-পাতা দিয়ে সাজাতে হবে যাতে করে সহজে বোঝা না যায় যে ওটা আসলে একটা ফাঁদ, কেমন করে সবাই মিলে হাতিটাকে ধাওয়া করে ঐ-ফাঁদে ফেলতে হবে— আরও কত কি! বেঁচে থাকার যুদ্ধে কথা বলার মতো হাতিয়ার মানুষের আর একটিও ছিল না।"

মেজোমেসো বলছিলেন, "মানুষের মতো মানুষবৎ-এর খুলিতে এ-আব দুটো আছে কিনা সেটা খুঁজতে গিয়ে দেখা গিয়েছে যে, এক স্তরের আধা-মানুষ এর[২০] খুলির মধ্যে মনে হচ্ছে বোধহয় এই আবের

চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে। এটা সম্বন্ধে অবশ্য অনেক মতভেদ আছে।[১১] কেউ কেউ বলেন যে, এর অনেক পরের স্তরে, এমনকি জ্ঞানী মানুষের স্তরে, যাদের নাম নিয়ানডারথাল, যাদের চিহ্ন এই কিছুদিন আগেও ইউরোপ, মধ্য-প্রাচ্য, এসব জায়গায় পাওয়া গিয়েছে, তাদের খুলিতে নাকি ব্রোকার স্থানে কোন আব পাওয়া যায় নি। অথচ যেসব নিয়ানডারথালের খুলির ফসিল আমরা পেয়েছি তার থেকে মনে হয় আধুনিক মানুষের খুলি থেকে তাদের খুলি আয়তনে বড় ছিল। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল আমাদের, অর্থাৎ আধুনিক মানুষের, থেকে বড় মগজ হওয়া সত্ত্বেও এসব পুরোনো নিয়ানডারথাল মানুষ অবলুপ্ত হ'ল কি করে? অনেকের ধারণা যে এসব পুরোনো মানুষ যেহেতু কথা বলতে পারতো না সেইহেতু ওদের খুলিতে আবটা ছিল না। সেইহেতু তাদের বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় একটা বড় হাতিয়ারেরই অভাব ছিল। এই হাতিয়ার না থাকার দরুন যৌথজীবনযাপন করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছিল। তাই তার অবলুপ্তি ঘটে গিয়েছে।"

মেজোমেসো বলেছিলেন—আসলে অনেকে মিলে একসঙ্গে থাকতে গেলে কোনও না কোনরকম করে সংবাদের আদানপ্রদান না করতে পারলে বেঁচে থাকা সম্ভব না। পিঁপড়েরা, উইপোকারা সবাই একসঙ্গে সমাজবদ্ধভাবে বেঁচে থাকে। ওরা সংবাদের আদানপ্রদান কী ক'রে করে? ওরা ওদের মুখ থেকে একরকমের রস ক্ষরণ করে, যার ইংরেজি নাম ফেরোমন (Pheromones), এই ফেরোমনের রদবদল করে ওরা খবরা-খবরের আদানপ্রদান করে। সেইরকম মৌমাছিরা সমাজবদ্ধভাবে বেঁচে থাকে। ধরো, একটা মৌমাছি একদিন পুবদিকে উড়ে গিয়ে দেখতে পেল অনেকগুলো ফুল ফুটেছে, এবং সেগুলো মধুতে ভরা। তখন সে মৌচাকে এসে এই খবরটা বাকি সব মৌমাছিকে দেবে কি করে? মৌমাছিদের বিভিন্ন রকমের নাচ আছে, সূর্যের তুলনায় মধুর ভাণ্ডার ঠিক কোন্ দিকে, এসব নাচ দিয়ে মৌমাছি তার আত্মীয়দের সে-খবর জানাতে পারে। মৌচাকের সামনে এসে ঘুরে-ঘুরে সে নাচে। নেচে-নেচে মৌ-ভাণ্ডারের সংবাদ সে সবাইকে দেয়। তারা সবাই মিলে বাঁচতে হলে এই সংবাদ দেওয়া-নেওয়ার হাতিয়ারটা তাদের জীবনে সাংঘাতিক মূল্যবান। সুতরাং সমাজবদ্ধ প্রাণীর বেশির ভাগেরই এই হাতিয়ারটি আছে। যাদের নেই, তারা অবলুপ্ত হবার সম্ভাবনা রাখে।

হয়তো সেই কারণেই নিয়ানডারথালের পুরোনো মানুষ অবলুপ্ত হয়েছে। কে জানে? আমি সঠিক জানি না। তবে মনে একটা খোঁচা লেগে থাকে। হয়তো ঐ কারণেই ওদের অবলুপ্তি ঘটেছে।

আমি বলেছিলাম— মেজোমেসো তুমি কিন্তু কেমন যেন দোমনা কথা বলছো। তোমার মনে এত খোঁচা কোথা থেকে আসছে?

মেজোমেসো উত্তর দিয়েছিলেন— আরে খোঁচা থাকবে না কেন? আমার বন্ধু হলোয়ে (Ralph Holloway) বলেছেন যে, এক স্তরের আধা-মানুষ (Homo habilis-skull 1470)-এর মাথার খুলিতে নাকি আব ছিল। তাহলে তার থেকে দুটো পরের স্তরের খুলিতে (নিয়ানডারথাল) আব থাকলো না কী করে? আর এদিকে রিচার্ড বলেন, আধা-মানুষ তো দূরের কথা, শিম্পাঞ্জীর খুলির বাঁ-দিকেও আবের আভাস আছে। আসলে ঝামেলাটা কোথায় জানিস? খুলির ফসিল সর্বদা খুব ঠিক-ঠিক মতো তৈরি করা যায় না। সুতরাং খুলির ফসিল দেখে কিংবা সেই ফসিলের ছাঁচ তৈরি করে এসব সিদ্ধান্তে আসা খুব সঠিক হওয়া সম্ভব নয়। তাই আমি শুধু এটুকুমাত্র জোর গলায় বলতে পারি, মানুষের মগজে আব দুটো আছে। শিম্পাঞ্জীর মগজে আবের আভাসও আছে। এ-দুটোর কথা জোর দিয়ে বলতে পারি, কারণ, এ-দুটো প্রাণী এখনও অবলুপ্ত হয় নি। যে-কোন মানুষ কিংবা শিম্পাঞ্জীর মাথায় অস্ত্রোপচার করলেই সঠিক জানা যাবে। বাকি মানুষবৎ ইত্যাদির সম্বন্ধে আন্দাজে বলা। এক কথায় অনেকটাই বুজরুকি। আর তাছাড়া আব থাকলেও মানুষটা ঠিক কতটা শব্দ করতে কিংবা কথা বলতে পারবে তা কে জানে। স্বরযন্ত্রটা তার কেমন ছিল, কোথায় ছিল, তাই বা কে জানে। কারণ, শুধু ভাষা বলার জায়গাটাই মগজে থাকলেই তো চলবে না। স্বরযন্ত্রটা ওপর থেকে ঠিকমতো গলার নিচের দিকে না নামতে পারলে প্রাণীটা হয়তো শুধু কয়েকটা মোটে আওয়াজ করবে। হয়তো পুরোদস্তুর কথা বলতে পারবে না।

আমি বলছিলাম--"আমার কিন্তু তবু একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। সেটা হচ্ছে ব্যাকরণটা মগজই যখন পরিচালনা করছে, আর সব মানুষই যখন শুরুতে এক, তখন সব মানুষ আমরা একই ভাষায় কথা বলি না কেন?"

মেজোমেসো বলছিলেন— "মগজ পরিচালনা করছে কী করে ঠোঁট নাড়বো, জিব্ নাড়বো, বাতাস খেলাবো কণ্ঠনালীর মধ্যে। এসব করে

কী ভাষায় কথা বলবো সেটা তোমার-আমার নিজের আওতার মধ্যে। বাংলা, উর্দু, তেলুগু, ইংরেজী যা খুসি বলতে পারি। তবে মগজ যদি ব্যাকরণ-বদ্ধ বাক্য রচনা করতে আমাদের ক্ষমতা দিয়ে থাকে তবে হয়তো বুঝতে হবে যে, সব ভাষাই আদিতে একই ব্যাকরণ ব্যবহার করে। সব ভাষার মধ্যেই হয়তো একই ব্যাকরণ নিহিত আছে। সেটা ভাষাগত ব্যাকরণ না। মানুষগত ব্যাকরণ। তবে এসব কূট বিচারে না যাওয়াই ভালো। ওসব বিরাট-বিরাট ভাষাবিদ্‌দের বিচারের বিষয়। আমরা শুধু শুনি, আর শুনে-শুনে চমকাই। পৃথিবীর এমোড় থেকে ওমোড় অবধি তামাম দুনিয়ার সব ভাষার মূলে একই ব্যাকরণ একথা বললে না-চমকে যাবো কোথায়? পাণিনি পড়ার ভয়ে তবে আর সংস্কৃত পড়া ছাড়লাম কেন? কেন খামোখা ইংরেজী শিখতে গেলাম? পাণিনির ব্যাকরণ আর হোটেনটটদের ব্যাকরণ মূলগত একই ব্যাকরণ, সেটা শুনলে বিশ্বাসই বা কী করে করি?"

দশ

প্লেনটা এবার নামার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। অনেকক্ষণ যাবত আমরা উত্তর-আমেরিকার উপর দিয়ে পশ্চিমমুখো উড়ে চলছি। সেণ্ট্ লরেন্স নদীর তীর ধরে-ধরে। এবার আমাদের সবাইকে একটা করে কাগজ ধরিয়ে দিয়ে গেল এয়ার-হোসটেস্। কোথায় গন্তব্য, কতদিন থাকবো, কোথাকার বাসিন্দা, কত টাকা সঙ্গে আছে, আরও বহু বহু খবর ফর্মে ভরে দিতে হবে।

নিচে বড় সুন্দর একটা হ্রদ। নৌকো সাজানো। গাছে-গাছে ঢাকা একটা সবুজ খোপ-খোপ শহর। তার ফাঁকে ফাঁকে আকাশচুম্বী বেশ অনেক ইমারতের সারি। চারপাশে নিচু নিচু বাংলো বাড়িতে ভরা চৌকো চৌকো পাড়া। দৈর্ঘে-প্রস্থে কালো পীচের রাস্তা, আর সেই রাস্তা বেয়ে মোটরগাড়ির স্রোত। এ আমাদের কলকাতা শহর নয় যে প্রয়োজন মতো যেখানে সেখানে বাড়ি গজিয়ে উঠেছে, ছকে-বাঁধা শহর একটা। ছকের যেখানে ব্যতিক্রম সেখানে বোঝা যাচ্ছে প্রকৃতিই প্রবল। সেগুলো চড়াই উৎরাই-এর ঢাল বেয়ে বনভূমি। মাঝখান দিয়ে তার সরু একটা তিরতিরে নালা— ডন নদী।

প্লেন থামতেই এয়ার-হোসটেস্‌রা এসে আরো কয়েকটি ছোট বাচ্চার সঙ্গে আমাদের পাশে বসা ছেলেটিকে নিয়ে নেমে গেল। প্লেন থেকে নামার পর্বে প্রথম অধিকার বাচ্চাদের। ওদের মা-বাবারা ওদের জন্য অপেক্ষা করে আছেন। তারপর নামলেন দু-তিনজন প্রতিবন্ধী। তাদের চেয়ারে করে নিয়ে যাওয়া হ'ল। আমার পাশের ভদ্রমহিলা আমাকে বললেন—"এবার চলো আমরা নামি। এবার আমাদের পালা।"

টুটুলকে দেখে বিশ্বাসই করা যায় না যে ও আমার থেকে মোটে চার মাসের বড়। লম্বা ঢিঙ্গি হয়েছে একটা। মাথার চুলগুলো ছেলেদের মতো ছোট করে ছাঁটা। টুটুলের চোখের সাদাটা ঠিক কৃষ্ণ ঠাকুরের চোখের সাদার মতো চকচকে। চোখ দুটোও তেমনি টানা-টানা। সাদা সুতির অন্তত ডবল সাইজের দোমড়ানো-মোচড়ানো প্যাণ্ট আর হাত-গোটানো সার্ট পরে দাঁড়িয়েছিল সে আশপাশের সব মহিলার মাথা ডিঙিয়ে। আমাকে দেখে দিল এক ইয়া থাপ্পড় পিঠে। আমি হুমড়ি খেয়ে মরি আর কী!

টুটুল আমার সেই বিশাল বাক্সগুলো হেঁইয়ো টানে তুলে নিলে পিঠে, কাঁধে, আর দুই হাতে। বলল— "আমি তোমাকে একলা নিতে এসেছি। মা-বাবা আসতে পারলেন না। বহু চড়াই-উৎরাই, লিফ্‌ট, সিঁড়ি পার হয়ে আমরা এসে দাঁড়ালাম সেখানে, যেখানে ছ'তলার ওপর গাড়ি সাজানো আছে প্রায় শ'খানেক। অবলীলাক্রমে গাড়িটার পেছনের ডালা খুলে স্যুটকেস বন্দী করলো টুটুল। তারপর বিরাট বিকট আওয়াজ করে গাড়িটা এক হ্যাঁচকায় বার করলো গ্যারাজ থেকে। একের-পর-একতলা পেরিয়ে নেমে এলাম আমরা চওড়া সমান রাস্তায়। রাস্তাটা যে কত চওড়া সে কী বলি। চার সারি গাড়ি চলছে। চার সারি গাড়ি আসছে। তা ছাড়াও কোথাও বাঁ-ধার থেকে রাস্তা প্রবেশ করছে দু'সারি। কোথাও ভেতর থেকে রাস্তা বাঁ-ধারে বেরিয়ে গেছে দু'সারি। ডান-বাঁ সব মিলিয়ে ষোলো সারি রাস্তা। টুটুল বলল, "ধুত! এর থেকেও ডবল চওড়া রাস্তা আমাদের আছে। তোমাকে পরে দেখাবো।"

গাড়ি চলছে ঊর্ধ্বশ্বাসে। আমি বললাম— "তোমার তো এখনও আঠারো বৎসর বয়স হবার দেরি আছে। গাড়ি চালাচ্ছো কী করে?" টুটুল বলল— "এখানে ষোলো বছর থেকেই গাড়ি চালাবার লাইসেন্স পাওয়া যায়।"

যে-বাড়িটাতে এসে পৌঁছলাম সেটা একটা চড়াই-এর উপ
দোতলা বাংলো-বাড়ি। রাস্তা থেকে আগের মতনই অক্লেশে বাক্স-ব্যাগ
তুলে নিয়ে এসে দোতলায় পৌঁছে দিয়ে টুটুল বলল— "বাড়িতে কে
নেই। দিদাকে নিয়ে ওরা বিকেলে ফিরবে। আমি তোমার খাবার কর
দিচ্ছি। নিচে চলো, খাবে।"

ছোট্ট রান্নাঘরে খুব অভ্যস্ত হাতে টুটুল এটা-সেটা মিশিয়ে, ভাজ
করে, জ্বাল দিয়ে, সুন্দর তরকারি করে আমাকে পরিবেষণ করলো
প্লাসটিকের প্যাকেট খুলে কয়েকটা হাতে-গড়া-রুটি বার করে গরম
করে আমাকে বলল, "চটপট খেয়ে ফেল। আমার আবার এক্ষুনি বা
হতে হবে। গেলাসে দুধ ঢালতে-ঢালতে জিজ্ঞেস করল, "দুধ খাবে
ভয় নেই। মোটা হবে না। মাখন-তোলা দুধ।" নিজেও রুটি তরকারি
কিছুই খেল না। এক-বাটি কাঁচা আনাজ আর টকে-যাওয়া দুধের মতে
খানিকটা ছানা খেয়ে বলল, "বরফের আলমারিতে অনেক ফল আছে
ইচ্ছে করলে খেতে পারো।"

মিনিট দশেকের মধ্যে টেবিল পরিষ্কার করে, আমাকে বিছানা
বাথরুম দেখিয়ে, ঐরকম অসম্ভব বিরাট আওয়াজ করে আবার গাড়িটা
করে টুটুল চলে গেল। বলে গেল, "বিকেলে এসে কথা হবে। এখন
অসম্ভব তাড়া।"

বড়মাসী এক-চিল্‌তে চিঠি লিখে রেখে গিয়েছেন। খাবার টেবিলে
সাজানো ছিল। লিখেছেন, "মাকে গতকাল হাসপাতালে ভর্তি করেছি।
কয়েকটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য। বিকেলে আমরা দু'জন বাড়ি
ফিরবো বড়মেসোর সঙ্গে, তুমি অনেকক্ষণ প্লেনে এসে নিশ্চয়ই ক্লান্ত।
ততক্ষণে ঘুমিয়ে নাও।"

টিকটিক করে ঘড়িটা বেজে চলছে। আমি এঘর-ওঘর করতে-করতে
বাড়ির পেছনের কাঠের বারান্দায়, আর সেখান থেকে বেয়ে নেমে এসে
পেছনের বিরাট লম্বা বাগানে। এই বাড়িটা মার্গারেট বলে বড়মাসীর
কলেজের এক ভদ্রমহিলার। এত বড় বাগান ভদ্রমহিলা আর তাঁর বৃদ্ধ
বয়সে দেখাশোনা করতে পারেন না বলে কাছেই উনি একটা ছোট
ফ্ল্যাট ভাড়া করে উঠে গিয়েছেন। টুটুল ওঁর সাজানো বাগান পূর্ণ মর্যাদায়
দেখাশোনা করবে সেই কড়ারে বাড়িটা বড়মাসীদের ভাড়া দিয়ে গেছেন।

শহরের অনেকটা বাইরে বাড়িটা। পেছন-দিককার বাগানটা যে

কত বড় তা বলে বিশ্বাস করানো যায় না। একটা চড়াই পেরিয়ে নেমে গিয়েছে নিচে, যেখানে ডন নদীর একটা প্রশাখা বয়ে চলেছে একটা খাল বেয়ে। লাফ দিয়ে ডিঙিয়ে পার হওয়া যায় খালটা। জলের মধ্যে লম্বা-লম্বা লিলি গাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। ছোট-ছোট গোলাপী ফুল হাওয়ায় দুলছে।

বাগানটা ফলগাছে ভর্তি। বড়-বড় নাশপাতি আর আপেলে-ভরা গাছগুলো। পাশে একটা সব্জিবাগান। মুলো, গাজর, আলু, টমাটো, ধনেপাতার বিভিন্ন খোপ। চারপাশ দিয়ে কড়াইশুঁটির লতার বেড়া। এতক্ষণ লক্ষ করি নি, এখন দেখতে পেলাম একটা ছাই রঙের খরগোশ ওখানে বসে আলুর চারা চিবোচ্ছিল। আমার সাড়া পেয়ে ছুটে চলে গেল খাল ডিঙিয়ে ওপারের সবুজ বনভূমিতে।

একপাশে দুর্গন্ধে ভরা একটা কাঠের বিরাট চৌকো বাক্স। তাতে ভরা আছে রাজ্যের আনাজের খোসা, বাগানের ছাঁটা ঘাসের স্তূপ, গাছের পচা পাতা। ওটা সারাবছর ধরে পচে-পচে সার তৈরি হচ্ছে। বাগান নতুন বৎসরে ঐ সার দিয়ে উর্বর করা হবে।

গুন্‌গুন্ করে উড়ে বেড়াচ্ছে মৌমাছি। বাড়ি থেকে দূরে, দক্ষিণমুখো অনেকগুলো কাঠের বাক্স। ওগুলো আসলে মৌচাক। বাক্সগুলোর দেরাজ মৌচাকে ভরা। মধু আহরণ চলছে। ঢুকবার মুখটার কাছে মৌমাছি বসে আছে। হয়তো ওরা নাচ দেখিয়ে-দেখিয়ে জানিয়ে দেবে কোন্ দিকে মধুর ভাণ্ডার।

ঘুম এলো না আমার কিছুতেই। টুটুলের ঘরে ওর খাটে শুয়ে আছি। বেশ অগোছালো এই ঘরটা। স্তূপীকৃত বই। রঙিন পেনসিল, আঁকার কাগজ, একটা সেলাই করার সিঙ্গার মেশিন। আর দেওয়াল-ভরা ছবি। বেশির ভাগই পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে কাটা কোন আন্দোলনের ছবি। দক্ষিণ-আফ্রিকার একটা ছবি। কালো মানুষগুলো লোহার জালের ওপারে ধ্বনি দিচ্ছে হাত মুঠো করে। প্লাস্টারে তৈরি শিবাজীর একটা প্রতিমূর্তি, দেখে মনে হ'ল এটা বোধহয় টুটুল নিজের হাতে তৈরি করেছে। ঘোমটা-দেওয়া ঠামার মতো এক বিধবার ছবি। নিচে লেখা আছে "বিদ্যাসাগরের মা"। সব থেকে অবাক লাগলো যেটা দেখে, সেটা হ'ল শেফালি-বৌদির একটা সুন্দর রঙিন ফটোগ্রাফ। খুব

বড় করে বাঁধানো। শেফালি-বৌদি যে এত সুন্দর সেটা আগে খেয়াল করে দেখি নি। গতবার যখন টুটুল দেশে গিয়েছিল তখন এ-ছবিটা তুলেছিল। না-খেতে-পাওয়া, ভয়ে ত্রস্ত একটা উনিশ বছরের লম্বা মুখ। কান্না-কান্না হাসিতে ভরা একটা শ্যামলা মুখ আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। পাশে ঝুলছে বোধহয় কোনও পত্রিকা থেকে কাটা রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখার ফটোগ্রাফ—

"বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান॥"

টুটুলের চিঠির টুকরোগুলো মনে পড়ে যায়। একবার লিখেছিল—"মেজোমেসোর কাছে শুনলাম তুমি নাকি নিজেকে বলো লুসির উত্তর-পুরুষ।[২২] তাই যদি হবে তো আমাদের মেয়েদের এই হাল কেন, দেশে, বিদেশে সর্বত্র? লুসি একটা কল্পনামাত্র না। লুসি পুরোপুরি বাস্তব সত্য। লুসিকে বাঁচাতে হলে আফ্রিকার জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরতে হবে না। তোমাদের ঐ হাওড়ার পুরোনো বাড়ির পাশের বস্তিতে শেফালি-বৌদির দিকে ফিরে তাকাও। দেখবে লুসির কী হাল করে ছেড়েছো তোমরা।"

টুটুলকে উত্তরে লিখেছিলাম, "আসলে ভাইটি আর তুমি যোদ্ধা। ঝাঁসি-বাহিনীর সদস্য। আমি কিন্তু যোদ্ধা নই! লুসি আমার কাছে একটা বিশেষ চিন্তার বিষয়। একটা জানতে চাওয়া। তোমার কাছে লুসি একটা প্রতিবাদ। তুমি ন্যায়বিচার চাও। আর সেই চাওয়াটা মুখর করে তুলবার জন্য তোমার কাছে লুসি একটা প্রতীক।"

ভাইটি সেদিন আমার সঙ্গে ছিল। ও মেজোমেসোকে বলল, "একটা পূর্ণবয়স্কা মহিলার ফসিল কঙ্কাল লুসি। তা, এর মধ্যে এত কী মাহাত্ম্য নিহিত আছে?"

মেজোমেসো বলেছিলেন— "সেটাই তো মজা। সবাই বলে মানুষ দ্বিপদ-জীব। এই দ্বিপদ-জীব হবার একটা বিরাট পরিণাম আছে। দ্বিপদ-জীবের অর্থ কি? না, সেই জীবটাই দ্বিপদ, যে-জীবটা দুটো পায়ে হাঁটে। অর্থাৎ কিনা, সে চার-হাত-পায়ে হাঁটে না। অনেক বন-মানুষ দরকার পড়লে দু'পায়ে হাঁটতে পারে। কিন্তু তারা বেশিক্ষণ তা পারে না। তাড়া দিলে পালাতে গেলে চার-হাত-পায়ে দৌড়ে চলে যায়। অথচ মানুষকে একবার তাড়া দিয়ে ছাখো— দৌড়তে গেলে তার একটা হাতেরও প্রয়োজন লাগে না। দুটো পা-ই তার যথেষ্ট।

দিব্যি তুটো পায়ে তীর বেগে পালিয়ে চলে যাবে। এখন এর থেকে কী বোঝা যাচ্ছে? না, এর থেকে এই বোঝা যাচ্ছে যে চলাফেরা করবার জন্য তার আর হাতের প্রয়োজন নেই। হাত তুটো তার এখন থেকে মুক্ত। তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে এই যে, দরকার-মতো দৌড়োবার সময়ে সে হাত দিয়ে অনেক-কিছু করতে পারে। হাতিয়ার ছুঁড়ে মারতে পারে। জ্বলন্ত আগুনের একটা গাছের ডাল নিয়ে তেড়ে আসতে পারে। অন্যান্য জন্তুর অর্ধেক-খাওয়া কুড়িয়ে পাওয়া কিংবা চুরি করে আনা মাংসখণ্ড সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারে। আরও কত কী! হাত তুটো মুক্ত হয়েছে বলেই মানুষ নাকি মানুষ।"

মেজোমেসো বলছিলেন— "বলছি তো একটা মতবাদ আছে যে মানুষ হাতিয়ারের দান। আর হাতিয়ার হাতের দান। মুক্তহস্ত না হলে হাতিয়ার ধরবে কোন্ হাতে? নচেৎ হাতের সবটুকু শক্তি চলে যাবে চলা-ফেরা করবার জোগান দিতে।"

মেজোমেসো আরও বললেন— "সবাই বলে মগজ-বিস্ফোরণ, মগজ-বিস্ফোরণ। যেন প্রথমে মগজ-বিস্ফোরণ হয়েছে, তারপর হয়েছে সব-কিছু। অথচ লুসির কঙ্কালে দেখা যাচ্ছে, লুসির খুলিটা ছোট ছিল। অথচ হাঁটুর হাড়, জঙ্ঘার হাড়, কোমরের হাড় দেখে বোঝা যাচ্ছে যে লুসি দিব্যি ভালোরকমে হাঁটতে পারতো। সে ছিল একটা দ্বিপদ-জীব। তু'পায়ে হাঁটবার যতরকমের পেশি লাগে আর সেইসব পেশি-গুলো সাজাবার জন্য কোমর আর পায়ের হাড়ের যে-যেরকম গঠন লাগে সে-সবই ছিল লুসির। তার মানে লুসি হেঁটেছে প্রথম। আর তার মগজ-বিস্ফোরণ হয়েছে পরে। অর্থাৎ কিনা প্রথম দিকের মানুষ হেঁটেছে আগে। এবং চিন্তাশীল হয়েছে পরে। শুধু তাই না। প্রথম তু'স্তরের মানুষ-বংদের মগজটা ছিল ছোট, কিন্তু সেই তুলনায় তার দাঁতগুলো তখনও ছিল বড়। তাই অনেক সময়ে এদের বলা হ'ত ছোট মাথা বড় দাঁত।[২৩] অনেকে বলেন যে ভয় পেলে লুসি হয়তো গাছেও উঠতো। এদের হাতের আঙুলগুলো আর পায়ের বুড়ো আঙুলতুটো গাছে চড়বার জন্য সামান্য বাঁকাও ছিল। আবার কেউ বলেন যে, লুসি এত চমৎকার দাঁড়াতে পারতো যে তার গাছে উঠবার প্রয়োজন ছিল না। হয়তো লুসি দৌড়তেওপারতো।"

আমি বললাম— "কিন্তু তোমার ভারতীয় প্রফেসার বন্ধু বলেছিল যে মানুষ হাতের অবদান। কেউ বলে সে চোখের অবদান। কিংবা

কেউ বলে যে খুলির নিচের ফুটোটা পেছন দিক থেকে মাঝখানে সরে এসেছে, মানুষ সেটার অবদান। কিংবা দাঁড়াবার অবদান,— কিংবা সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করার অবদান। কিংবা ভাষা বলার অবদান।"

মেজোমেসো বললেন— "তাহলে এবার বলি : আমি বিশ্বাস করি মানুষের মগজ-বিস্ফোরণ হয়েছে। তার কারণ শুধু একটা নয়। তার কারণ বহু-বহু। অনেকগুলো কারণ মিলেমিশে মানুষের মগজ-বিস্ফোরণ হয়েছে। সেই বহু-বহু কারণের মধ্যে যা-যা একটু আগে বললে তার প্রত্যেকটাই অন্তর্ভুক্ত। হয়তো তাছাড়াও অনেক কারণ আছে যা এখনও আমরা জানি না।"

মেজোমেসো বলছিলেন, "এটা ঠিকই যে মানুষ আগে দাঁড়িয়েছে। পরে মগজ হয়েছে। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ঠিক না, যে শুধু দাঁড়ানোর দৌলতে তার মগজ বেড়েছে। মানুষের মগজ বেড়েছে কারণ সে দাঁড়ানো-অবস্থায় মুক্ত হাত দিয়ে হাতিয়ার ধরেছে। তাছাড়া তার খুলির নিচের ফুটো পেছন দিক থেকে সরে ঠিক মধ্যিখানে চলে এসেছে। তাতে করে সে তার মাথাটা দিয়ে সমান সোজা সামনের দিকে তাকাতে পারে। তাছাড়া তার চোখ দুটো মাথার দুপাশ থেকে সরে নাকের পাশে পাশে চলে এসেছে। তার চোয়ালটা চ্যাপ্টা হয়ে গিয়েছে যাতে করে তার দৃষ্টি ফোলা-ফোলা চোয়ালে প্রতিহত না হয়। তার চোখে রঙ দেখবার ক্ষমতা এসেছে। অর্থাৎ কিনা সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি নিয়ে সে হাতিয়ার চালিয়েছে। তাছাড়া সে সামাজিক জীব। অন্য মানুষের মনে কী ভাবনা চিন্তা চলছে, সেসব তাকে জানতে হয় বাঁচবার তাগিদে। আর সবচেয়ে যেটা বড় কথা যে, সে কথা বলতে পারে। কথা বলে খবরা-খবরের আদানপ্রদান তাকে করতে হয়। এইসব ছোট-ছোট কারণগুলো মিলেমিশে নিশ্চয়ই তার মগজ-বিস্ফোরণের অবতারণা। অন্তত মগজের কোন্ জায়গা দিয়ে আমরা কি কাজ করি সেটা বিচার করলে দেখা যায় মগজ অনেক রকমের কাজ করতে পারে। মগজ দিয়ে শুধু আমরা হাঁটি না। মগজ দিয়ে শুধু আমরা হয়তো মুঠো করি না। শুধু আমরা সজীব এবং গভীর পৃথিবী দেখি না, আমরা একজন আর-একজন কী ভাবছে শুধু সেটা ভাবি না, কিংবা শুধু নিজেদের মধ্যে কথা বলতে পারি না, মগজ এই প্রত্যেকটা কাজই করছে। এবং এইসব মিলিয়ে মিশিয়েই মগজ-বিস্ফোরণ।

উত্তর-তরঙ্গ

মেজোমেসো আমাকে বলেছিলেন— চারপাশে আমরা মাথাওয়ালা প্রাণী দেখি বলে আমরা তলিয়ে ভাবি না যে মাথাটার উদ্ভব হতে বিবর্তনে কত অসম্ভব সময় লেগেছিল। আমরা যে ভাবি সব প্রাণীরই মাথা আছে, সেটা কিন্তু ভুল। সমুদ্রের তারা মাছ, জেলিফিস, স্পঞ্জ— ওরা গোল ধরনের জীব। ওদের মাথা নেই। শরীরটার যে কোন প্রান্ত দিয়েই ওরা এগিয়ে চলতে পারে। এদেরও আমরা দেখতে পাই না সচরাচর।

সেদিন আমাকে বুঝিয়ে-বুঝিয়ে মেজোমেসো বলেছিলেন— মাথাটার[১] প্রথম সৃষ্টি কবে থেকে হ'ল সেকথা। মেজোমেসো বলেছিলেন— "ধর্ কেঁচোর মতো দেখতে লম্বা একটা প্রাণী।[২] চওড়া বরাবর— ওটাকে যদি আমরা আধাআধি করে ভাগ করি তো দেখবো— যে ওর শরীরের ডান-দিকটা আর বাঁ-দিকটা, একটা আরেকটার হুবহু নকল। কিন্তু কেঁচোটাকে যদি লম্বা বরাবর দু'টুকরো করি তো দেখবো ওটার একদিকে একটা মাথা আছে, আর অন্য দিকে একটা ল্যাজ আছে। এখন ধর্, স্বর্ণ, তুই আমাকে একটা প্রশ্ন করলি যে কেঁচোটার একটা দিকে মাথা হয় কেন, কেন ওর দু'দিকেই দুটো মাথা হ'ল না। আমি তোকে তার উত্তরে এ-কথাই বলবো যে কেঁচোটার সমস্যাগুলো একটু ভালোভাবে আমাদের বুঝতে চেষ্টা করা উচিত। পৃথিবীতে চারদিকে ছড়ানো আছে খাদ্য। চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে শত্রু। কোথাও একটু আরাম, কোথাও একটু কষ্ট আছে। কেঁচোটাকে বেঁচে থাকতে হলে ওকে পেট ভরে খাবার খেতে হবে। বেশ আরামপ্রদ জায়গায় থাকতে হবে। কষ্টপ্রদ জায়গার থেকে সরে দূরে চলে যেতে হবে। শত্রু দেখলে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে হবে। একটা প্রাণী কী করে জানতে পারবে কোথায় ওর খাদ্য আছে যেটাকে খাওয়া যায়। কোথায় ওর শত্রু আছে, যেটার থেকে পালাতে হবে। কোথায় ও একটু আরামপ্রদ হালকা

রোদ পাবে, যেদিকে গিয়ে ও আরাম করে বসতে পারবে, কিংবা কোথায় চিড়বিড়ে ঝাল লঙ্কা কিংবা কনকনে ঠাণ্ডা বরফ আছে যেখানে গেলে জ্বলে-পুড়ে কিংবা ঠাণ্ডায় জমে ওর মরে যাবার সম্ভাবনা আছে।

চারপাশের পৃথিবীর খবরাখবর জানবার জন্য প্রাণীদের থাকে—দেখবার জন্য চোখ, শোনবার জন্য কান, শুঁকবার জন্য নাক, জিব্ দিয়ে রস চেটে চেখে দেখবার জন্য জিহ্বা, আর গায়ের চামড়া দিয়ে গরম, ঠাণ্ডা, ব্যথা অনুভব করে বুঝবার জন্য গায়ের চামড়া। এগুলোর মধ্যে চোখ, নাক, কান, জিব্ এই চারটে ইন্দ্রিয়ই যে-কোন প্রাণীর খুলির সামনের দিকে থাকে। তাছাড়া পঞ্চম ইন্দ্রিয়— ত্বক, সেটা আমাদের শুধু মুখ জুড়েই থাকে না, আছে সারা শরীর জুড়ে। এই যে পাঁচটা ইন্দ্রিয়, সেগুলো দিয়ে আমরা চার-পাশের পৃথিবীর খবরাখবর সংগ্রহ করি। সেই খবরগুলো প্রথম এসে পৌঁছায় আমাদের ইন্দ্রিয়ে। সেখান থেকে আমরা খবরগুলো পাঠাই মগজে। সেখানকার কোষে খবরগুলো আমরা সাজিয়ে-গুছিয়ে এমনভাবে তৈরি করে নিই যেটাকে আমরা বলি যে, আমরা খবরগুলো এবার বুঝতে, হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি। ধরো, তুমি চোখে দেখলে যে হলুদ রঙের কালো ডোরা-কাটা একটা জিনিস, কানে শুনলে হালুম, নাকে শুঁকলে বিকট একটা গন্ধ। সব মিলিয়ে তোমার মগজ বলল, 'ওরে, পালা পালা। তোর সামনে ঐ যে একটা সুন্দরবনের বাঘ এসেছে— এখুনি তোকে চিবিয়ে খাবে।' তুমিও তিন লাফে তক্ষুনি সে-জায়গা থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

"এখন বোঝো যে, শরীরের যে-দিকটা দিয়ে তুমি চলবে, সেদিকেই তোমার ইন্দ্রিয়গুলোর যথাযথ সমাবেশ হবার দরকার। যত তাড়াতাড়ি তুমি পৃথিবীর খবরাখবর পাবে, ততই তোমার মঙ্গল। খাবারটা খেতে পারবে, শত্রুটা থেকে দূরে পালাতে পারবে। সব-কিছুই জলদি-জলদি হবে। আর তুমিও বহাল তবিয়তে বেঁচেবর্তে থাকবে। নয়তো ঐ-খাদ্যটা তোমার আগে অন্য কেউ দেখতে পেয়ে গপ্ করে খেয়ে নেবে। নয়তো ঐ শত্রুটা, তুমি ওকে দেখতে পাওয়ার আগেই তোমাকে দেখতে পেয়ে গপাৎকরে ও খেয়ে ফেলবে। সুতরাং শরীরের যেদিকটা দিয়ে তুমি পৃথিবীর বুকে এগোবে সে-দিকটাতেই ইন্দ্রিয়গুলোর সমাবেশ, অর্থাৎ মুখের সামনেটার উদ্ভব হবে। সেখানেই থাকবে তোমার চোখ, নাক, কান আর জিহ্বা। আর তাছাড়া থাকবে তোমার হাঁ-মুখটা।" যেটা

হাঁ করে কবে তুমি কপ্ কপ্ করে খাবে। অর্থাৎ কিনা ওদিকটাতেই হবে তোমার মুখ। আর খবরাখবর চালাচালি করবার জন্য মুখটার যত কাছাকাছি সম্ভব থাকবে তোমার মগজটা। অর্থাৎ কিনা শরীরের যে-পাশ দিয়ে তুমি এগোবে সে-পাশেই গজাবে তোমার মাথাটা। অন্য পাশটাতে থাকবে একটা ল্যাজ, অর্থাৎ কিনা শরীরটার ঐ প্রান্তে কোন মাথার উদ্ভব হবে না।"

মেজোমেসো বললেন— "আর-একটা কথা আছে। মগজটা শুধু খুলির মধ্যেই থাকে না। ইন্দ্রিয় দু'রকমের— যে-ইন্দ্রিয়গুলো দিয়ে আমরা পৃথিবীর খবরাখবর পাই, যেমন— চোখ, নাক, ইত্যাদি— এগুলো জ্ঞানেন্দ্রিয়। কিন্তু খবরগুলো পেয়ে আমরা তো চুপ করে বসে থাকি না। যদি দেখি যে সামনে কোন খাবার আছে তো হাত বাড়িয়ে সেটা ধরতে যাই খাব বলে। যদি দেখি যে সামনে শত্রু আছে তো পা চালিয়ে সেখান থেকে চম্পট দিই। যদি দেখি গরমের দিনে সামনে বেশ একটা গাছের ছায়া আছে, তো সেখানে গিয়ে দিব্যি আরাম করে শুয়ে পড়ি। অর্থাৎ কিনা মগজ থেকে খবর যাবে হাতে কিংবা পায়ে, ইত্যাদি। অর্থাৎ, সংবাদ যাবে সঞ্চালক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। আমাদের পিঠে শিরদাঁড়ার মধ্যেও মগজ-কোষ ভরা আছে খবরাখবর চালাচালি করবার সুবিধার জন্য।

"শিরদাঁড়াটা একটা হাড়ের খোপ-খোপ জিনিস। হাড়ের খোপ-গুলো ভরা আছে মগজ-কোষে। বিবর্তনের প্রথম দিককার প্রাণীর মধ্যে কিন্তু মগজটা নেমে যেতো বুক-বরাবর পেট ধরে। পৃথিবীর শক্ত মাটিতে যেসব মগজে সহজেই আঘাত লাগবার সম্ভাবনা ছিল, ধীরে-ধীরে তাই মগজটাই বুক পেট ছেড়ে উঠে চলে এল পিঠে। যেখানে পেট-বরাবর মগজ আগে ছিল— দুটো মগজে ভরা নার্ভ, একটা ভরাট নালী[৩]। এখন তার বদলে তৈরি হয়েছে ফাঁপা একটা নালী, অর্থাৎ কিনা শিরদাঁড়া। আর তাও আবার সেটা উঠে এসেছে পিঠ-বরাবর। শিরদাঁড়ার এক প্রান্তে মুখ আর মগজ। অন্য প্রান্তটাতে কিছু নেই। সেটাই লেজ।"

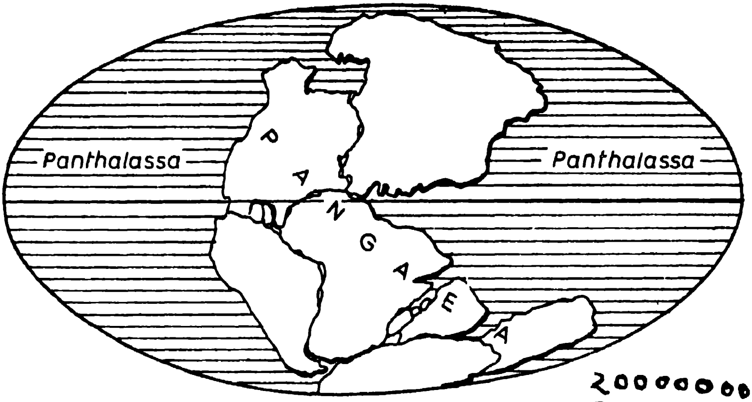
এর পর মেজোমেসো মগজের কথা বলতে শুরু করলেন। বললেন, "মগজটা খুব প্রয়োজনীয় বস্তু। ওটাকে আঘাত থেকে রক্ষা করবার প্রয়োজন খুব বেশি। বিবর্তনের প্রথম দিকটার কিছু-কিছু প্রাণীদের

মধ্যে মাথা আর শরীরের সামনেটা বর্ম দিয়ে আবৃত ছিল। কচ্ছপ, আর্মাডিলো কিংবা প্যাঙ্গোলিন,[৪] কিছু সরীসৃপ যারা মরে শেষ হয়ে গিয়েছে— তাদের অনেকের মগজ ভারী ভারী হাড়ের বর্মের নিচে লুকানো। কিন্তু এতে প্রাণীটার ওজন বেড়ে যায় অযথা। চলাফেরা করতে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। আজকালকার প্রাণীরা ক্ষিপ্রতার ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছে। তাদের মগজটা একটা পাতলা হাড়ের খুলির মধ্যে আবৃত থাকে। খুলির ওজন কম।" মেজোমেসো বললেন— "গ্যাখো মগজটা একটা খুলির বাক্সর মধ্যে ভরা। খুলিটার প্রয়োজন এই কারণে যে, খুলিটা শক্ত হাড়ের একটা বাক্সর মধ্যে মগজটাকে রক্ষা করে রাখে। না রাখলে কত কারণে মগজটা চোট পেতে পারতো। মগজ ছাড়া প্রাণীটার বাঁচা অসম্ভব। সেই জন্যে মগজটা রক্ষা করবার জন্য খুলির উদ্ভব হয়েছে।

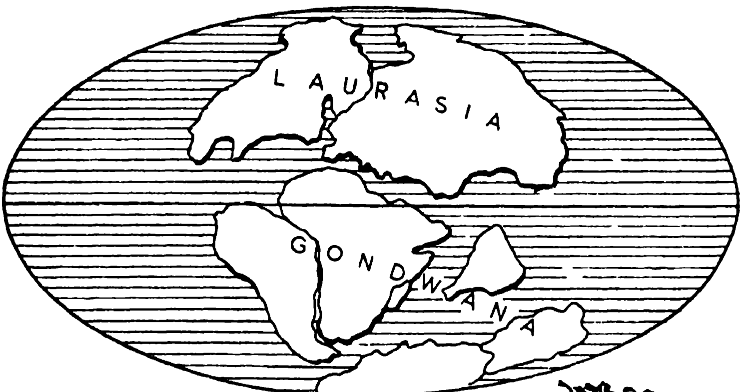
"অথচ এই খুলি নামক শক্ত একটা বস্তু আছে বলে জন্মের সময় খুব অসুবিধা হয়। স্তন্যপায়ীদের বাচ্চারা যখন জন্মায় তখন জন্মনালীটার ভেতর দিয়ে বাচ্চাটার শরীরটা বার হতে কোনও আয়েস লাগে না। আয়েস লাগে বাচ্চাটার মাথার খুলিটা বার হতে। ঐ সরু একটা নালী দিয়ে মাথাটা বার হতে যথেষ্ট হাঙ্গামা হয়। আর সব থেকে মাথা বার হতে বেশি হাঙ্গামা সেই প্রাণীটার হয়, যে-প্রাণীটার খুলিটা সব প্রাণীর খুলির থেকে বড়। অর্থাৎ কিনা, মানুষের। প্রাণী-জগতে এত কষ্টদায়ক জন্ম হওয়া আর কোন প্রাণীর মধ্যে নেই। অথচ মানুষ যখন জন্মায় তখন তার মাথাটা মোটে এক পাউণ্ড মতো ওজনের হয়। পূর্ণবয়স্ক মানুষের মগজটা হবে সোয়া-তিন পাউণ্ডের মতো ওজনের। জন্মের সময় যদি মানুষের সোয়া-তিন পাউণ্ডের মগজ হ'ত, তো মানুষটা কখনই জন্মাতেই পারতো না। জন্মের সময়ই বাচ্চাটা মারা যেত, আর তার সঙ্গে মারা যেত বাচ্চার মা-টাও। সেইজন্য অনন্য উপায় হয়ে এই ব্যাপারটার বিবর্তন হয়েছে। মানুষের মগজ জন্মাবার পরও বাড়ে। জন্মের পর এই অসম্ভব দ্রুত হারে মগজ-বৃদ্ধি আর-কোনও প্রাণীর হয় না। অথচ তা না হলে মানুষ এত বুদ্ধিমান হ'ত না। এত উঁচুতে উঠতে পারতো না। তা ছাড়াও জন্মানোর সময়ে বাচ্চাদের খুলির মধ্যে ফাঁক ফাঁক থাকে। সেগুলো জোড়া থাকে না। সেগুলোকে ইংরেজীতে বলে ফনটানেল[৫]। এগুলো ফাঁক ফাঁক থাকে বলে জন্মাবার



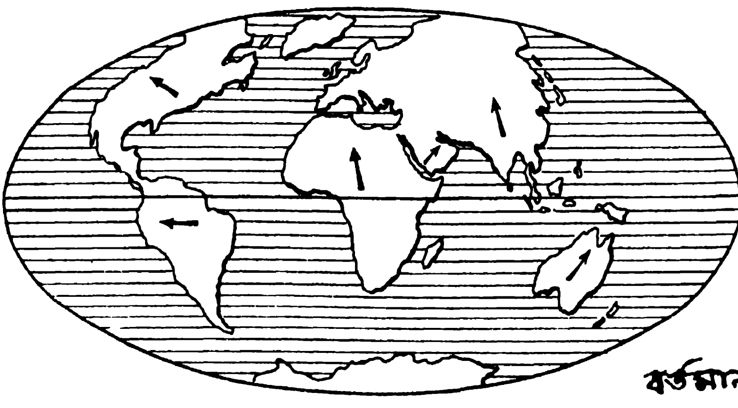
লুসি



200000000
বছর আগে



১৩৫000000
বছর আগে

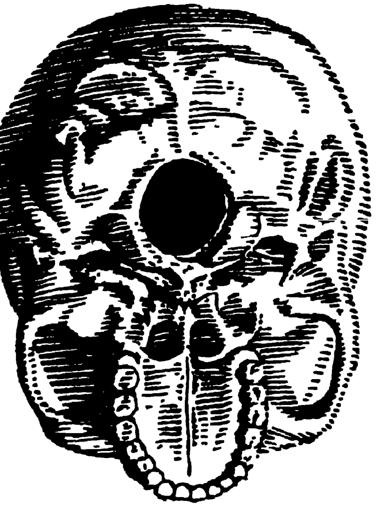


বর্তমান

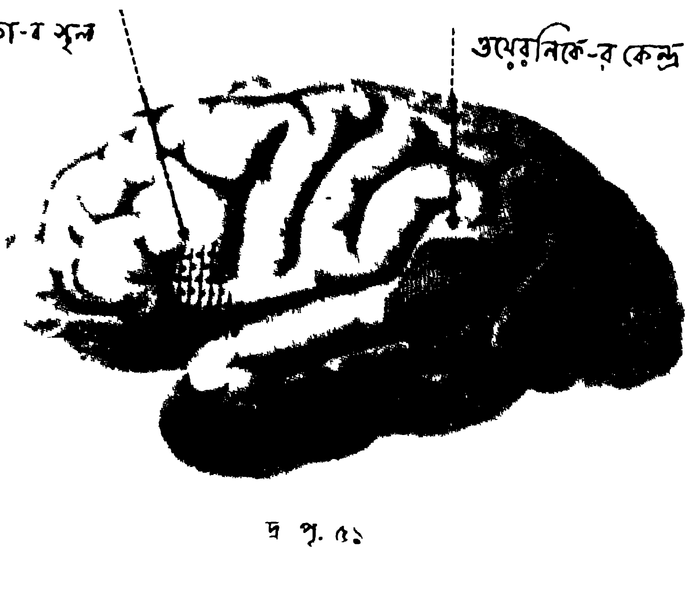
প্র. পৃ. ২৫০



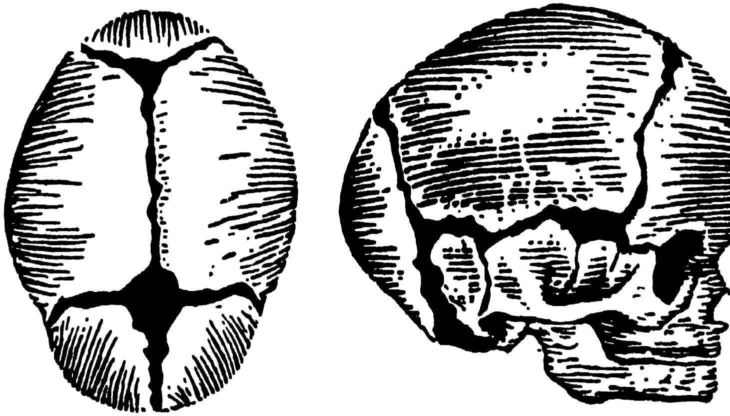
দ্র পৃ. ২৫



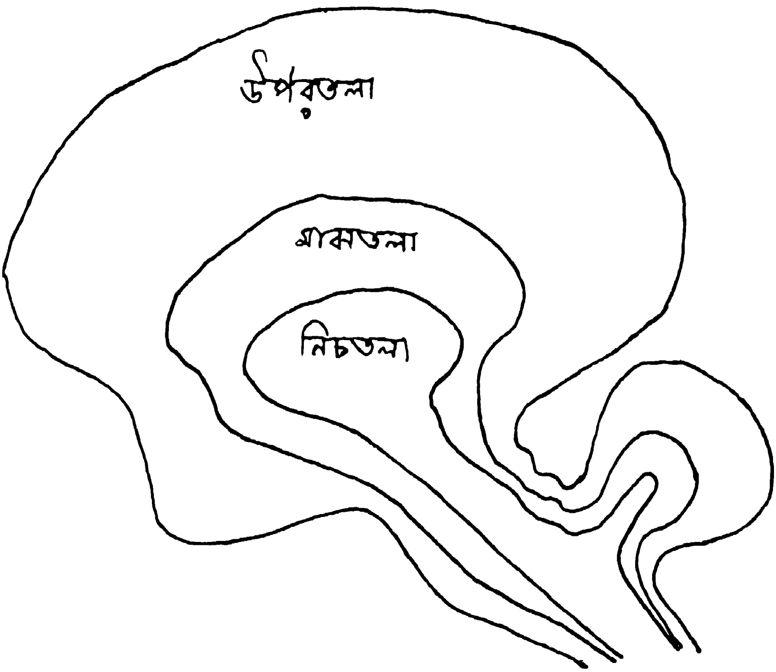
দ্র. পৃ ১৫



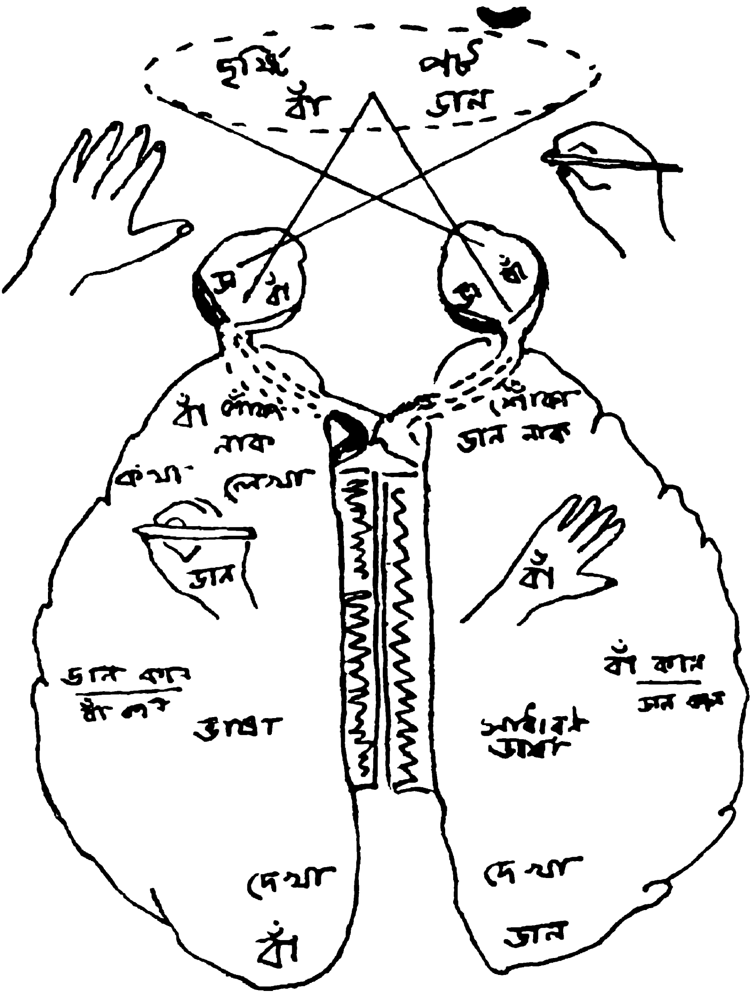
দ্র পৃ. ৫১



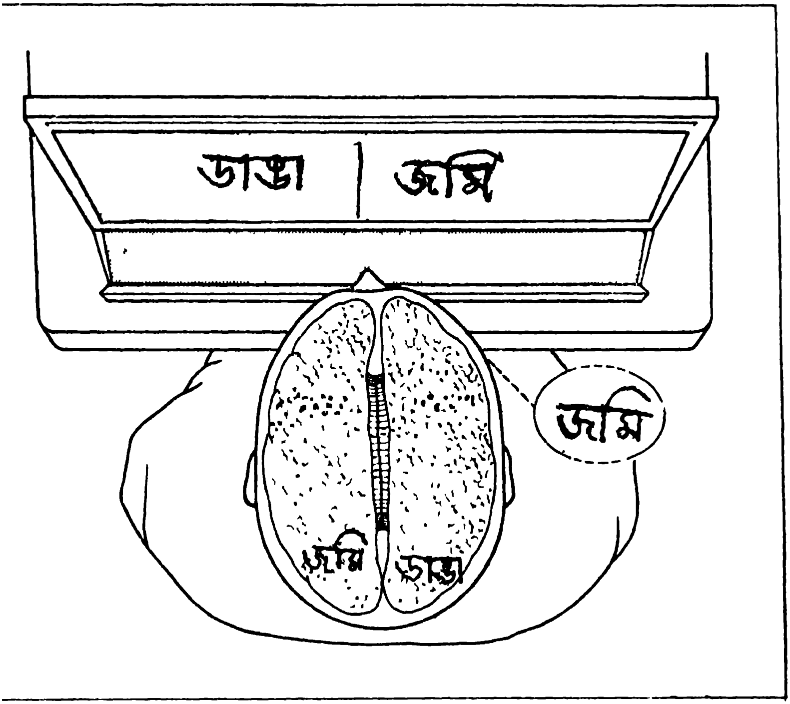
দ্র. পৃ. ৬৪



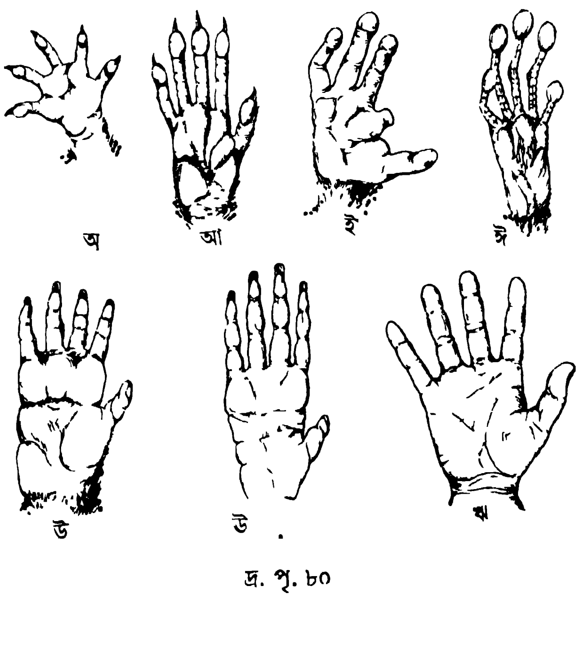
দ্র. পৃ ৬৯



দ্র. পৃ. ৭১-৭২



দ্র. পৃ. ৭৩



দ্র. পৃ. ৮০



শিশু শিম্পাঞ্জী



পূর্ণবয়স্ক শিম্পাঞ্জী

দ্র পৃ ৮৮

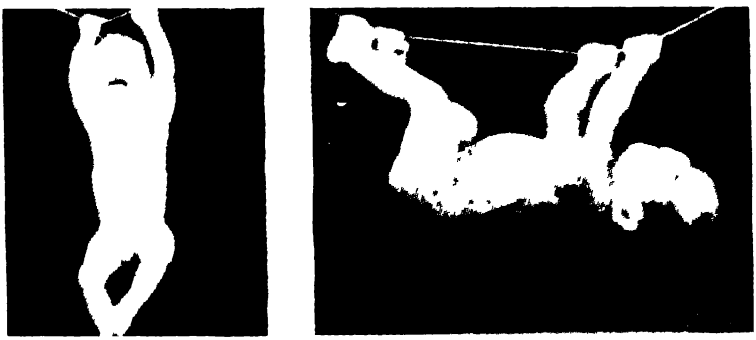


আধুনিক শিম্পাঞ্জীর চোয়াল — মানুষবৎ-এর চোয়াল — মানুষের চোয়াল

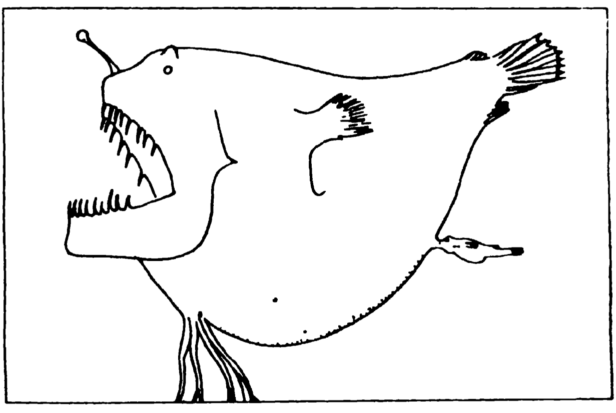
দ্র পৃ. ৮৮



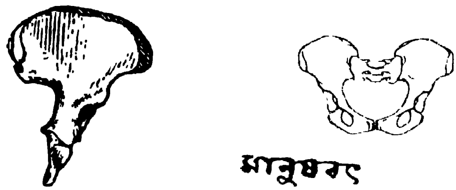
দ্র. পৃ. ৯৩



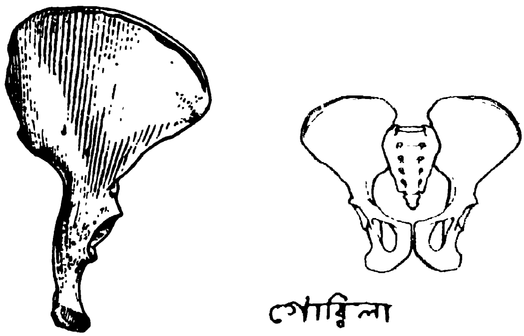
দ্র পৃ ৯৯



দ্র পৃ. ১৩৪



মানুষবৎ



গোরিলা



লুসি শিম্পাঞ্জী

দ্র. পৃ. ৯১

সুবিধে হয়। জন্মাবার সময় মাথাটা সাধারণত আগে বার হয়। একবার মাথাটা জন্মনালী থেকে কোনমতে বার হয়ে গেলে শরীরটা বার হতে কোনও অসুবিধা হয় না। এই ফাঁকগুলো থাকে বলে খুলিটা কিছুটা লম্বালম্বি আকারের হয়ে গিয়ে জন্মের সময় খানিকটা সাহায্য করে। নয়তো খুলিটা হয়তো আটকিয়ে যেত। জন্মাবার পর, দ্বিতীয় বৎসর থেকে এই ফাঁকগুলো জোড়া লাগতে শুরু করে, যদিও পুরোপুরি জোড়া লাগতে সময় লাগে পূর্ণ বয়স অবধি। এটা না হলে জন্মের পর খুলির মধ্যে মগজটা বাড়তে জায়গা পেত না।"

মেজোমেসো বলছিলেন—"মগজ-বিস্ফোরণ বলতে জানো কি বুঝোয়? মগজ-বিস্ফোরণ বলতে এই বোঝায় যে মানুষের মাথাতে ছাই রঙের বাকলটা যেটা কিনা আসলে মগজের সারবস্তু, সেটা বেশ একটা মোটা ধরনের জিনিস। শুধু ফোলা নয়, মগজটা এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো বটে[৬]। একটা ছোট খুলির জায়গার মধ্যে অনেকখানি ছাই রঙের মগজ যেন ভাঁজ-ভাঁজ এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো করে ভরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

"মগজটার মধ্যে অনেক-অনেক ভাগও আছে। দেখবার, শোনবার, শোঁকবার, আস্বাদন করবার— সব আলাদা-আলাদা জায়গা আছে। কোন-কোন প্রাণীর শোঁকবার ভাগটা উন্নত বেশি— কারো-কারো দেখবার ভাগ কিংবা শুনবার ভাগটা। এগুলো সব জ্ঞানেন্দ্রিয়। তাছাড়া মগজে কর্মেন্দ্রিয় পরিচালনা করবার জন্য অনেকটা জায়গা আছে। পা চালাবার জন্য, হাত চালাবার জন্য, চোখ চালাবার জন্য, ঠোঁট চালাবার জন্য, কণ্ঠনালী চালাবার জন্য, বুক, পেট, কোমর, পেছন —সব চালাবার জন্য মগজে পাশাপাশি স্থান নির্ধারিত করা আছে। আর সব থেকে যেটা দরকার সেটা চালাবার স্থান— অর্থাৎ আঙুল আর তার মধ্যে সর্বপ্রধান বুড়ো আঙুল, এ-দুটো চালাবার জন্য স্থান— সেটা অনেকটা জায়গা জুড়ে মগজে আছে। মানুষের মগজের কতটা অংশ যে আঙুল, আর বিশেষ করে বুড়ো আঙুল চালাবার কাজে নিয়ত, তা আমরা মগজের ছবি না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবো না। আঙুলগুলো আর বুড়ো আঙুল— এদের জন্যই মানুষ অনেকাংশে মানুষ। তোমাকে আগেই বলেছি মানুষ অনেকটাই হাতের আঙুলের দান। মানুষ অনেকাংশে মেহানতী মানুষ। সেরকম মগজে বিরাট একটা জায়গা জুড়ে ঠোঁট চালাবার কাজ করে। ঠোঁট নেড়ে-নেড়ে আমরা

কথা বলি। মানুষ যে মানুষ হয়েছে তার জন্য কথা বলাটা একটা বিরাট প্রয়োজনীয় ব্যাপার। মানুষ যেমন মেহনতী মানুষ, তেমনই আবার মানুষ বকবকে-ঠাকুরদাও বটে। মানুষের দল বেঁধে থাকবার সব চাইতে বড় হাতিয়ার হ'ল তার ভাষা।"

দুই

সেদিনটার কথা আমার পরিষ্কার মনে আছে। মেজোমেসো এসেছিলেন কলকাতাতে। ইস্কুলটুকু করা ছাড়া আমার আর ভাইটির বাড়ি থেকে বেরোতে বিন্দুমাত্রও ভালো লাগতো না। কিন্তু সেদিনটাতে আমাদের যাবার কথা ছিল বনভোজনে। আমার ছোট পিসিদের বাগানবাড়ি আছে বেহালায়। সেখানে যাবার কথা ছিল আমাদের। দিনটা ছিল রবিবার। তার আগের দিন সারাদিন ধরে ঠামাতে আর আমাতে হুজ্জোতি চলেছে। ঠামার ইচ্ছে ছিল যে, আমি বনভোজনে শাড়ি পরে যাই। ঠামার ধারণা যে, আমাকে খুব সুন্দর দেখতে—যদিও আমার বন্ধুরা সর্বদা বলে যে, স্বর্ণ, তুই যে কী অসম্ভব গাঁইয়া দেখতে তা কী বলি! বিশ্রী একটা বোকার মতো ফর্সা তুই। ড্যাবডেবে চোখ দুটো। তায় আবার কোঁকড়া-কোঁকড়া তেল-জবজবে চুল। মাসিমাকে (অর্থাৎ আমার মাকে) ছ্যাখ, কী স্মার্ট, কতটা লম্বা উনি। কী স্মার্ট চলাফেরা। কী মিষ্টি হাসি। তুই কী করে মাসিমার মেয়ে হয়ে এইস্যা গাঁইয়া হলি তা কে জানে! আমি আর ঠামাকে আমার বন্ধুদের মন্তব্য-গুলো বলি না। ঠামা মনের সুখে আমার মাথায় তেল মাখান। ছুটির দিনে গায়ে সর ময়দা মাখান। বেচারা ঠামার মনে কষ্ট দিতে আমার মন সরে না।

কিন্তু সে যাহোক, শাড়ি পড়ার ব্যাপারে আমি প্রবল প্রতিবাদ করে উঠলাম। বনভোজনে যাবো। গাছে চড়বো। হয়তো ছোট-পিসিদের পুকুরে চানও করা যাবে। ব্যাডমিনটন খেলা হবে। শাড়ি পরে শেষে কি হুমড়ি খেয়ে কিংবা ডুবে মরবো নাকি? ছোটপিসি আমাকে বলে গিয়েছিল— যেমন করে পারো, মাকে ম্যানেজ করে স্কার্ট-ব্লাউজ পরে আসবে। আমি আর স্কার্ট-ব্লাউজ অবধি বলতে সাহস পেলাম না। বলতে থাকলাম, নতুন আনা কাকুর সালোয়ার-কামিজটা

পরবো। ঠামা গালে হাত দিয়ে বসে পড়লেন। বললেন, "ওটা পরলে তোকে ঠিক হনুমান মনে হবে। একটা অখাদ্য খদ্দরের বস্তার মতো ওটা দেখতে।" ধীরে-ধীরে লেগে গেল ধুমাধুম। ঠামা আমাকে একটা মান্ধাতা আমলের বেনারসী শাড়ি পরাবেনই। আমিও পরবো না। আমি বলতে থাকলাম— ভয়ানক গরম পড়েছে, আমি শাড়ি পরতে পারবো না। ইতিমধ্যে যখন প্রায় বেলা আটটা, হঠাৎ দেখি টুলুমাসি এসে উপস্থিত।

টুলুমাসি মা-র বান্ধবী। দু'জনে বিলেতে একসঙ্গে পড়াশোনা করেছেন। টুলুমাসি নাকি বহুকাল আগে এক সাহেবকে বিয়ে করে-ছিলেন। সে যা-ই হোক, বছর খানেকের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ করে টুলুমাসি স্বাধীন। সাহেবদের ওপর হাড়ে-হাড়ে চটা টুলুমাসি। কেন চটা, সেটা বলেন না। শুধু বলেন, ওরা একটা বর্বর জাত। টুলুমাসির একটা ভাঙা গাড়ি আছে। বহুদূর থেকে ওটার ঝরঝরে আওয়াজ পাওয়া যায়। টুলুমাসি বলেন, গাড়ির দাম এত অসম্ভব বেড়ে গিয়েছে যে এই ঠাকুরদার আমলের গাড়িটা যে পাল্টাবো তা আর সম্ভব নয়। দরকার পড়লে টুলুমাসি গাড়ির চাকা বদল করা অবধি সবই নিজে হাতে করতে পারেন। টুলুমাসিও মায়েদের অফিসে কাজ করেন। টুলুমাসিকেও ছোটপিসি বনভোজনে নিমন্ত্রণ করেছেন।

টুলুমাসিকে দেখে ঠামা হাতে স্বর্গ পেলেন যেন। বললেন— "হ্যাঁ টুলু, আজকে বেশ শীত-শীত করছে, তাই না?" টুলুমাসি বেচারা অতশত জানবেন কি করে। বললেন, "ঘরে বসে আছেন তো, মাসিমা, জানবেন কী করে! কী গরম— বাইরে একবার বেরিয়ে দেখুন।" ঠামা চট্ করে পেছন দিকে চেয়ে দেখলেন, আমি কোথাও ঘাপ্‌টি মেরে টুলুমাসির কথা শুনতে পাচ্ছি কিনা। বেচারা ঠামা জানতেন না আমি ঠিক সিঁড়ির মুখটাতেই ছিলাম।

টুলুমাসির কথা শুনে আমিও তা-ধিং-তা-ধিং করে নাচতে শুরু করলাম। ঠামাও দমদম্ করে পা ফেলে রান্নাঘরে চলে গেলেন।

ব্যাপার দেখে টুলুমাসি বেচারা ভ্যাবাচাকা। করুণ মুখ করে মাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন— "কী আবার বলে ফেললাম মাসিমাকে কে জানে! আর তোর মেয়েটাও তো দেখছি ভারী অসভ্য হয়েছে। গুরুজনদের গেরাজ্যি অবধি করে না দেখছি।"

শেষ অবধি আমি ঠামার সঙ্গে যুদ্ধে জিতে সালোয়ার-কামিজ পরে বনভোজনে গেলাম। ঠামার সঙ্গে সব যুদ্ধেই আমি শেষ অবধি বিজয়ী হই। কিন্তু যুদ্ধে জেতার আগে অবধি আমার যে উৎসাহ থাকে, যুদ্ধে জেতার পর সে-উৎসাহ অকস্মাৎ উধাও হয়ে যায়। ঠামার করুণ মুখ আমি সহ্য করতে পারি না। খালি ছটফট করতে থাকি। কথাটা বার বার আবার তুলি। যদি ঠামা আবার দাঙ্গাতে নেমে পড়েন। কিন্তু ঠামা তা করেন না। আমার ধারণা যুদ্ধে হেরে ঠামাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন।

বনভোজনে এসে খেলতে আমার এতটুকুও ভালো লাগলো না। ভাইটি অরুণাভর সঙ্গে বসে-বসে গল্প করছিল। আমি ওখানে গিয়ে বসলাম। আর কিছুক্ষণ বাদে দেখলাম সবাই দল পাকিয়ে পাকিয়ে বসে আছে— ঠামা, জ্যাঠাবাবু, বাবা, আর টুলুমাসি। মা, ছোটপিসি, কাকু। অরুণাভ, মিতালি, আঙুর আর সাগর। ছোটপিসে আর বাকি সব গোটা-সাতেক কাচ্চা-বাচ্চা। আমি, ভাইটি আর মেজোমেসো। জেঠিমা কাজের লোকদের সঙ্গে করে মাংস আর খিচুড়ির তদারকি করতে থাকলেন। কোনও দলে যোগ দিলেন না।

এখানেও মেজোমেসো মগজের কথা বলতে থাকলেন। বললেন— "মগজ নিয়ে সবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছে। মগজে অনেক-অনেক কাণ্ডকারখানা দেখে এখনও কিছুতেই বোঝা যাচ্ছে না মগজ-ব্যাপারটা কীরকম বস্তু। মগজ-ভরা কোটি কোটি কোষে খবর থাকে। অনেক কোষ থাকে যাতে এখনও খবর এসে ধরা পড়ে নি[৭]। একজন নাম-করা বৈজ্ঞানিক (Penfield Wilder) মগজে অস্ত্রোপচার কররার সময় একটা অসম্ভব অদ্ভুত ব্যাপার আবিষ্কার করেছিলেন। মগজে যখন এসব অস্ত্রোপচার হয় তখন রুগীদের জ্ঞান থাকে। রুগীরা ঘুমিয়ে থাকে না— কারণ, যেহেতু মগজ কোষে ব্যথা লাগে না রুগীদের ঘুম পাড়ানোর তাই দরকার পড়ে না। এই বৈজ্ঞানিক হাল্‌কা ইলেকট্রিকে ভরা ছুঁচ[৮] মগজের জায়গায়-জায়গায় ছুঁইয়ে দেখিয়েছিলেন যে, রুগীরা সে-রকম করার ফলে কে কীরকম ব্যবহার করে।"

মেজোমেসো বলেছিলেন— এ ছাড়াও কয়েকজন বৈজ্ঞানিক বলেন যে, আমাদের মগজে নিচ থেকে ওপরে, মগজের ভিন্ন-ভিন্ন তলা আছে। নিচতলার মগজ[৯] মাঝতলার মগজ[১০] আর বাইরেকার, অর্থাৎ ওপ্পর-

তলার মগজ।[১১] এই তিনটে তলা নিয়ে আমাদের গোটা মগজ। মেজোমেসো বলতে থাকলেন— ওঁদের এক পরিচিত বৈজ্ঞানিক, পল ম্যাকলিনের কথা। বললেন— "পল বলে যে বিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে প্রাণীদের মগজে অদলবদল কিংবা পরিবর্তন হয় নি। হয়তো মগজটা যেমনভাবে পুরোপুরি ঢেলে সাজানোর দরকার পড়েছিল, সেইরকমভাবে সাজানো সম্ভব ছিল না। একটা চালু নক্সাকে ঢেলে সাজানো সর্বদা সম্ভবও না। সেইজন্যই হয়তো দরকার-মাফিক মগজে প্রলেপ পড়েছে। পুরোনো মগজে যে মানসিকতা ছিল সেটার পরিবর্তন হয় নি। শুধু সেই মগজটাকে ঢেকে দিয়ে নতুন-নতুন মানসিকতার মগজের প্রলেপ পড়েছে। পুরোনো মনোবৃত্তিগুলো কিন্তু হারিয়ে যায় নি, শুধু নিচে লুকনো আছে। কিন্তু হঠাৎ-হঠাৎ ঘুমে কিংবা উত্তেজনার সময়ে তাদের সাড়া পাওয়া যায়। এসব কথা বলে বিজ্ঞান-জগতে পল একটা মহাহাঙ্গামা বাধিয়ে দিয়েছে। পলের ধারণা যে নিচতলার মগজে যদি আমরা হাল্কা ইলেকট্রিকের ছুঁচ ছোঁয়াই তো ঠিক পুরোনো কালের, হয়তো বা অবলুপ্ত-হয়ে-যাওয়া সরীসৃপদের দৃষ্টিভঙ্গিতে পৃথিবীটা দেখবো।[১২] মানুষ তখন ক্ষেপে উঠবে জায়গা বজায় কিংবা দখল করার উন্মাদনায়। তারা কে বড়-সাহেব, কে মেজ-সাহেব, কে ছোট-সাহেব, কার কত বেশি ক্ষমতা, অপিস-বাবুদের কিংবা রাজনীতিজ্ঞদের মতো সেটা দিবারাত্র গবেষণা নিয়ে মেতে থাকার। তাদের জীবনযাত্রা হয়ে যাবে একঘেয়ে (ritual), তার মধ্যে কোনও নতুনত্ব থাকবে না। একই ধরনের জীবনযাপন করবে সে দিনের পর দিন। নতুনকে আহ্বান করার ক্ষমতা তার থাকবে না।

"তারপর মাঝের তলার মগজে যদি ছুঁচ দিয়ে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে দেখি তো[১৩] আমরা নাকি দেখবো যে মানুষ ভয়ানকভাবে অনুভূতিশীল হয়ে গিয়েছে[১৪] (Vivid emotions), মানুষ যেন ঠিক নেশা করেছে। কখনো ভয় পাচ্ছে প্রচণ্ড। কখনও আনন্দ হচ্ছে অসম্ভব। রাগ, মারকাট্টা মেজাজ, অবাক (awe) হওয়া। এমনকি, কে জানে হয়তো তুরীয় ভাব যেটা, অনেকে বলেন ভগবান দর্শনে হয়— সে-সবই নাকি এখানে ইলেকট্রিক ছুঁচ ছোঁয়ালে বিনা কারণে মানুষ এমনি এমনিই অনুভব করবে। পল বলে, এ-মগজটা দিয়ে আমরা নিচু স্তরের স্তন্যপায়ীর মতো ব্যবহার করি। একটা বেড়ালের মগজের এ-জায়গায়

ছুঁচ ছুঁইয়ে দেখা গিয়েছিল যে, বেড়াল একটা ইঁদুর দেখে ভয়ে অস্থির। আবার একটা সিংহ-জাতীয় হিংস্র প্রাণীর এখানটা অস্ত্রোপচার করে বাদ দিয়ে দিলে দেখা গিয়েছিল যে, সে প্রাণীটা এত ভয়ে কাবু হয়ে পড়েছিল, যে-কেউ গিয়ে ওর মাথায় চাপড় মারলেও সে একটাও প্রতিবাদ করে নি।" মেজোমেসো বললেন,— "পল আরো বলে যে, আমরা যে সর্বভূতে ভালোবাসা বিতরণ করি, অচেনাকে বুকে টেনে নিই. সেটাও মাঝের মগজের অবদান।" কিন্তু এই সুসম্পর্ক পরীক্ষা নিয়ে মাথা ঘামালাম না। মেজোমেসোর আগে তিনতলা মগজের কথার জের টেনে আমি বললাম— "তুমি বিশ্বাস করো এ-সব কথা? তুমি বিশ্বাস করো মাঝতলার মগজ, নিচুস্তরের স্তন্যপায়ীদের মগজ, ভালোবাসা, তুরীয় ভাব, অবাক হওয়া—এইসব সুন্দর-সুন্দর মনুষ্যোচিত অনুভব এনে দেয়। কখনো তা হতে পারে না। বড়জোর মারকাট্টা ভাব, রাগ এ-সব অনুভূতি নিচুস্তরের স্তন্যপায়ীদের মতো আমরা অনুভব করি। কিন্তু এটা কী করে সম্ভব যে ভালো-ভালো অনুভূতি যার জন্য মানুষ হ'ল মানুষই ; যেমন, সর্বভূতে দয়া, ভালোবাসা - এসব কী করে পশুদের সঙ্গে আমরা একসঙ্গে পশুর মতোই অনুভব করি।"

মেজোমেসো বললেন— "আরে বাবা, আমিও তো তাই বলি। কিন্তু ব্যাটা পল— কিছুতেই সেকথা মানবে না। ওর মনে হয় যে অনুভূতি অনুভূতিই— তা ভালো অনুভূতিই হোক আর মন্দ অনুভূতিই হোক। ওর মতে মানুষের ওপরতলার মগজ শুধু জ্ঞানের মগজ। সেখানে অনুভূতি—তা ভালোমন্দ যা-ই হোক না কেন তার কোন স্থান নেই।"

ভাইটি মেজোমেসোকে বলল— "আমিও পল্‌কে সমর্থন করবো। মানুষ জ্ঞানের জন্যই মানুষ। আমি জ্ঞানমার্গে বিশ্বাস করি, ভক্তিমার্গে না।"

মেজোমেসো বললেন— "তুমি আবার অন্য কথা বলতে শুরু করলে। জ্ঞানমার্গ, কর্মমার্গ, ভক্তিমার্গ— সে-সব অন্য কথা। বিজ্ঞানের মধ্যে দর্শন টেনে এনো না।" মেজোমেসো আরও বললেন— "আর তাছাড়া বিশ্বাস নিয়ে বিজ্ঞান কারবার করে না। প্রমাণ ছাড়া বিশ্বাসের কোন মূল্য বিজ্ঞান-জগতে নেই।"

আমি বললাম—"আর মনুষ্যোচিত মগজের কথা তোমাদের পল্ কী বলেছেন শুনি?"

মেজোমেসো বললেন— "স্বর্ণ যেমন ক্ষেপে আছে, বিজ্ঞানমহল পালের ওপর ঐ-রকমই ভীষণ ক্ষাপ্পা। আমিও মাঝে-মাঝে হয়ে যাই সেই দলে।" মেজোমেসো বললেন— "মনুষ্যোচিত মগজের নাম, নিও-করটেক্স (Neo-cortex)। মানুষের মগজে পঁচাশি ভাগই নিও-করটেক্স। উন্নত স্তন্যপায়ীদের নিও-করটেক্স আছে। তবে পাতলা ধরনের সেই প্রলেপটা - মানুষের মধ্যে সেটা যেন একটা পাউরুটির মতো মোটা কিন্তু খাঁজ-কাটাকাটা প্রলেপ। নিও-করটেক্স-বিস্ফোরণ মানেই মগজ-বিস্ফোরণ। এই নিও-করটেক্সের বিভিন্ন জায়গা আমাদের বিভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয় পরিচালনা করে। মানুষ সব ক'টা ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চোখের ব্যবহার বেশি করে। নিও-করটেক্সের পেছন দিকটা দিয়ে আমরা দেখি।"[১৫]

মেজোমেসো বললেন— "পেনফিল্ড নামের সেই যে বৈজ্ঞানিকের কথা আমি বলেছিলাম, তিনি ছুঁচ ফুটিয়ে-ফুটিয়ে দেখেছিলেন অনেক সময় যে খুব ছোটবেলায় দেখা কোন দৃশ্য যেটা আমরা ভুলে গিয়েছি, সেটাও পরিষ্কার সিনেমার ছবির মতো চোখের সামনে ভেসে ওঠে মগজ অস্ত্রোপচারের রোগীদের। একজন রুগী, সে ভালোভাবেই জানে যে, সে অস্ত্রোপচার-টেবিলে শুয়ে আছে ; তবুও যাঁহাতক না এই মগজের এই দর্শন-ভাগে ছুঁচ ফোটানো হয়েছে, রোগীর হঠাৎ মনে হ'ল যে সামনে দিয়ে ফরফর করে একটা প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে। এত পরিষ্কারভাবে সে প্রজাপতিটা দেখতে পেল যে সে টেবিলে শোয়া অবস্থাতেই হাত বাড়িয়ে প্রজাপতিটাকে ধরতে গেল। এইরকমভাবে শব্দ-ভাগে ছুঁচ ফুটিয়ে দেখা গিয়েছে যে, রোগী যন্ত্রসংগীত শুনতে পাচ্ছে। আঘ্রাণ-ভাগে ছুঁইয়ে দেখা গিয়েছে যে, রোগী কোন অতীতের শোঁকা গন্ধ শুঁকতে পাচ্ছে।

মেজোমেসো বলে চললেন "পেনফিল্ড এইরকমভাবে মগজের কোন্ বিভিন্ন জায়গায় ছুঁচ বুলিয়ে-বুলিয়ে খুঁজে বের করেছেন মগজের কোন্ জায়গা কোন্ কোন্ জ্ঞানেন্দ্রিয়র সঙ্গে যুক্ত। কোন্ জায়গা পর পর পাশাপাশি বিভিন্ন কর্মেন্দ্রিয়র পরিচালনার স্থান।"

মেজোমেসো আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন— "আচ্ছা, স্বর্ণ, তুই কি একটা খবর জানিস ? তুই কি জানিস যে মগজের বাঁ-দিকটা শরীরের ডান-দিক পরিচালনা করে আর মগজের ডান-দিকটা শরীরের বাঁ-

দিক পরিচালনা করে?"

আমি খবরটা জানতাম না। তাই শুনে অবাক হয়ে গেলাম।

মেজোমেসো বললেন, "শরীরের বাঁ-চোখ, বাঁ-কান, বাঁ-হাত, বাঁ-পা, বাঁ-বুক, বাঁ-ঠোঁট— সবই মগজের ডান-দিককে পরিচালনা করে। এর মধ্যে ব্যতিক্রম কিছুটা শোঁকা। শোঁকা ব্যাপারটা খুব পুরনো ইন্দ্রিয়। বিবর্তনের প্রথম দিককার প্রাণী বেশি শুঁকতে পারতো। মানুষের মধ্যে শোঁকাটা খুব অনুন্নত ইন্দ্রিয়। আমাদের থেকে ভালো শোঁকে পৃথিবীর প্রায় বেশির ভাগ প্রাণীই। বাঁ-কানের শব্দ আমরা বেশির ভাগটা ডান-মগজে শুনি। অল্প একটু বাঁ-মগজে শুনি। আবার তেমনি ডান-কানের শব্দ বেশীর ভাগ বাঁ-মগজে আর অল্প একটু ডান-মগজে শুনি।"

তিন

মেজোমেসো বলতে থাকলেন— "মগজটাকে যেমন নিচ থেকে ওপরে ভাগ করা যায় তেমনি মগজটাকে ডান আর বাঁ— সেরকম দুদিকেও ভাগ করা যায়। মানুষের মগজে বাঁ-দিকটার প্রাধান্য বেশি। বেশির ভাগ মানুষই ডান-হাতের মানুষ। মানুষ ডান-হাত দিয়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাজ করতে পারে। ডান-চোখ দিয়ে ভালো দ্যাখে। ডান-কান দিয়ে কম আওয়াজের শব্দেও সাড়া দ্যায়। ডান-দিকের শরীরটা মানুষের মধ্যে প্রধান বলে মানুষের বাঁ-মগজটা ডান-মগজের থেকে অল্পাংশে একটু বেশি বড়। তবে সবচাইতে বড় কথা হচ্ছে যে বাঁ-মগজ দিয়ে মানুষ কথা বলে। কথা বলার জায়গাটা বাঁ-মগজে। লেখার মগজটাও বাঁ-মগজে। কারণ, বেশির ভাগ লোকই ডান-হাত দিয়ে লেখে। পড়ার মগজও বাঁ-দিকে। অঙ্ক কষার মগজটাও বাঁ-দিকে। খুব ছোটবেলায় যেসব লোকের বাঁ-মগজ জখম হয়ে যায়, তারা অবশ্য ডান-মগজ দিয়ে কথা বলে, লেখে, অঙ্ক কষে। কিন্তু বেশি বয়সে কারুর যদি বাঁ-মগজ জখম হয়ে যায়, মানুষ ভালো করে কথা বলতে পারে না।

"মজার মজার পরীক্ষা-নিরীক্ষা এই ডান-দিকের আর বাঁ-দিকের মগজ নিয়ে হয়েছে। রোজার স্পেরি বলে এক বৈজ্ঞানিক দেখিয়েছেন যে, ধরো আমাদের মুখের সামনে নাক-বরাবর যদি একটা কাগজের পাঁচিল খাড়া করে দিই আমরা, অর্থাৎ কিনা এখন পাঁচিলের বাঁ-দিকটা শুধু বাঁ-

চোখ দেখতে পাবে আর ডান-দিকটা শুধু ডান-চোখ দেখতে পাবে। তারপর ধরো পাঁচিলের বাঁ-দিকের একটা পর্দায় দেখানো হ'ল একটা শব্দ "ডাঙা" আর ডান-দিকে দেখানো হ'ল আর একটা শব্দ "জমি"। তুমি আমি যে-কেউ দুদিকের চোখের খবর, ডান-বাঁ দুই মগজে চালাচালি করে দুটো শব্দকে মিলিয়ে বুঝতে এবং বলতে পারবো যে পর্দাতে লেখা আছে "ডাঙা জমি"।[১৬] এর কারণ হচ্ছে যে বাঁ-মগজ আর ডান-মগজ মধ্যিখান দিয়ে জোড়া দেওয়া আছে অনেকগুলো সুতোর মতো জিনিস দিয়ে। এটাকে ইংরেজীতে বলা হয়— বারপাস কলো-সাম।[১৭] কিন্তু অনেক রকমের মৃগী রুগী আছে যাদের এই সুতোর মতো জিনিসগুলো অস্ত্রোপচার করে কেটে দেওয়া হয় যাতে ক'রে মগজের ডান আর বাঁ-দিকটা বিযুক্ত হয়ে যায়। এইসব রুগীদের যদি ঐ এক চোখে "ডাঙা" আর অন্য চোখে "জমি" দেখানো হয় তবে রুগীরা পড়ে যায় মহাফাঁপরে। ওরা হয়তো বুঝতে পারে যে ওরা দেখতে পাচ্ছে ডাঙাজমি, কিন্তু বলবার সময় রুগী বলবে যে সে শুধু "জমি" দেখতে পাচ্ছে। যদি ওকে জিজ্ঞেস করা হয় যে সে কী জমি দেখতে পাচ্ছে, ডাঙাজমি না জলাজমি, নাকি ধান-জমি, রুগী ঠিকমতো উত্তর দিতে পারে না। এক আন্দাজ করা ছাড়া। কিন্তু রুগীকে যদি বলা হয় যে সে কী দেখেছে সেটা যেন সে লিখে দেয় আর রুগীর বাঁ-হাতটা যদি একটা কাপড় দিয়ে লুকিয়ে রাখা হয়, তবে রুগী লিখে দেয় "ডাঙা"। ও ওর নিজের হাতের চালনা থেকে বুঝতে পারে যে ও কিছু একটা লিখছে, তবুও জিজ্ঞেস করলে ও বলতে পারে না যে, ও কী লিখেছে। কারণ বলার মগজটা সাধারণত নব্বুই ভাগ মানুষের মধ্যে বাঁ-দিকের মগজ পরিচালনা করে আর যাতে করে ওর মগজের ডান-দিক বাঁ-দিক দুটো দিকই খবরাখবর আদানপ্রদান করতে পারে সেটা ওর দ্বারা সম্ভব না, কারণ, ওর করপাস কলোসামটা বিভক্ত করে দেওয়া হয়েছে অস্ত্রোপচার করে।

ভাইটি এবার একটা প্রশ্ন করলো। বলল, "আচ্ছা বাঁ-মগজ তো কথা বলায়, লেখায়, পড়ায়, অঙ্ক কষায়। ডান-মগজটা তাহলে কী করে? সে কি নিষ্কর্মা?"

মেজোমেসো বললেন, "আরে, সেটা তো একেবারে বলতে ভুলে গিয়েছি যে, ডান-মগজ দিয়ে আমরা কবি হই। আমরা সামগ্রিকভাবে

দেখতে পাই। আমরা মুখ চিনতে পারি, নক্সা বুঝতে পারি। ডান-মগজ যেসব মানুষের জখম হয়েছে তারা অনেক সময় নিজেদের মুখও আয়নাতে দেখে চিনতে পারে না। কোন-কিছুর সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিতে পারে না। তারা কবি হতে পারে না। তারা পারে না শিল্পী হতে। তারা নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাবতে পারে না। তারা পারে না আবিষ্কারক হতে।[১৮]

মেজোমেসো আরও বললেন— "তবে আমরা সর্বদা মগজে এই স্থান এই কাজ করে— এমনি করে বলতে পারি না। মগজ জখম হলে দেখা গিয়েছে, এক জায়গার কাজ অন্য জায়গায় করছে। মগজে অনেক অতিরিক্ত কোষ আছে। তারা অন্যান্য জায়গার কাজের ভার অনেক সময় সমাধা করতে পারে। এটা বেশির ভাগ স্মৃতির বেলা দেখা যায়। ইঁদুরদের নিও-করটেক্স-এর অনেকটা কেটে বাদ দিয়ে দিলেও দেখা গিয়েছে যে ওরা ওদের চেনা-জানা রাস্তা দিয়ে খাবারের খোঁজে যেতে পারে। রাস্তাঘাট ভুলে যায় না। ওদের স্মৃতি দিব্যি ভালো কাজ করে। তবে ব্যবহারিক জীবনধারার বদল হয় নি মনে হলেও, নিও-করটেক্স-এর বিভিন্ন জায়গা যে বিভিন্ন কাজ সাধারণত করে সেটা সম্বন্ধে সন্দেহ না থাকাই উচিত। অন্তত পেনফিল্ডের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর।[১৯] মেজোমেসো থামলেন, বললেন— "অন্তত আমার তাই মনে হয়।"

সামনে তাকিয়ে দেখি কলাপাতা দেওয়া হচ্ছে। মাটির গেলাসে গেলাসে জল পরিবেশন করছেন কাকু। জেঠিমা মা-র দিকে চোখ পাকিয়ে বললেন— "তোকে কোন কাজ দেওয়াটাই ভুল। পায়েসটাকে ধরিয়ে দিয়েছিস তো!" বাবা পিছন থেকে টিপ্পনি কাটলেন— "যাও, গিয়ে মাদার ডেয়ারি থেকে দুধ কিনে আনো। আমি শুধু পায়েস খাব এই আশায় বনভোজনে এসেছি।" ছোটোপিসে বড় দু'বাক্স সন্দেশ আর রাবড়ির হাঁড়ি দেখিয়ে বললেন— "আরে মেজোশালা, তাহলে তুমি ভীম নাগের সন্দেশ কিংবা আমাদের শঙ্করের দোকানের রাবড়ি খাবে না, কি বলো!"

মেজোমেসো জেঠিমার রান্নার সব থেকে বড় ভক্ত। সকাল-সন্ধে রোজই জেঠিমাকে একবার করে সাধেন, "আপনি কলকাতা ছেড়ে বিলেতে গিয়ে থাকবেন চলুন।" মাকেও মেজোমেসো রোজ ভজান।

বলেন, "বল্ না তোর বড়জাকে। আমাদের সঙ্গে লণ্ডনে চলুন। কেমন মাছের কচুড়ী, রসগোল্লার পায়েস আর কুমড়োর ছেঁচকি রেঁধে আমাকে খাওয়াবেন।" জেঠিমা মেজোমেসোকে বলেন, "তাহলে এখন, ঠাকুরপো, আমার জন্য একজন মেমের বরাদ্দ করো। আমাকে সে ইংরেজী শেখাবে— ক্যাট, হ্যাট, ম্যাট বলবো। হিল্‌ওলা জুতো পরবো। ভ্যানিটিব্যাগ হাতে নেবো।"

মেজোমেসোর উত্তর— "আমার মতো সাহেব থাকতে আপনার মেমের প্রয়োজন কি? আমিই আপনাকে ক্যাট, হ্যাট, ম্যাট, আই গো, ইউ কাম্, শেখাব।"

ভাইটি বলল— "মেজোমেসো এলে মা-র হাতের রান্নাটা যেন দ্বিগুণ ভালো হয়ে যায়। তাই না রে দিদি?"

জ্যাঠাবাবু শুনতে পেয়ে সাড়া দেন— "তা তো হবেই। দু'হাত খালি করে তোমার মা খরচা করবেন। খাবারের স্বাদ ভালো না হয়ে যাবে কোথায়! এ-মাসে আমার চিনি খরচা হয়েছে আঠারো কিলো। আর ঘি নয় কিলো। কিসমিস, কাজুবাদাম, গরমমশলার ফর্দ আর না-ই শুনলে।"

জেঠিমা বললেন— "উঃ, কিপটেমি আর ওঁর ঘুচল না। কাউকে খাওয়াতে হলে ওঁর গায়ে জ্বর আসে।"

চার

মেজোমেসো আমাকে একদিন বলেছিলেন— মাছ জলে বাস করে। জলের মধ্যে তার পৃথিবী আবদ্ধ। হাওয়ায় ওরা থাকে না। হাওয়া জিনিসটা খুব হাল্‌কা হয়। তার মধ্যে দিয়ে সূর্যের আলো চমৎকার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত ভেদ করে পৃথিবী উদ্ভাসিত করে। জলের পৃথিবীটা কেমন? না, সেটা হ'ল জল দিয়ে ভরা। হাওয়ার তুলনায় জল অনেক মোটা জিনিস, ভারী জিনিস। সূর্যের আলো ওর উপর প্রান্ত থেকে নিচ প্রান্ত পর্যন্ত সমানভাবে উদ্ভাসিত করতে পারে না। সমুদ্রের উপর দিকে কিছুটা আলো আছে। যত নিচের দিকে নামতে থাকবে তত অন্ধকার বাড়বে। বাড়তে-বাড়তে এক জায়গায় এসে দেখতে পাবে বিন্দুমাত্রও আলো চারপাশে কোথাও নেই। কালো

নিরেট অন্ধকার। সে-রাজ্যে একটা মাছ আর-একটা মাছকে দেখতে পায় না। বীভৎস সব বিকট চেহারা তাদের। চেহারা সুন্দর হয়ে লাভ কী তাদের! সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হবার মতো দর্শক কোথায়? নিরেট অন্ধকারে কে কাকে দেখবে! তু'চার রকমের মাছ আছে যারা সেই অন্ধকার জগতে নিজের আলো নিজে জ্বালিয়ে পথ ছাখে। তাদের শরীরে আলো জ্বালাবার মতো ক্ষমতা আছে। এদের কথা থাক। বরং সাধারণ মাছের কথা বলি:

সৌন্দর্য দেখতে না পেলেও একটা প্রাণীর বেঁচে থাকবার যুদ্ধে কিছু যায় আসে না। কিন্তু পাশে কোথায় খাবার পড়ে আছে কোন্ ছোট্ট ঝিনুকের মধ্যে, প্রাণীটাকে গপ্ করে গিলে খাওয়া চলে, সেটা না দেখতে পারলে তো না খেতে পেয়ে মরতে হবে। আবার তেমনই আশেপাশে কোথায় একটা বড় মাছ চুপ করে ঘাপ্টি মেরে বসে আছে, সুবিধা পেলেই গপ্ করে আমাকে গিলে খাবে, সেটাও না জানলে মরে যাবার সম্ভাবনা সমানভাবেই। হয় না-খেয়ে মৃত্যুবরণ, না-হয় কারও আহার হয়ে মৃত্যুবরণ। তুটোরই সমান পরিণাম। অথচ আলো না থাকলে দেখবে কী করে? সেজন্য মাছেদের আর উভচরদের মগজে দেখবার দরকার কম। ওদের মগজটা বেশির ভাগই শুঁকে দেখবার। জলের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে আছে খাবারের গন্ধ, শত্রুর গন্ধ। সেই গন্ধ বিচার করে মাছ চলাফেরা করে। মাছের মগজটা সাধারণত শোঁকবার মগজ। তবে, মাছেদের সময় থেকেই মগজে তিনটে ভাগ আছে। সামনের মগজ,[২০] মাঝের মগজ[২১] আর পেছনের মগজ[২২]। উন্নত স্তন্যপায়ীদের মধ্যেও এই ত্রিধা বিভক্ত মগজে থেকে গিয়েছে। যদিও তারা অন্য ব্যাপারে বদলিয়েছে, মগজের ওপরে প্রলেপ পড়েছে, তবুও সেই যে মাছেদের আমলে ত্রিধা বিভক্ত মগজের পত্তনী শুরু হয়েছিল, সেই আদত নক্সাটা পরেও মগজে টিঁকে গিয়েছে। সামনের মগজে সেরিব্রামের[২৩] প্রাধান্য। সেরিব্রামের বাইরের দিকটা ছাই রঙের মগজ কোষে[২৪] ভরা। মাছ আর উভচর তার মগজ দিয়ে গন্ধ বিচার করে, খাবার খুঁজে খুঁজে খায়, শত্রু-থেকে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করে।

কিন্তু যখন সরীসৃপের জন্ম হ'ল, ততদিনে তারা ডাঙাজমিতে উঠে এসেছে। ডাঙাজমিতে সূর্যের আলো চমৎকারভাবে কাজ করে দিনের-বেলাতে। সরীসৃপের চোখ বেশ একটা জটিল ব্যাপার। যতটা সে দেখে

তার মধ্যে বেশির ভাগ দেখাটা সে চোখের মধ্যেই সমাধা করে। চোখ থেকে খুব কম সংবাদই মগজে পাঠানো হয়।[২৫] দেখা ব্যাপারটায় সরীসৃপ আর স্তন্যপায়ীদের মধ্যে অনেক পার্থক্য।

মেজোমেসো বললেন— "কিন্তু তার আগে বলে নিই আর-একটা কথা। জলের সঙ্গে ডাঙাজমির আরো-একটা তফাৎ আছে। জলে ডুবে থাকা জীব-জানোয়ারের ওজন কম। জলের মধ্যে এসব জীব-জানোয়ার যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ওদের নিজেদের কাছে নিজেদের ওজন কম মনে হয়। সেই একই জীব যখন ডাঙাতে উঠে আসে, তখন ওদের নিজেদের ওজন বেশি মনে হয় নিজেদের কাছেই। অর্থাৎ কিনা, তুলনামূলকভাবে ডাঙাজমিতে প্রাণীদের ওজন বেশি হয়। সেইজন্য যে-সব জীব ডাঙাজমিতে উঠে এলো, তাদের ওই বেশি ওজনের দেহের উপযুক্ত পেশি সঞ্চালন করার জন্য মগজে খানিকটা স্থান নির্ধারিত হ'ল। অর্থাৎ কিনা, মগজের আয়তন আর ওজন দুইই খানিকটা করে বাড়লো। অর্থাৎ সরীসৃপদের সামনের অংশটা যেটার বেশির ভাগটাই "সেরিব্রাম" কিন্তু সেটা বাড়লো। সেরিব্রামের সামনে একটা নতুন প্রলেপের[২৬] মতন পড়লো।

"তারপর এলো পাখি। পাখিদের দৃষ্টি-ক্ষমতার খুবই বেশি প্রয়োজন। পাখিদের মধ্যে দেখবার মগজটা মাঝের মগজে আছে। যেহেতু পাখিদের ভালো করে দেখতে হয়, সেইহেতু ওদের মাঝের মগজটা উন্নত আর বড়। ছাই রঙের বস্তুটাই মগজের আসল কোষগুলো।

একটা কোষ অন্য একটা কোষের সঙ্গে ছোট, বড়, মেজ, সেজ, লম্বা—সব বিবিধ আকারের যোগসূত্র দিয়ে জোড়া দেওয়া থাকে। এগুলো যেন টেলিফোনের তার। মগজের নিজেদের কোষগুলোর মধ্যে আর মগজের কোষের সঙ্গে বাইরের শরীরের অন্যান্য কোষের যোগসূত্র স্থাপন করেছে। মগজের থেকে কোনও কোনও তার এত লম্বা যে পায়ের বুড়ো আঙুল অবধি চলে গিয়েছে। তাই ইচ্ছে করলে আমি যখন-তখন পায়ের বুড়ো আঙুলটা নাচাতে পারি। এই যে লম্বা লম্বা তার, এগুলো সব দেখতে সাদা রঙের। কারণ, এই তারগুলো চর্বি দিয়ে ঢাকা। আর এই চর্বির রঙ সাদা বলে তারগুলো সাদা দেখায়। মগজের আসল কোষগুলো আমিষ জাতীয় জিনিস দিয়ে তৈরি। ওদের রঙ ছাই।

'তারপর সবশেষে এলো স্তন্যপায়ী। স্তন্যপায়ীদের আর পাখিদের

শরীরের রক্ত সরীসৃপদের রক্তর মতো ঠাণ্ডা না। গরম পড়লে স্তন্যপায়ীদের শরীর ঠাণ্ডা করতে হয়— ঠাণ্ডা করার জন্য ঘামের সৃষ্টি করতে হয়। আবার শীত পড়লে শরীরের মধ্যে উত্তাপের সৃষ্টি করা হয়। আমরা বলি ঠাণ্ডায় মরে গেলুম রে বাবা। তেমন-তেমন শীত পড়লে শরীর কাঁপিয়ে-কাঁপিয়েও শরীর গরম করা হয়। স্তন্যপায়ীদের শরীরে উত্তাপ কিংবা ঘাম সৃষ্টি করাবার জন্য মগজে আর-এক প্রস্ত প্রলেপ পড়লো। এখন স্তন্যপায়ীদের খুব সুবিধা হ'ল। জীবনযাত্রাটায় পরিধি বেড়ে গেল। কারণ, সরীসৃপদের জীবনযাত্রা পরিমিত। খুব গরম পড়লে ওদের শরীর ঠাণ্ডা করবার উপায় নেই। শরীর যাতে জ্বলে-পুড়ে না যায় সেইজন্য ছায়ায় বসে থাকতে হয়। সরীসৃপদের শরীরের আঁশ এতদিনে বদলে গিয়ে হয়েছে পাখিদের পালক কিংবা স্তন্যপায়ীদের লোম। পাখিদের পালক আর স্তন্যপায়ীদের লোম শরীর গরম করার ব্যাপারে তাদের অনেক সাহায্য করে। দরকার পড়লে পালক কিংবা লোম ফোলানোও যায়। পালক আর লোমের নিচেকার হাওয়াটা গরম করে রাখা চলে। পালক আর লোম ভেদ করে হাওয়াটার উত্তাপ পালিয়ে বাইরের পৃথিবীর ঠাণ্ডায় মিলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে না। পালক যে শীতে কী চমৎকার শরীর গরম করে রাখে তা যারা পেঙ্গুইনপাখি বরফের মধ্যে দেখেছেন তাঁরা জানেন।

"তেমন করে আবার বেশি ঠাণ্ডাতে সরীসৃপ চলাফেরা করার মতো শক্তিসঞ্চার করতে পারে না। তখনও তাকে ঘুমিয়ে কাটাতে হয়। এই কারণে বৎসরের অনেক ভাগ শীতের সময় বা রাত্রিবেলা সরীসৃপ চলাফেরা করতে পারে না। অথচ রাতের অন্ধকারে কতরকমের খাদ্য পাওয়া যায়। বেশির ভাগ সরীসৃপই তাদের খাদক হয়ে উঠতে পারে না। যখন প্রথম দিকে স্তন্যপায়ীরা এসেছে, তখনও দিনের পৃথিবীতে সরীসৃপদের দৌরাত্ম্য প্রথম দিককার স্তন্যপায়ীরা সেইজন্য রাতের পৃথিবীর বাসিন্দা হ'ল। রাতের পৃথিবীতে দেখার দরকার কম। দরকার হ'ল শুনবার। সরীসৃপের মধ্যে দেখা ব্যাপারটা চোখের মধ্যেই সমাধা হয়। কিন্তু কানের মধ্যে শোনা ব্যাপারটা সমাধা করবার সুবিধে হ'ল না। স্তন্যপায়ীদের মধ্যে শোনা ব্যাপারটা মগজে করতে হয়। এটা মগজ বৃদ্ধির একটা বড় পদক্ষেপ। দেখবার জন্যও এসব প্রথম দিককার স্তন্যপায়ীরা চাঁদের আলোকে কাজে লাগাতে শুরু করলো। মগজের

মধ্যে শোনবার আর দেখবার খবরগুলো মিলিয়ে মিশিয়ে প্রথম দিককার স্তন্যপায়ীরা জীবনযাত্রা পরিচালনা করা শুরু করলো। শুধু তাই না। এখনও অনেক স্তন্যপায়ীরাই রাত্রের জীব। কিন্তু সে যা-ই হোক, আজ থেকে সাত কোটি বছর আগে হঠাৎ করে সরীসৃপদের রাজত্বের অবসান হ'ল। সরীসৃপদের রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হ'ল স্তন্যপায়ীদের প্রাধান্য। ওদের মধ্যে অনেকেই দিনের পৃথিবীর বাসিন্দাতে পরিণত হ'ল। দিনের আলোতে দেখবার মতন ওদের ক্ষমতার উদ্ভব হ'ল। কিন্তু এবার এই দেখাটা ওরা সরীসৃপদের মতো চোখেই সমাধা করে না। স্তন্যপায়ীরা চোখের মধ্যে আলো, অন্ধকার রঙ— সব গ্রহণ করবার পর সেটাকে চালান করে মগজে। স্তন্যপায়ীরা মগজ দিয়ে ছাখে। সুতরাং ওদের মগজ না বেড়ে যাবে কোথায়।

"স্তন্যপায়ীদের মধ্যে বাঁদর আর বনমানুষের পূর্বপুরুষরা[২৭] গাছে থাকে। এরা এক ধরনের পোকামাকড়-খেকো ইঁদুর ধরনের প্রাণী। এদেরই এক জাত লেমুর।" মেজোমেসো বললেন—"লেমুরদের কথা পরে বলবো। আগে যা বলছিলাম— গাছের ডালপালার ফাঁকে-ফাঁকে বিরাট বিরাট শূন্যমার্গ। চলাফেরাতে এতটুকু ভুল হলেই পপাতধরণীতল। অনেক বিচার বিবেচনা করে শূন্যপথ কতটা বড়, কতটা গভীর দেখে-শুনে গাছের ওপর চলাফেরা করতে হয়। এসব করতে দরকার সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম পেশি চালনা। বাড়লো মগজ খানিকটা। দৃষ্টি বিচারও সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম হবার দরকার পড়লো। কানের পাশ থেকে চোখ দুটো নাকের পাশে সরে আসতে শুরু করলো। যাতে করে চোখ এবার গভীরত্ব বোঝে। গভীরত্ব বিচার ভালো করে সব প্রাণী করতে পারে না। অনেকেই তারা বাঁ-চোখ দিয়ে বাঁ-দিকের পৃথিবী আর ডান-চোখ দিয়ে ডান-দিকের পৃথিবী ছাখে। ডান-চোখে ছাখা পৃথিবী আর বাঁ-চোখে ছাখা পৃথিবী মিলিয়ে মিশিয়ে চোখ সেটাকে সাজিয়েগুছিয়ে আলো, অন্ধকার কিংবা রঙের সামঞ্জস্য দিয়ে ডান-বাঁ ছায়ায় মেশানো গভীর একটা পৃথিবী আছে, এরা সেটা বিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে বেশ ভালো করে বুঝতে শুরু করলো।"

মেজোমেসো বললেন— "আগে লেমুরদের[২৮] কথা বলেছি। এরাও মানুষ বাঁদর, বনমানুষের পূর্বপুরুষ। আফ্রিকাতে এদের দেখা যায়। এদের শুঁকবার ক্ষমতা এখনও যথেষ্ট বেশি। কিন্তু এদের হাতের

আঙুলের নখগুলো থাবানখ না। আমাদের আঙুলের মতো চ্যাপ্টা নখ এদের। অর্থাৎ, এরা গাছের ডালে নখ কুরে-কুরে গাছে ওঠে না। এরা হাত দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে গাছে চড়ে। হাতের বুড়ো আঙুলটাও অন্যান্য আঙুলের সামনে আনা যায়। সুন্দর করে ফল পাতা হাত দিয়ে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে এরা খেতে পারে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে টারসিয়ার বলে এক ধরনের প্রাণী আছে। এদের চোখ দুটো আরও সামনের দিকে এগোনো। এরা গভীরত্ব বুঝতে পারে। শুঁকবার ক্ষমতাটা এদের মধ্যে কমে গিয়েছে। মুখটা সেইজন্য ফোলা না। বরং এদের মুখটা চ্যাপ্টা। এদের শুঁকবার বদলে দেখবার ক্ষমতা বেড়ে যাচ্ছে। এরা রাত্রে শিকার করে পোকামাকড়, ছোট সরীসৃপ, বাচ্চা পাখি, পাখির ডিম সব-কিছু খায়। এদের তুলনায় শুধু একজাতের বাঁদর ছাড়া[২৯] আর সবরকমের বাঁদরই দিনের প্রাণী। দিনের পৃথিবীটা রাত্রের পৃথিবীর মতো সাদা-কালো না। দিনের পৃথিবীটা রঙিন পৃথিবী। বাঁদররা রঙের তারতম্য দেখে গাছে গাছে, শূন্যমার্গে লাফিয়ে বেড়ায়। বাঁদররা রঙ ছাখে বলে নিজেরাও রঙিন। বিভিন্ন জাতের বাঁদরদের গায়ে বিভিন্ন রঙের ছোপ দেখা যায়। লাল, নীল, সোনালী। সুতরাং মগজের দৃষ্টিক্ষমতার জন্য জায়গা বাড়লো আরও এক প্রস্ত।

মেজোমেসো বললেন, "গাছের উপর কোন্ কোন্ প্রাণী কেমন ধরনের জীবনযাত্রা করে, তার ওপর নির্ভর করে তাদের মগজের ওজন আর আয়তন। ধরো, কতকগুলো প্রাণী পড়ে যাবার ভয়ে গাছের ওপর নট-নড়ন-চড়ন হয়ে স্থির হয়ে জীবনযাপন করা শুরু করলো।[৩০] মানে প্রখর পেশি-চালনা কিংবা প্রখর দৃষ্টি-ক্ষমতার এদের দরকার নেই। এদের মগজ বাড়লো না বেশি।

"আবার কতকগুলো প্রাণী আয়তনে খুব ছোট হয়ে গেল। হাল্কা-হাল্কা প্রাণী। লোমে ঢাকা। সেসব কাঠবিড়ালী। কারো কারো আবার দু'ধারেই হাত আর পা পাখার মতো জোড়া দেওয়া, যেমন—উড়ন্ত কাঠবিড়ালী। পড়বার সময় উড়ে এসে আস্তে করে নামবে। এদের মরবার ভয় কমে গেল। এদের মগজ বাড়লো না।"

মেজোমেসো বললেন— "যেসব বড়সড় ক্ষিপ্র প্রাণীর সৃষ্টি হ'ল, তাদের কথা বলি এবার: তাদের মধ্যে জন্ম হ'ল বেশির ভাগ বাঁদরের[৩১]। এদের মধ্যে কিছু বাঁদরের মধ্যে একরকম চমৎকার

ল্যাজের সৃষ্টি হ'ল। ল্যাজগুলো এত চমৎকার যে তাদের পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে গাছ থেকে দিব্যি ঝোলা যায়।[৩২] যেন একরকম পঞ্চম হাত। এসব পঞ্চম হাতের বাঁদরদের গাছ থেকে পড়বার ভয় অনেক কমে গেল। কারণ, এদের গাছ বাইবার জন্য চারটে হাত ছাড়াও একটা অতিরিক্ত হাত তৈরি হয়েছে। এরকমের বাঁদরদের নতুন মহাদেশ, অর্থাৎ কিনা উত্তর আর দক্ষিণ আমেরিকাতে পাওয়া যায়। পড়ে যাবার ভয় কমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে এদের চোখেরও অবনতি হ'ল কিছুটা। এদের যেহেতু পড়বার আশংকা কমলো, এদেরও মগজ খুব বেশি বাড়লো না।

"পুরোনো মহাদেশে অর্থাৎ এশিয়া, আফ্রিকাতে রয়ে গেল এমন সব বাঁদরদের মধ্যে কতগুলো বাঁদর দল বেঁধে থাকা শুরু করলো। গাছ থেকেও নেমে এল এরা মাটিতে। কিন্তু গাছে থাকা অবস্থাতে এদের আগের প্রাণীদের যে-চোখ আর হাতের মাহাত্ম্য বেড়ে গিয়েছিল, এদের মধ্যে সেই মাহাত্ম্যটা থেকে গেল। কারো-কারো ল্যাজগুলোও ছোট-ছোট। এরা বেবুন। এদেরই আরেক দল বনমানুষ।[৩৩] বন-মানুষদের মধ্যে ল্যাজ একদমই উবে গেল। বনমানুষ আছে চার রকমের গোরিলা। শিম্পাঞ্জী, ওরাংওটাং আর উল্লুক।

"উল্লুক এদের মধ্যে সবচাইতে ছোট প্রাণী। খুব কম ওজনের হয় ওরা। ওদের হাত দুটোও অসম্ভব লম্বা লম্বা। গাছ বাইবার জন্য হাত দুটো অসম্ভব পটু। এদের মগজ তাই আর বেশি বাড়লো না।

"ওরাংওটাংদের ওজন অত্যন্ত বেশি। তবে এরা চার হাত-পায়েই বাইতে পারে। এদের মগজ বড়। তবে শিম্পাঞ্জী আর গোরিলার মতো বড় না।

"বাকি রইল শিম্পাঞ্জী আর গোরিলা। এরা মানুষের[৩৪] সবচাইতে নিকটতম আত্মীয়। মানুষের সঙ্গে এদের দু'জনের সমান নিকটত্ব। মানুষদের মগজটা বিরাট। বিরাট মগজের সুবিধে হচ্ছে যে মগজ-কোষ-গুলোর মধ্যেকার যোগসূত্রগুলো খুব জটিল হওয়া সম্ভব। প্রত্যেকটা কোষের বহু বহু যোগসূত্র থাকে। তার একটা বিরাট সুবিধে হচ্ছে যে, ধরো, মানুষটা একটা শত্রু দেখতে পেল। সে এখন অনেকরকম করে সেই দেখাটার প্রত্যুত্তর দিতে পারে। সে পালিয়ে যেতে পারে। লুকিয়ে যেতে পারে। চেঁচিয়ে উঠে সাড়া দিতে পারে— আশপাশের অন্য মানুষদের। সে বর্শা ছুঁড়ে মারতে পারে। আরও কত কী। তার

মগজের যোগসূত্রটা এত জটিল, এতগুলো যোগসূত্র তার মগজে আছে যে, সে কী করবে তা সর্বদা বোঝা যায় না। একটা ব্যাঙ সে একটা পোকা দেখলে জিভটা বাড়িয়ে ওটাকে খেতে চেষ্টা করবেই করবে। ওর মগজের যোগসূত্র পরিমিত। ও যে ক্ষমতাটা নিয়ে জন্মেছে তার বেশি কিছু শিখে করতে ও সহজে পারে না। মানুষের মগজ বা উন্নত স্তন্যপায়ীদের মগজ কিন্তু সেরকম না। তাদের মগজে এত যোগ-সূত্র আছে, তাদের মগজ এত বড় যে, ও যেটা শিখে জন্মায়, তারও অতিরিক্ত জীবনে অনেক-কিছু শিখতে পারে। একটা বেড়াল কিংবা একটা মানুষের চোখে যদি এমন একটা চশমা পরিয়ে দেওয়া হয়, যাতে করে ও যা-কিছু দেখছে সব উল্টো হয়ে যাবে, যাতে করে ও দেখবে ঘর-বাড়ি সব-কিছু ওপর থেকে ঝুলছে, তবুও কিছু দিনের মধ্যেই ওদের মগজ সেসব দেখাগুলোকে সোজা করে দেখাবে। অর্থাৎ কিনা, ওদের চোখে যদিও সব উল্টো ছবি আসছে, তবুও ওর মগজ সেটা সোজা করে দেখাবে। স্পর্শ, গন্ধ, শব্দের সঙ্গে তাল রেখে দেখার মগজটাও সোজা দেখাবে ওকে। কিন্তু একটা ব্যাঙকে চশমা পরিয়ে তার পৃথিবীটা উল্টো করে দাও। ব্যাঙটা জীবনেও তার পৃথিবীটাকে সোজা করে দেখতে পারবে না।"

মেজোমেসো বললেন— "সে যা-ই হোক, যা বলছিলাম। পৃথিবীর থেকে সবরকম গ্রহণ করে আমরা তার উত্তরে যত বিবিধ রকমের আচরণ করতে পারি, সেটাকেই বলা হয় বুদ্ধি। অনুন্নত জীবরা বেশি রকমের আচরণ করতে পারে না। একটা মানুষ পারে। এটাই তার বুদ্ধি।"

মেজোমেসো বললেন— "আর জানো তো, ইন্দ্রিয়গুলো ছাড়াও মানুষের মগজে চিন্তার জায়গা আছে। ভবিষ্যৎ, অতীত, বর্তমান ভাববার জায়গা আছে। ভাষা বলার জায়গা, পড়ার জায়গা, লেখার জায়গা, অঙ্ক কষার জায়গা আছে। শিল্পী হবার জায়গা, আবিষ্কারক হবার জায়গা, সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার জায়গা আছে। আর আছে স্মৃতি। আর আছে এদের সব-কিছু মেলাবার মেশাবার জায়গা। এটাই মগজ-বিস্ফোরণ।"

পাঁচ

দিদা এত রোগা হয়ে গিয়েছেন যে দেখলে চেনা যায় না যে এই আমাদের আগেকার দিদা। আমাকে দেখে দিদা জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন কিছুক্ষণ। বললেন, "এত কাজ যে মরবার আগে আমাকে একবার দেখতেও আসতে পারলো না তোর মা?" দিদা কখনও এ-ধরনের আবেগ-ভরা কথা আগে বলেন নি। চিরকাল একটা যন্ত্রের মতো নিঃশব্দে কাজ করে গিয়েছেন। এখন চেহারাও যেমন পাল্টে গিয়েছে, হয়তো মনটাও। আমি বললাম, "মাকে আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি। মা নিশ্চয়ই আসতে পারবে।"

বড়মাসিকে জিজ্ঞেস করলাম, "মেজোমেসো, মেজমাসি, বুব্‌লা এরা সব কবে আসবে?" বড়মাসি বললেন, "মেজোমেসো চলে গিয়েছেন আফ্রিকাতে। বুব্‌লার হাম হয়েছে। মেজোমাসি, বুব্‌লা কেউ আসতে পারবে না।"

টুটুল বাড়ি ফিরল থলির মতো বড়-বড় কাগজের ঠোঙা ভর্তি বাজার করে। বোতল, প্যাকেট, কাঁচা আনাজ, মাছ, সব সাজাতে-সাজাতে ফেটে পড়ল রাগে। বলল— "বুব্‌লাটার আর বজ্জাতি গেল না জীবনে। নয়তো কি না ঠিক এই সময়ে কারও হাম হয়?"

আমাকে বলল, "এই যে ভদ্রমহিলা! আমার জন্য কী কী এনেছো, সব বাক্স খুলে বার করো।" রকম-বেরকমের ফরমাইস মাফিক জিনিস এসেছে টুটুলের জন্য। কাকুকে সব লম্বা লম্বা ফর্দ পাঠিয়েছে ও। তামাম দুনিয়া খুঁজে-খুঁজে কাকু এসব কিনে এনেছেন। বেশির ভাগই বই তাতে। বাঙালিদের সামাজিক ইতিহাস, কিংবা ওলন্দাজ বণিক আর ইংরেজ বণিকের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মশলা খোঁজার অভিযানের ইতিহাস। এ ছাড়াও ছিল খবরের কাগজের কাটিং, কিংবা উড়িষ্যার হস্তশিল্প, গুজরাটের রূপকথা। টুটুলের অত পেয়েও শান্তি নেই— শুধু বলতে থাকলো—"ইস্, এটা আনো নি, ওটা পাও নি!" কাকুর ওপর রাগ করতে লাগলো। বলল, "আসলে ছোটমাসিটা যদি একটু কম অফিসবাবু হতেন, তো এসব ছোটমাসিও জোগাড় করে দিতে পারতেন। কাকু তো বলে এমনিতেই আমাকে পাত্তা দেন না। কাকু যে এতটুকু করেছেন, তাতেই আমি ধন্য।"

আমি বললাম— "ত্রিভুবনের এত জঞ্জাল আনতে গিয়ে যে আমার

নিজের জামাকাপড় আনা হয় নি, তার কী হবে? আমি এই একমাস কী পরবো?”

টুট্ল পাত্তাও দিল না। বলল, “বুব্লা এলে ওর জামাকাপড় তোমাকে ফিট করতো। তবে জামাকাপড় এদেশে বিশেষ কেউ পরে না। তুমিও ইচ্ছে করলে যতদূরসম্ভব স্বল্পবাসে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতে পারবে। কেউ ফিরেও দেখবে না তুমি জামাকাপড় পরেছো, না শিশু অবস্থায় ফিরে গেছো।”

কথাটা যে অতিরঞ্জিত না, তার নমুনা আমি পরের দিনই পেলাম। একটা হাফপ্যান্ট, যেটা এত ছোট যে সেটাকে হাফপ্যাণ্ট বললে মর্যাদা দেওয়া হয়; আর একটা হাতকাটা গেঞ্জি-জাতীয় ব্লাউজ পরে টুটুল দেখলাম বাগানে একটা ঘাস ছাঁটার যন্ত্র নিয়ে চক্কর মেরে বেড়াচ্ছে। আমি বললাম— “তোমার ঐ কালো রঙে কি সূর্যতাপ লাগিয়ে আরও খোলতাই করতে চাও।” টুটুল বলল— “না, তোমার যাতে লজ্জা না করে আর, আমি সেই লজ্জা ভাঙবার ব্যবস্থা করছি। শত হোক, তুমি আমার অতিথি।”

দিদার আজ জন্মদিন। আজ শনিবার বলে সবাইকার ছুটি। অসম্ভব উৎসাহে এরা কাজকর্ম করছে। বড়মাসি টুটুলকে একটানা গালমন্দ করে যাচ্ছেন— বাজার থেকে এটা আন্তে ভুল হয়েছে, ওটা বাসি, মোটেও টাটকা নয়। ওটা ঠিক মনোমতো হয় নি— কত অভিযোগ।

বড়মেসো বারান্দায় বসে একগাদা চিংড়িমাছের খোসা ছাড়ালেন। তারপর একটা কাঁচি নিয়ে ঘর সাজাবার জন্য কাগজের ফুল কাটতে বসে গেলেন।

আমি দিদার ঘরে গিয়ে বসলাম। সারাজীবন দিদা অসম্ভব পরিশ্রম করেছেন। দাদু মারা গিয়েছিলেন খুব অল্প বয়সে। তিন মেয়ে নিয়ে যখন দিদা বিধবা হয়েছেন, তখন দিদার বয়স মোটে চব্বিশ। ছোট্ট স্কুলে চাকরি করেন। ট্যুইশান করে, সেলাই করে তিনটি মেয়েকেই যথাসাধ্য শিক্ষা দিয়েছেন দিদা। তবু কোনদিন এ-ব্যাপারে দিদার মুখে কোন খেদোক্তি শুনি নি। কিন্তু আজ বসে বসে দিদা কাঁদছিলেন। বড়মাসি বলেছিলেন, মা কিছু মনে রাখতে পারছে না আজকাল। আর

খালি খালি ঘুমিয়ে পড়ছেন। সারাদিনই প্রায় ঘুমোন। আমি কিন্তু দেখলাম দিদার স্মৃতিশক্তি বেশ প্রখরভাবে কাজ করছে। দিদা বললেন, "মেয়ে তিনটে যে আমার কী কষ্টের মধ্যে দিয়ে বড় হয়েছে, ভাষায় তা বলে বোঝানো যাবে না। স্কুল থেকে ফিরে এসে সবাই মিলে আমরা বসে কতদিন জামাকাপড় সেলাই করতাম। আমার কত সেলাই যে ওরা করে দিত। পুজোর আগে অনেক ব্লাউজ, পেটিকোট, ফ্রকের অর্ডার পেতাম আমি। পুজোর একমাস আগের থেকে কালীপুজো অবধি কোনদিন পড়তে সময় পেত না ওরা। সবাই মিলে শুধু সেলাই আর সেলাই করতাম। তাও বাছারা জীবনে কোনদিন ইস্কুলে দ্বিতীয় স্থান পায় নি। সর্বদা সব-কিছুতে প্রথম হয়েছে।"

বিকেল নাগাদ আমরা সব প্রস্তুত। ঘর সাজানো হয়েছে রঙ-বেরঙের বেলুন, ফুল আর ফিতে দিয়ে। বাড়ির সামনে কত রকমের গাড়ি যে এসেছে তা কী বলি! সবাইকার হাতে উপহার। কেউ-কেউ আবার সঙ্গে রান্না করেও এনেছেন।

জন্মদিনের জন্য বিরাট একটা কেক তৈরি করা হয়েছে। ঘরের বাতি নিভিয়ে কেকের ওপর পঁচাত্তরটা মোমবাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হ'ল। মনে হ'ল ঘরটার সৌন্দর্য শত গুণে বেড়ে উঠেছে। দিদাকে বলা হ'ল— "সব মোমবাতিগুলো ফুঁ দিয়ে নেভাতে হবে না। শুধু কয়েকটা নেভালেই বাকিটা টুটুল আর আমি নিভিয়ে দেব।"

দিদা মানলেন না। বললেন, "জন্মদিনে আমাদের বাতি নেভানোর নিয়ম নেই। ওতে অমঙ্গল হয়। আমরা জন্মদিনে প্রদীপ জ্বালাই।" দিদাকে বড়মাসি একটা বাটিতে করে পায়েস আর একটা লুচি এনে দিলেন। সারা সন্ধে ধরে মোমবাতিগুলো জ্বলতে লাগলো। কারও আর কেক খাওয়া হ'ল না।

সবাই মিলে আমরা হৈচৈ হুল্লোড় করতে থাকলাম। চিৎকার করে স্টিরিওতে যন্ত্রসংগীত বাজছে। খাবার-দাবার হাসিঠাট্টা। গতবার কলকাতাতে গিয়ে বড়মাসিরা দুর্গাপুজার ভিডিও তুলে এনেছেন। সেই ভিডিও দেখানো হ'ল। ঢাকের বাজনা। ধূপের ধোঁয়া। হোমের আগুন, তারপর পাঁঠাবলি। পাঁঠা নিজের গলার ফুলের মালা নিজেই চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে।

দিদা চেয়ারে বসে ঢুলতে লাগলেন। সারাদিনের উত্তেজনা। তাছাড়া হাসপাতাল থেকে ফেরার ক্লান্তি। দিদাকে কেউ বিরক্ত করলো না। একটু পরেই দেখলাম, দিদা কোচের ওপর হেলান দিয়ে শুয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছেন। দিদার জন্মদিনে আমাদের আনন্দ-উৎসব চলতে থাকলেও ব্যহত হ'ল না।

বহুরাত্রে মা-র একটা ফোন এল। "হ্যালো, হ্যালো"। গলার আওয়াজটা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে থাকলো। শুনতে পেলাম মা চীৎকার করে দিদাকে ডাকছেন— "মা? মা কথা বলছো? মা?" তারপর কট্ করে একটা শব্দ। টেলিফোনটা কেটে গেল। আমি, বড়মাসি, টুটুল বহু চেষ্টা করলাম। আবার কলকাতাতে টেলিফোন বুক করলাম আমরা। অপারেটার বলল— "কলকাতার আমাদের লাইন খারাপ হয়ে গিয়েছে।"

সবাই যখন চলে গেল, তখন চারপাশে স্তূপাকৃতি এঁটো প্লেট, কাপ, গেলাস। কাঁটা-চামচে, ঠোঁটের লাল রঙের মলিন ছোপ। উপহারের মোড়ক বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে সারা-ঘর। দামি দামি ফিতে কুঁকড়িয়ে মুচড়িয়ে ছড়িয়ে আছে এদিকে-ওদিকে, এমনকি বারান্দার রেলিং-এ। সবগুলো গাড়ি চলে গিয়েছে। কুয়াশা নেমেছে এতক্ষণে। রাস্তার বাতিগুলো কুয়াশার ভেতর দিয়ে মোমবাতির মতো গলে-গলে ঝরতে লাগলো।

আমার হঠাৎ কান্না পেতে থাকলো। মনে হ'ল দিদা আর বেশি দিন বাঁচবেন না। মনে হ'ল, মা হয়তো দিদাকে শেষ দেখা করতে পারবেন না। হঠাৎ মনে হ'ল ঠামার জন্য আমার প্রাণটা হুহু করছে। ঠামা কোথায়? কতদূর? আমি ঠামার কোলের কাছটাতে ভাইটির পাশে শুতে চাই।

ছয়

এদের যখন রাত, আমাদের কলকাতায় তখন দিন। আমার কিছুতেই ঘুম আসতে চায় না। অথচ এরা যখন কর্মব্যস্ত-দিনের আলোতে দৌড়ে বেড়াচ্ছে, তখন আমার একটা ঘুম ঘুম ভাব। যেন দম দেওয়া একটা কলের পুতুল। ঘুমের্ ঘোরে হেঁটে-চলে বেড়াচ্ছি।

উত্তর আমেরিকায় দিন-রাতে এখনও আমার শরীর অভ্যস্ত হয় নি।

জেগে-জেগে রাত কেটে যায়। জানালার বাইরে থেকে চাঁদের আলো শোবার ঘরে পড়ার টেবিলে প্রতিফলিত হয়, আমাকে হাতছানি দেয়। আমি বসে বসে চিঠি লিখি। ভাইটি, ঠামাকে, কাকুকে—সবাইকেই চিঠি লিখি। বুব্‌লাকে একটা চিঠি দিলাম খুব ধমক দিয়ে। হাম হবার আর ও সময় পেলো না। মেজোমাসিকেও লিখে দিলাম যে ফেরার পথে লণ্ডনে আমি আরও আগে যেতাম। কিন্তু এখন তো তিন সপ্তাহ বুব্‌লার কাছে যাওয়া বারণ হামের জন্য।

মেজোমেসো না জানি কোথায় কোথায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। আমাকে বলেছেন— "দেখ, আমার সবগুলো চুল সাদা হয়ে গেল। কিন্তু শরীরে যেন দিন দিন শক্তি আর উৎসাহ বেড়ে যাচ্ছে। কী যে করি ভেবে পাই না।"

কত কথা মেজোমেসো আমাকে বলেন। বলেন— "আসলে আমি লোকটাও খুব প্রগতিশীল লোক নই। মনে-মনে কত মধ্যযুগীয় ধারণা এখনও পুষে রেখেছি। কিন্তু মানুষ তো সর্বদা যুক্তি বিচারে চলে না। ফাঁক পেলে উটকো-উটকো চাওয়া-পাওয়া মাথা তুলে আমার যুক্তি জীবনে অশান্তির ঝড় বইয়ে দেয়।"

মেজোমেসো আরও বলেন— "আজকালকার কালটা হচ্ছে যৌথ-প্রচেষ্টার কাল। কোন বৈজ্ঞানিকেরই আর এখন একা একা পৃথক চৌহদ্দিতে কাজ করলে আজকালকার কাজের সমাধা হবে না। আজ-কালকার প্রত্যেকটা বৈজ্ঞানিক কাজই সংঘবদ্ধ হয়ে করবার কাজ। একা একা জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে কাজ করার দিনের ইতি হয়েছে বহুকাল আগে। এখন আমাদের কাজ করতে গেলে শুধু নিজেদের বিষয়ের বহু-বহু লোকের সাহায্যই লাগে না, লাগে ভূতাত্ত্বিক, শারীরতাত্ত্বিক, সমুদ্র-তাত্ত্বিক, উদ্ভিদবিজ্ঞানী ইত্যাদির। কত বিষয়ের সবাইকার সামগ্রিক প্রয়াস। অথচ আমার ঐ ছোটবেলার সৃষ্টিছাড়া সেই চাওয়াটা, প্রকৃতির সঙ্গে একা মোকাবিলা করার চাওয়াটা আমার মনে এখনও অশান্তির ঝড় তোলে। এই চাওয়াটা এখন একটা ভুল জিনিস চাওয়া, এ-কথাটা আমার যুক্তিযুক্ত মগজ জানে। কিন্তু আমার নিচের তলার পুরোনো মগজ, সেই সরীসৃপের অন্ধ মগজ কিংবা সেই মাঝতলার স্তন্য-পায়ীর ক্ষুব্ধ মগজ, আমার ওপরতলার নতুন মানব-মগজকে পরাজিত

করে চলেছে বার বার। আমি আমার নিজের ছোটবেলার চাওয়ার শিকার নিজে হয়ে যাচ্ছি। আমার মনটা সারাদিন তোলপাড় করে। ছোটবেলার অভিযানপ্রিয় মন আমার বৃদ্ধ বয়সকে উন্মত্ত করে তুলছে।"

কথা প্রসঙ্গে মেজোমেসো আমাকে নিওটেনির[৩৫] কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন ছোটবেলায় কিংবা গর্ভাবস্থার গুণাগুণ যদি বৃদ্ধ বয়স অবধি থেকে যায়, তো সেটাকে বলা হয় নিওটেনি। বলেছিলেন, জন্তু-জানোয়ারদের মধ্যে নিওটেনি বলে একটা ব্যাপার ঘটে। বলেছিলেন—একটা উদাহরণ যদি দেই তো তুমি বুঝতে পারবে। একটা মানুষ, তার গায়ে লোম হয় না। অথচ একটা বনমানুষ তার গা-ভরতি লোম। তাহলে প্রশ্ন হ'ল যে, এই নগ্ন-গা হওয়ার লক্ষণটা মানুষটা পেল কোত্থেকে ? বনমানুষের থেকে বিবর্তন যদি তার হয়ে থাকে তো তার গায়ে লোম নেই কেন ?

এর উত্তর অদ্ভুত। মেজোমেসো বলেছিলেন— বনমানুষের বাচ্চা যখন গর্ভাবস্থায় থাকে, তখন তাদের গায়ে লোম হয় না। এই গর্ভা-বস্থার একটা লক্ষণ মানুষ তার জীবনে বৃদ্ধকাল অবধি বজায় রাখতে পেরেছে। বৃদ্ধকাল অবধি মানুষের গায়ে লোম থাকে না। তার কারণ গর্ভে থাকাকালীন বনমানুষের একটা গুণ যে আঁকড়ে ধরে বসে আছে। আর এটাকেই বলে নিওটেনি।

একটা জীব বিবর্তন হবার সময় অনেক সময় সে পুরোনো আগেকার কালের কোনও একটা লক্ষণ নিয়ে জীবন শুরু করে। যেমন ধরো, আমার গোল বলের মতো খুলি। বাঁদর কিংবা বনমানুষের ভ্রূণ অবস্থাতে আমাদের মতনই খুলি হয়। কিন্তু শরীরের তুলনায় ওদের মগজটা বাড়ে ধীরে-ধীরে। আমাদের বাড়ে দ্রুতগতিতে। উল্লেখ্য, জন্মের সময় পাতি বাঁদরের মগজ পূর্ণবয়সের তুলনায় ৬৫ শতক আয়তনের হয়। শিম্পাঞ্জীর হয় ৪০.৩ শতক। মানুষের সাধারণত হয় ২৩ শতক। তেমনই আবার মানুষের মুখটা শিশুসুলভ। বনমানুষের বাচ্চা অবস্থায় মুখটা মানুষের মতো ছোট আর চ্যাপ্‌টা হয়। কিন্তু বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে বনমানুষের চোয়ালটা বড় হয়ে যায়। বড় চোয়ালে বড় দাঁত। অবশ্য দাঁতের প্রসঙ্গে, মানুষের মোটে ৩২টা দাঁত। উঁচু জাতের স্তন্যপায়ীদের সাধারণত ৪৪টা দাঁত। মানুষের দাঁতের শুধু সংখ্যাই কম না, তা আবার ছোট। মানুষ সাধারণত আমিষাশী কিংবা নিরামিষাশী।

নয়। সে দরকার পড়লে সর্বভূক। তার দাঁতগুলো সেই হিসেবে আদিম। তাছাড়া মানুষের ছোট চোয়ালে দাঁতের জায়গা কম। আক্কেল দাঁত উঠতে তার ভালো রকমের আক্কেল হয়। অনেকের আবার আক্কেল দাঁত সবগুলো ওঠেও না। বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের হয়তো ধীরে ধীরে ২৮টা দাঁত হয়ে যাবে।

তাছাড়াও ভ্রূণ অবস্থার বনমানুষের কতকগুলো লক্ষণ মানুষের মধ্যে দীর্ঘকাল বজায় থাকে। যেমন— মানুষের ভুরুর ওপরের হাড় নিচু হয়, রঙ ফ্যাকাসে থাকে। কিংবা মানুষের গায়ের লোম বনমানুষের ভ্রূণ অবস্থার লোমের মতো কম। মানুষের পায়ের বুড়ো আঙুল অন্যান্য আঙুলের মুখোমুখি না। এটাও বনমানুষের ভ্রূণ অবস্থার লক্ষণ।

মেজোমেসো বললেন— "আর সবচাইতে বড় কথা হচ্ছে যে মানুষের দীর্ঘমেয়াদী শৈশব ; মানুষের শিশুরা শিশু থাকে সব প্রাণীদের মধ্যে সব-চাইতে বেশী সময়।"

আমি বললাম, "তার আগে তুমি আমাকে একটা প্রশ্নের জবাব দাও। গর্ভসুলভ কিংবা শিশুসুলভ লক্ষণের কথা তুমি বলছো, কিন্তু নিজের জীবনের কথা যখন বলছিলে তখন গর্ভসুলভ কিংবা শিশুসুলভ না বলে তুমি বলছিলে মধ্যযুগীয় আচরণের কথা। তাহলে তুমি ভুল বলেছিলে। তাই না?"

মেজোমেসো বললেন— "না, ভুল বলেছিলাম না। শিশুসুলভ ব্যাপারটা প্রাণীজগতে উন্নতি আনে। বিবর্তন হতে-হতে যদি একটা কানাগলিতে এসে পৌঁছয়, যেখান থেকে বেরোবার আর পথ নেই, তখন কোন একটা শিশুসুলভ কিংবা গর্ভসুলভ আচরণ দিয়ে একটা প্রাণী নতুন করে জীবন শুরু করে। এটা নিওটেনি। এটার সুফল আছে। আর মধ্যযুগীয় লক্ষণ প্রাণীজগতে ক্ষতিকারক।

"ভারতবর্ষের মধ্যযুগে মানুষের মানসিক পতন হয়েছিল, ইউরোপের ইতিহাসও তাই। তাই আমি বলি যে আমারও একা থাকতে চাওয়াটা একটা পতন। আমার চাওয়াটা আমার নিজের জীবনে কিংবা জনজীবনে উন্নতি আনে না। ক্ষতি করে। ইংরেজিতে 'জিনিয়াস' অর্থাৎ প্রতিভা কাকে বলে জানো? প্রতিভা থাকার একটা বড় লক্ষণ হ'ল যে তার অবাক হতে পারার ক্ষমতা থাকে। মানুষ অবাক হয় কোন্ বয়সে? না, ছোটবেলায়। মানুষ সব ব্যাপারে অবাক হতে পারার

ক্ষমতা রাখে। যত সে বড় হতে থাকে, যত বেশি সে চারপাশের পৃথিবী দেখে অভ্যস্ত হয়ে যেতে থাকে, তত বেশি তার অবাক হতে পারার ক্ষমতা কমে যায়। অবাক হতে পারার ক্ষমতা একটা যে-সে ক্ষমতা নয়। পূর্ণবয়সে বেশি ভাগ লোকেরই এ-ক্ষমতা অনেক কমে যায়। শুধু যে-দু'চার জনের থাকে, তাদের সবাইকার মধ্যে আবার দু'চার জন 'জিনিয়াস' হতে পারে। আপেল ফল তো গাছ থেকে রোজই পড়ে। আমাদের লণ্ডনের বাড়ির পিছনের বাগানের গাছের নিচে পড়ে-পড়ে পচে থাকে কত আপেল। আমি দেখে কখনও অবাক হই না। অথচ বিজ্ঞানে পড়েছো যে নিউটন সেটা দেখে অবাক হয়েছিলেন। নিজের মনে নিজে প্রশ্ন করেছিলেন আপেল ফল গাছ থেকে কেন নিচে পড়ে। তার যথাযথ উত্তর খুঁজতে গিয়ে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার হ'ল। নিউটন 'জিনিয়াস' হলেন। তুমিও, স্বর্ণ, সব ব্যাপারে খুব অবাক হবার ক্ষমতা রাখো, এই ক্ষমতাটা যদি টিকে যায়, আর তুমি যদি প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবার জন্য কষ্ট স্বীকার করতে রাজী থাকো, তবে হয়তো দেখবো আমাদের স্বর্ণও একদিন 'জিনিয়াস' হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এমনি পোড়া দেশ আমাদের যে, আমাদের ইস্কুল-কলেজের শিক্ষা আমাদের মাথায় একগাদা পুঁথির পড়া উত্তর ঢুকিয়ে দেয়। প্রশ্ন করতে আমরা ভুলে যাই। প্রশ্ন করার সাহস আমাদের ইস্কুল কলেজ কেড়ে নেয়। আমি, স্বর্ণ, মধ্যযুগে আছি। আমাদের দেশের যদি কোন ভাগ্যলক্ষ্মী থাকেন তো আমি তাঁর কাছে জোড়-হাতে প্রার্থনা করি যে, আমার স্বর্ণ যেন শিশুসুলভ থাকে।"

সাত

কথার মোড় ঘুরে যাচ্ছিল। আমি বললাম, "আর, মগজ-বিস্ফোরণ?"

মেজোমেসো সম্বিৎ পেয়ে বললেন— "হ্যাঁ, মগজ-বিস্ফোরণ। হ্যাঁ, ওটাও শিশুসুলভ। নিওটেনি। পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরের সঙ্গে মগজের অনুপাত, আর গর্ভাবস্থার বনমানুষের শরীরের সঙ্গে মগজের অনুপাত প্রায় সমান। সাত-তাড়াতাড়ি জন্মানোর সময়ই মানুষ বিরাট একটা মগজ নিয়ে জন্মাতে পারে না। ধীরে-ধীরে তার মগজটা বাড়তে থাকে। যেন সে এখনও জন্মে যায় নি। যেন সে এখনও গর্ভের ভেতরেই

আছে। সে তার শিশু-বয়সটাকে অনেক দিন ধরে জিইয়ে রাখতে চেষ্টা করছে। তাই সে মানুষ।

"মানুষের মতো এত লম্বা শৈশব কোন প্রাণীর নেই। হরিণ, ছাগল, গোরু জন্মেই লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। অথচ মানুষ জন্মে-ইস্তক কত অসম্ভব অসহায়। খাইয়ে দিতে হয়, পাশ ফিরিয়ে দিতে হয়। কোলে করে নিয়ে বেড়াতে হয়। শৈশবটাকে অনেক দিন ধরে টেনে চলা, এটাও একটা 'নিওটেনি' — এটাই মানুষের সবচাইতে বড় নিওটেনি। কেন এটা এত দরকারী সেকথা তোমাকে পরে বলবো। তার আগে বলি লুসির কথা।"

মেজোমেসো বললেন— "লুসির কথা আমি আগেও বলেছি। লুসির মাথাটা বেশ ছোট ছিল। আমাদের মগজ-বিস্ফোরণ লুসির আমলেও হয় নি। তবুও লুসি পরিষ্কার সোজা দাঁড়াতে পারতো।"

মেজোমেসো বলে চললেন— "তোমার মেজোমাসির এক পরিচিত নাম-করা বৈজ্ঞানিক-বন্ধু আছেন। তিনি মেজোমাসির খুব চেনা-জানা। মেজোমাসির ধারণা তার মতো যথাযথ কথা কম বৈজ্ঞানিকই বলেন। ভদ্রলোকের নাম গোউল্ড (Stephen Jay Gould)। তিনি বলেন,[৩৬] মানুষের যে মগজ-বিস্ফোরণ হয়েছে সেটা এমন-কিছু একটা অভিনব ব্যাপার না প্রাণীজগতে। প্রাণীজগতে নিওটেনি হরবকত হচ্ছে। সেটা আর এমনকি বিরাট ঘটনা। কিন্তু গোউল্ড বলেন— এই যে লুসি সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই ব্যাপারটা— এটা বিরাট বৈপ্লবিক ঘটনা। নিওটেনি হতে প্রয়োজন শুধু শৈশবাবস্থাটাকে টিকিয়ে রাখা। একটা ব্যবস্থা যেটা চালু আছে, সেটাকে টিকিয়ে রাখা এমন-কিছু কঠিন কাজ না। কিন্তু সোজা হয়ে দাঁড়ানোর ব্যাপারটা নিওটেনির মতো অত সহজ ব্যাপার না। সোজা হয়ে দাঁড়াতে গেলে অনেক ঝুট-ঝামেলার সৃষ্টি হয়। সমস্ত নিম্নাঙ্গে হাড়গোড়গুলো নতুন করে ঢেলে সাজাতে হয়। এখানে প্রয়োজন, হাড়গোড়গুলো সরবে, মুড়বে, এগিয়ে যাবে, ভেঙে যাবে, অন্য কোন কাজে কিছু হাড়ের নতুন সংযোজন হবে আগের কাজ থেকে— হাড় মোটা হবে সরু হবে, অনেক-কিছু। এক কথায়, এটা একটা বৈপ্লবিক ব্যাপার।" মেজোমেসো বললেন— "তুমি অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছো মানুষ কেন মানুষ হয়েছে। আমি তার উত্তরে এতটুকুই বলতে পারি যে হয়তো মানুষ যে মানুষ হয়েছে তার

মূল কারণ যে মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সবাই হয়তো একথা মানবেন না, তবুও এটাই আমার ধারণা।

"গোউল্ড বলেন যে, নিজেই ভেবে দেখ না—শিশু মানুষের পা ছুটো ছোটবেলায় কমজোরি হয়। সুতরাং শিশুসুলভ লক্ষণ পূর্ণবয়স অবধি রেখে দিলে কি দৌড়বার মতো পা আমরা কখনো পেতাম? এটা নিওটেনি না। এটা এক নতুন ঘটনা।

"গোউল্ডের মতে আজ থেকে ৫০ লক্ষ বৎসর কিংবা বড়জোর ৬০ লক্ষ বৎসর আগে মানুষ প্রথম সোজা পায়ে দাঁড়িয়েছিল। আর সেদিন থেকেই মানুষবৎ থেকে মানুষ হবার প্রথম পদক্ষেপ আমরা ফেলেছি। সেই পদক্ষেপের ছবি মেরি লিকি আফ্রিকার আরেক প্রান্ত থেকে তুলে আমাকে বিলেতে পাঠিয়েছিলেন। লুসি থেকেই, কিংবা হয়তো তার আগের থেকেই, যার প্রমাণ এখনও আমাদের কাছে নেই,[৩৭] আমাদের সেই প্রথম পদক্ষেপ ভালোভাবে নেওয়া শুরু হয়েছে।

"গোউল্ড তোর মেজোমাসিকে একটা মজার গল্প বলেছিলেন। গল্পটা আধুনিক মানুষকে কেন্দ্র করে, যারা আজ থেকে প্রায় পঁচিশ-তিরিশ হাজার বৎসর আগে উদ্ভব হয়েছিল। সে-সব মানুষের খুলি ফ্রান্সে কিংবা আরও এদিক-সেদিক, অনেক জায়গায় পাওয়া গিয়েছে। ঐসব মানুষের নাম দেওয়া হয়েছে ক্রোমেনিয়ন[৩৮]। আমরা মোটামুটি ক্রোমেনিয়নেরই উত্তরপুরুষ। ঠিক তার আগের যে মানুষ ছিল, যাদের নাম নিয়ানডার-থ্যালম্যান,[৩৯] তাদের মগজ আমাদের থেকে অল্প বড় ছিল কিন্তু তবুও তারা অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। ধরো, তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার বৎসর আগে নিয়ানডারথ্যালরা ছিল। তাদের খুলি ফ্রান্স, জার্মানী এবং আরও অনেক দেশে পাওয়া গিয়েছে। অথচ সেই তুলনায় ইংলণ্ডে পুরোনো মানুষের একটাও খুলি পাওয়া যায় নি। অথচ ইংলণ্ড এত একটা নামীদামী দেশ। কিন্তু মানুষের প্রাগৈতিহাসিক কোন ঘটনাই তার মাটিতে ঘটে নি। এটা ইংলণ্ডের পক্ষে কম বেইজ্জতির ব্যাপার ছিল না। কিন্তু পুরোনো মানুষের ফসিল না পাওয়া গেলে আর উপায় কি! মেনে নেওয়াটাই উচিত।

এমন সময় ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ডসন[৪০] বলে এক সাহেব পিল্টডাউন[৪১] নামের এক জায়গায় মাটি খুঁড়তে গিয়ে একটি খুলির কতকগুলি টুকরো পেলেন। হাড়গুলোতে পুরোনো রঙ ধরেছে। দাঁতগুলো ক্ষয়ে-ক্ষয়ে

গিয়েছে। খুলিটাতে যত বড় মগজের জায়গা, খুলিটার চোয়ালটাও ঠিক ততটাই বড়। তখনকার কালে যতটুকু জানা তথ্য ছিল তাতে তখন সব বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ছিল যে মানুষের মধ্যে আগে মগজ-বিস্ফোরণ হয়েছে। তারপর মানুষ দাঁড়িয়েছে। সত্যি কথা, লুসির ফসিল না পেলে আমরাও হয়তো এখনও সেই কথাই ভাবতাম। যা-ই হোক, তখনকার কালে ধারণা ছিল যে প্রায় বনমানুষের অবস্থায় যখন মানুষ, তখনই আমাদের মগজ-বিস্ফোরণ হয়েছে। এবং সেই কারণে মগজ-বিস্ফোরণের পর ধীরে-ধীরে মানুষের মধ্যে মনুষ্য-জাতীয় অন্যান্য লক্ষণ দেখা দিয়েছে। সুতরাং, তখনকার কালে ভাবা হ'ত যে, সেই যুগসন্ধির মানুষবৎ-এর বড় মগজ অর্থাৎ বড় খুলিও থাকবে। আর সেই সঙ্গে বনমানুষের মতো বিরাট একটা চোয়ালও থাকবে। ভালো করে খুঁজলে এই ধরনের একটা ফসিল পাওয়া যাবে— এটাই বৈজ্ঞানিকরা আশা করতেন।

"যখন এই ইংলণ্ডে পিল্টডাউন ফসিল আবিষ্কার হ'ল, তখন এর অত বড় চোয়াল দেখে সবাই সেই যুগসন্ধির মানুষের খুলি ভেবে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ধন্য ধন্য পড়ে গেল ইংলণ্ডে। সবাই বলল, ইংলণ্ডও কিছু কমতি যায় না মানুষের প্রাগৈতিহাসিক বিবর্তনের রণক্ষেত্র হিসাবে। হুড়হুড় করে কত যে বই লেখা হয়ে গেল পিল্টডাউনের এই খুলির ওপর তার ইয়ত্তা নেই। তারপর ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দ। তখন হঠাৎ করে বোঝা যেতে লাগলো যে পিল্টডাউনের খুলির ব্যাপারটার সমস্তটাই ছিল জুয়াচুরি।

"তখন কিছুকাল আগে সবে বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। মানসিকভাবে ইংলণ্ড তখন খুব হতাশাতে ভুগছে। এই সময় এই জুয়াচুরি প্রকাশে বিজ্ঞানমহলেও সেই হতাশার প্রকাশ দেখা গেল। ক্রমশ প্রকাশ পেল যে পিল্টডাউনের খুলিটা আসলে একটা আধুনিক মানুষের খুলিকে অ্যাসিড দিয়ে পুরোনো কালের মতো রঙচটার চেহারা দেওয়া হয়েছে, আর ওর সঙ্গে পাওয়া-যাওয়া চোয়ালটা একটা ওরাংওটাং-এর চোয়ালকে অ্যাসিড দিয়ে পুরোনো কালের রঙ করা। দাঁতগুলোও সেই রকম ওরাংওটাং-এর দাঁত। ঘষে ঘষে ঠিক মানুষের দাঁত যেমন ক্ষয়প্রাপ্ত মনে হয়, সেরকমভাবে ক্ষয়ে-যাওয়া করা হয়েছে। সবটুকুই ধাপ্পাবাজি। পুরো ব্যাপারটা জুয়াচুরি।

"গত ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে গোউল্ডের সঙ্গে তোর বড়মাসির কথা হয়েছে। গোউল্ডের ধারণা, হয়তো একজন নাম-করা ফরাসী বৈজ্ঞানিক এই ধাপ্পা-

বাজিটা করেছেন। এই বৈজ্ঞানিকটি সেই সময় ইংলণ্ডে ছিলেন। বয়স ছিল খুব কম। তখন উনি একটি ছাত্র ছিলেন মাত্র। ইংরেজদের নিয়ে হয়তো ফরাসী ছাত্রটি রগড় করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা-বড় তা-বড় ইংরেজ বৈজ্ঞানিকরা যে দেশপ্রেমে আত্মহারা হয়ে পিণ্টডাউনের ধাপ্পা-বাজিতে বিশ্বাস করতে শুরু করবেন বেচারা ছেলেমানুষ ছাত্র জানবে কী করে? পুরো ব্যাপারটা যখন অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে, সে-বেচারা ভয়ে তখন ইংলণ্ড ছেড়ে পালিয়ে বাঁচলো ফ্রান্সে গিয়ে। ভয়ের চোটে কাউকে সত্যিকথাটি বলে গেল না। কালে সে-ফরাসী ছাত্রটি বিরাট বৈজ্ঞানিক হয়েছিলেন। কিন্তু তখনও পুরো ব্যাপারটা চেপে রেখে-ছিলেন।"

আমি বললাম, "কে সে বৈজ্ঞানিক?" মেজোমেসো বললেন— "যাক! ছোটবেলায় ঠাট্টা-তামাসার ফলে এত বড় একটা লজ্জাকর ব্যাপার যে ইংরেজ বৈজ্ঞানিকরা করবেন তা উনি নিশ্চয়ই নিজেও ভাবেন নি। যাক গে, সে-কথা। বৈজ্ঞানিকের নামটা আর বলে কি লাভ। নামী লোকদের নিন্দে করতে নেই।"[৪২]

এমনভাবে মেজোমেসো কথাটা আমাকে বললেন যেন ঐ নামী-দামী ফরাসী বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে আমার গলায়-গলায় ভাব। যেন এক্ষুনি আমি চুক্‌লি কেটে আসবো। আমিও যেন মেজোমাসি আর মেজো-মেসোর মতো বিরাট-বিরাট বৈজ্ঞানিকদের বন্ধুস্থানীয়। আমিও যেন একজন বিদগ্ধ মহিলা।

আট

আমি বললাম— "তুমি আবার লুসির গল্প করো।"

মেজোমেসো বললেন, "লুসিই মনে হচ্ছে মানুষের পূর্বপুরুষ। কিন্তু কথা হচ্ছে, লুসি হাঁটতে শিখলো কেমন করে? কেন সে হঠাৎ দ্বিপদ-জীব হ'ল?"

আমিও স্বাভাবিক কৌতূহল প্রকাশ করলাম— "কেন দ্বিপদ-জীব হ'ল তুমি জানো না?"

মেজোমেসো বললেন, "সে-ব্যাপারে ছোটখাটো মতবাদ আছে অনেক, আমার মনে হয় একটা মতবাদই হয়তো খানিকটা ঠিক।

আমার ধারণা যে, মানুষকে বহু দূর দূর জায়গায় খাদ্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে হ'ত। বাড়িতে বয়ে আনতে হ'ত অনেক দূর দূরান্ত থেকে খাবারদাবার। শিকার-করা খাবার, কুড়িয়ে-পাওয়া খাবার, চুরি-করে-আনা খাবার। তখনকার দিনে তো আর থলি ছিল না, যে থলি পুরে খাবার নিয়ে আসবে! খাবার নিয়ে আসতে হ'ত হাতে করে। আর সেইজন্যই হাত দুটো মুক্ত হবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। নয়তো হাতে করে খাবার নিয়ে ফিরবে কী করে? চলাফেরা থেকে হাত দুটো তাই ক্রমশ মুক্ত হয়ে গেল। তা না হলে তাকে না খেতে পেয়ে মরে যেতে হ'ত। কারণ, সর্বদা মনে রাখতে হবে যে পুরুষ মানুষ সাধারণত শিকারে যেত। সঙ্গে দু'একটা বুড়িও হয়তো যেত। পেছনে রেখে যেত বাচ্চাকাচ্চাদের, আর তাদের মায়েদের। মেজোমোসো বললেন, "তখনকার কালের জীবনযাত্রার কথাটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। কিন্তু সেটা বলার আগে বলতে হবে যে তখনকার কালের জীবনযাত্রাটা যে কী ছিল আমরা তা সঠিক জানি না। তবে আমরা তা খানিকটা অনুমান করে নিতে পারি। আজকালকার কালে যারা খুব পুরোনো ধরনের জীবনযাত্রাতে পিছিয়ে পড়ে আছে তাদের এক জাতের নমুনা দিলে খানিকটা অনুমান করা যাবে তখনকার কালে মানুষ কেমন করে বাঁচতো। ধরো, আফ্রিকার দক্ষিণে কালাহারি মরুভূমির কাছে থাকা একদল মানুষ —নাম তাদের কুং[৪৩]। এরা অসম্ভব সুবোধ জাত। অন্যান্য অনেক জাত হয়তো এদের তুলনায় কিছুটা ভয়ঙ্কর। তবুও নমুনা হিসাবে কুংদের কথাই ধরা যাক। এসব দেশে জলের অভাব। এরা তাই ভবঘুরে। যেখানে যেখানে জল পাওয়া যায়, যতদিন ধরে জল পাওয়া যায়, তার ওপর এদের ভবঘুরে-জীবনযাপন নির্ভর করে। একরকমের বাদাম[৪৪] গাছ জন্মায় এসব দেশে। এদের মেয়েরা সাধারণত সেই বাদাম কুড়িয়ে নিয়ে আসে চামড়ার ব্যাগ ভর্তি করে। এদের ছেলেমেয়ে ঘনঘন জন্মায় না। সাধারণত বছরচারেক অন্তর-অন্তর একটা করে এদের বাচ্চা হয়। একটা মেয়েদের সারা-জীবনে গোটা চারেক হয়তো বাচ্চা জন্মায়। সাধারণত তার আবার অর্ধেক অকালে মৃত্যুবরণ করে। অর্থাৎ কিনা দম্পতি পিছু দুটো বাচ্চা। এদের চারপাশের পৃথিবী যতটুকু খাদ্য জোগান দিতে পারে, সেটার সবটুকু এরা সুদে আসলে আদায় করে নেয় না। অনেকটা উদ্বৃত্ত রেখেদিয়ে এঁরা প্রকৃতিকে দোহন[৪৫] করে।

"এদের পুরুষরা শিকারে যায়। সেখান থেকে মাংস নিয়ে আসে। এদের খাদ্যের তিন ভাগের একভাগ মাংস। মাংস কবে পাবে, কবে পাবে না, তার ঠিক নেই। মাংসর জন্য যতটা পরিশ্রম করতে হয়, সেই তুলনায় তার নিশ্চয়তা কম[৪৬]। অনেক সময় শিকারী মারাও যেতে পারে। মেয়েরা যদি শিকারে যেত তার মানে যে এদের উত্তরপুরুষ যারা সৃষ্টি করবে তাদের মৃত্যু হওয়া। সাধারণত মেয়েরা শিকারে যায় না। বাচ্চারাও শিকারে যায় না। কারণ, শিকারীকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিঃশব্দে শিকারের পিছু চলতে হয়। বাচ্ছাদের পক্ষে সেটা করা অসম্ভব। অথচ মাকে যে বাড়ি রেখে যায় তার মানে এই না যে, মাকে বেশি হাঁটাচলা করতে হবে না। প্রথমত তাকে হাঁটাচলা করতে হয় শাক-সব্জি, বাদাম, কচু, পাখির ডিম জোগাড় করবার জন্য। ছোট-খাটো ইঁদুর, খরগোশ, জন্তু-জানোয়ারের বাচ্চা ধরবার জন্য। তাছাড়াও এদের জীবন ভবঘুরে। হিসেব করে দেখা গিয়েছে যে কুং জাতীয় এক-একটি মেয়েকে বৎসরে কম করে তিনহাজার মাইল হাঁটতে হয়। নয়তো সে খাবারদাবার কুড়িয়ে বেড়াতে পারতো না। কারণ খাবারের তিন ভাগের দু'ভাগই সে নিজে সংগ্রহ করে। মাংস-শিকার একটা অনিশ্চিত ব্যাপার। মেয়েদের কুড়োনো, জোগাড় করে আনা খাবার জীবনবীমার মতো একটা সুনিশ্চিত ব্যাপার। তাছাড়া মেয়েরা হাঁটে যখন পুরুষদের সঙ্গে এক জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় শিকারের সন্ধানে চলে যেতে হয়। নয়তো একজায়গায় শিকার শেষ হয়ে যায়।"

মেজোমেসো আরও বলেছিলেন— অন্যান্য জীব-জানোয়ার এমনকি বেবুনদের থেকে মানুষের একটা বিরাট পার্থক্য আছে। কিছু জীব-জানোয়ার আছে যারা সামাজিক জীব। তারা একসঙ্গে বিচরণ করে। মানুষ কিন্তু সামাজিক জীব ছাড়াও সামাজিক আহারী। সাধারণত মেয়েদের জোগাড় করা আহার তারা বিতরণ করে না। শুধু স্বামী-পুত্রদের সঙ্গে ভাগ করে খায়। কিন্তু সর্বদাই দেখা গেয়েছে যে, শিকার করে আনা খাবার তারা বিতরণ করে খায়। এটা না থাকলেও, মানুষ খাবার ভাগ করে খায় স্ত্রী-পুত্রদের সঙ্গে। বনমানুষদের মতো এক জায়গায় চরে বেড়িয়ে যে যার নিজের খাবার কুড়িয়ে খায় না। মাংস খাবার, ব্যাপারে মানুষ কেন, বনমানুষদের মধ্যেও ভিক্ষে করার রেওয়াজ

আছে। সাধারণত মানুষ অন্যান্য জীব-জানোয়ারের শিকার করা অর্ধভুক্ত খাবার উঞ্ছবৃত্তি করে খায়। যেটা বনমানুষরা কখনও করে না। কিন্তু বনমানুষরা মাংস খাবার বেলাতে ভিক্ষে চায়। অনেক সময় দেখা গিয়েছে যে হয়তো একটি পাতি বনমানুষের কাছে ঘণ্টা দু'ঘণ্টা ধরে একটা দলপতি বনমানুষও একটু শিকারের অংশ ভিক্ষে করছে। ওরা ঠিক মানুষের মতো হাতের চেটো ওপর দিক করে ভিক্ষে চায়। তবুও হয়তো পাতি বনমানুষটা শিকারের একটু টুকরোও দলপতিকে দিল না। দলপতি ফিরে গেল এমনও দেখা যায়।

মানুষদের মতো ভাগ-বাঁটরা করে আহার[৪৭] অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে নেই। তাই অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে খাদ্য বয়ে আনবার প্রথা নেই। অবশ্য মৌমাছি পিঁপড়ে এদের কথা বলছি না। উন্নত স্তন্যপায়ীদের কথা বলছি। কিন্তু মানুষদের মধ্যে ছেলেরা মেয়েরা দুজনেই খাবার বাড়িতে বয়ে আনে। এ ব্যাপারে মানুষের সঙ্গে জংলী কুকুরের মিল আছে। জংলী কুকুর শিকার করে বাড়িতে এসে সেটা বমি করে বাচ্চাদের খাওয়ায়। শিকারী কুকুরের জীবনযাত্রা খুব কঠিন। অনেক সহজেই ওদের মৃত্যু হয়। তাই হয়তো তাদের মধ্যে উত্তরপুরুষদের জন্য এ-ব্যবস্থা বিবর্তনে হয়েছে বলে মনে হয়। সেই তুলনায় একটা সিংহ যদি শিকারে খুবই কম সাহায্য করে, অনেক সময় সাহায্য করেই না, শুধু সিংহীরা শিকার করে আনে, তবুও খাবার সময় সিংহটা খাবে আগে। কোনও বাচ্চাকে কাছে এগোতে দেবে না। বাচ্চারা খাবে পরে। তবে সিংহরা বাঁচে অনেক দিন। ওদের উত্তরপুরুষ না খেয়ে মরবার ভয় কম। মেজোমেসো বললেন—"কে জানে মানুষ কেন বাড়িতে খাবার এনে খায়! ওদের মধ্যেও কি উত্তরপুরুষ বাঁচিয়ে রাখা কঠিন ছিল? বাঘের মতো মানুষ মুখে করে খাদ্য বয়ে আনতে পারতো না। সুতরাং তার হাত মুক্ত হবার প্রয়োজন ছিল।"

কিন্তু এটা শুনবার সঙ্গে সঙ্গে আমার যেন কী হয়ে গেল। হয়তো মাথাটাই খারাপ হয়ে গেল। আমি হঠাৎ বলে ফেললাম—"কিন্তু লুসি তো মেয়ে। ও তো ছেলে নয় যে সে শিকারে যাবে। আর সেই শিকার-করা খাবার নিয়ে বাড়ি ফিরবে।" এতটুকু শুধু বলেই আমি চুপ করলাম না—একটানা বলে যেতে লাগলাম। যেন ভূতে পাওয়া একটা মানুষ আমি। আমি বলে যেতে লাগলাম—"দেখ, তোমরা পুরুষ

মানুষ। শুধু পুরুষ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পৃথিবী দেখ। তাই খালি বলছো দূর থেকে খাবার নিয়ে ফিরতো। মেয়েরা খুব দূরে বাচ্চাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে পারতো না। মেয়েদের সঙ্গের বাচ্চারা আর খুব বহুদূর হাঁটবে কি করে। ওদের ফেলে মেয়েরাও খুব বহুদূর হেঁটে চলে যেতে পারতো না। কিন্তু যদি একবার দৃষ্টিভঙ্গিটা একটু বদলাও তো তুমি দেখবে যে, এসব মানুষবৎদের হাত কী করে মুক্ত হ'ল তার একটা নারীকেন্দ্রিক জবাব আছে। আমার মতে আমাদের হাত মুক্ত হয়েছে, কারণ, আমাদের বাচ্চাদের কোলে করে ধরে রাখতে হয়। মানুষের বাচ্চারা জন্মে-ইস্তক হাঁটতে পারে না— বাচ্চাদের কোলে করে বইতে হয়। বাচ্চা-কোলে মায়েদের দূর দূরান্তে যেতে হয়।"

আমি বলে যেতে লাগলাম— "মেজোমেসো, বাচ্চারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায় কি করে? এটা একটা দরকারি প্রশ্ন। ধরো, একটা বাঁদরের বাচ্চা। বাঁদরের মা-র গা-ভর্তি লোম থাকে। মা-র পেটের কাছের লোম ধরে বাচ্চাটা সাধারণত মা-র পেটের কাছে ঝোলে। বাচ্চাটা একটু বড় হলে মা-র পিঠে সোওয়ার হয়ে সে ঘুরে বেড়ায়। মা যখন জোরে জোরে দৌড়য় তখন ও দু'হাতে মা-র পিঠের কাছের লোম আঁকড়ে ধরে বসে থাকে। পড়ে যায় না। বাঁদরের বাচ্চাদের মুঠি খুব শক্ত। এদিকে বেড়ালের বাচ্চাদের কথা ভাবো। তাদের মা তাদের ঘাড় কামড়ে এদিক-সেদিক করে বেড়ায়। মানুষের মা বেড়ালের মা-র মতো বাচ্চার ঘাড় কামড়িয়ে বয়ে নিয়ে বেড়াতে পারে না। বাচ্চাটার তক্ষুনি মৃত্যু হবে। অথচ মানুষের লোম নেই যে বাচ্চাটা নিজে মা-র লোম আঁকড়ে ধরে ঝুলে থাকবে। তবে তুমি বলবে যে, আমরা তো মানুষের কথা বলছি না। আমরা বলছি মানুষবৎ-এর কথা। হয়তো মনুষ্যবৎদের লোম ছিল। হয়তো বা ছিল না। হয়তো ছিল কিন্তু তা যৎসামান্য লোম। আসলে হাড়ের মতো তো আর চামড়া লক্ষ লক্ষ বৎসর পর খুঁজলে ফসিল অবস্থায় পাওয়া যায় না। সুতরাং লোম ছিল কি ছিল না, তা বুঝবো কি করে! কিন্তু আমার কাছে এ-প্রশ্নটা অবান্তর। কারণ, মানুষের সদ্যোজাত বাচ্চা অসম্ভব অসহায়। আমি ছোটবেলায় ভাইটিকে দেখেছি। আমি জানি যে জন্মের পর-পরই তার পক্ষে মা-র পেটের নিচে ঝুলে থাকবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। অন্যদিকে সেই বাচ্চার মা শিকারে না গেলেও বাচ্চা

নিয়ে চলাফেরা তাকে করতে হ'ত। তাকে জঙ্গলে যেতে হ'ত কচু, কন্দ খুঁড়ে আনার জন্য। তাকে মাঠে-ঘাটে যেতে হ'ত শাক-সব্জি তুলে আনার জন্য। পোকা-মাকড়, শামুক, গুগ্‌লি, পাখির ডিম কুড়িয়ে আনার জন্য। ছোটখাটো মাছ, খরগোশ, ইঁদুর, পাখি মেরে আনার জন্য। তা ছাড়া তাকে চলতে হ'ত, শিকারী-জীবনে সবাইকে এক জায়গা থেকে সব সময় অন্য জায়গায় চলতে থাকতে হয়। এক জায়গায় থাকলে সেখানকার শিকার ফুরিয়ে যায়। সুতরাং শিকারে সে না গেলেও ভবঘুরে জীবন তার নিশ্চয়ই ছিল। আর এসব চলমান সময়ে বাচ্চাকে মা বয়ে নিয়ে যাবে কী করে? প্রশ্ন হ'ল যে, কী করে ঐ অসহায় বাচ্চাটা যেটার ঘাড় সুদ্ধ সোজা নয়, হেলে-হেলে পড়ে যায়, সেটাকে নিয়ে মা হাঁটবে।"

মেজোমেসো কথাগুলি শুনছিলেন। উত্তর দিচ্ছিলেন না। কিন্তু আমি বলে যেতে থাকলাম— "আমার ধারণা বাচ্চা বইবার জন্য আমাদের হাত প্রথম মুক্ত হয়েছে। আমাদের বাচ্চারা যেদিন থেকে জন্মাবার সময়ে বনমানুষের তুলনায় অসহায় হয়ে গিয়েছে, সেদিন থেকে আমাদের হাত মুক্ত হবার প্রয়োজন পড়েছে। তুমি কি জানো যে মানুষের নবজাত বাচ্চাদের জন্মের পর কয়েকদিন অবধি মুঠোটা অসম্ভব শক্ত থাকে? তুমি এ-খবরটা জানো কিনা আমি জানি না। কিন্তু ইস্কুলে আমাদের এ-কথাটা শিখিয়েছে। দিদিমণি বলেছেন যে, বাচ্চাদের এই অসম্ভব জোরে মুঠো করার ক্ষমতাটা জন্মাবার পর বেশি সময় থাকে না। দিদিমণি একটা ছবি দেখিয়ে ছিলেন। সেখানে একটা নবজাত বাচ্চা হাত মুঠো করে একটা দড়ি ধরে ঝুলছিল। ঠিক দেখে মনে হবে যে বাচ্চাটা এক্ষুনি পড়ে যাবে। দেখলে কেমন ভয় ভয় করে। হয়তো আমাদের বাচ্চাদেরও বাঁদরদের বাচ্চাদের মতো আগে আগে পেটে ঝুলে থাকার ক্ষমতা ছিল। কিন্তু হয়তো আমাদের লোম চলে যাওয়ায় সেই ক্ষমতার প্রয়োজন শেষ হয়েছে। নইলে হয়তো মানুষের বাচ্চারা জন্মক্ষণে দিন দিন অসহায় হয়ে গিয়েছে। সেজন্য আঁকড়ে ধরার ক্ষমতা চলে গিয়েছে। সে যাহোক। কিন্তু আমার মনে হয় বাচ্চা বইবার জন্যই হয়তো আমাদের হাত মুক্ত হয়েছে।" আমি বলে যেতে থাকলাম— আমার মনে হয় মানুষের হাত যে মুক্ত হয়েছে সেটা নারীর অবদান। নারীরাই পৃথিবীতে প্রথম দ্বিপদ প্রাণী। নারীরাই পৃথিবীতে মানুষ

হবার মূল কারণ।”

এতটা কথা বলতে আমার লজ্জা-লজ্জা করছিল। এমনিতে ঠাট্টা তামাসা যা-ই করি না কেন, গম্ভীর কথা মেজোমেসোর মুখের ওপর আগে আমি কখনও বলি নি। কিন্তু মেজোমেসো শুনে একটা অসম্ভব খুশীতে ফেটে পড়লেন। বললেন -- “দিব্যি সুন্দর বোঝালে তো। এই যুক্তিটা তো আদৌ অন্যায্য বলে মনে হচ্ছে না। আমি বন্ধুদের চিঠি লিখে জানাচ্ছি : যে আমাদের লুসির উত্তরপুরুষ বলেছে, পুরুষকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আমরা বিবর্তনবাদ বুঝতে চেষ্টা করছি বলে ভ্রান্তি হচ্ছে। বলবো যে, লুসির উত্তরপুরুষ বলছে যে, বাচ্চা বইবার জন্য মানুষের হাত প্রথম মুক্ত হয়েছে। এবং কথাটা যেমন যুক্তি দিয়ে পরিবেষণ করা হয়েছে তাতে আমার মনে হয় না যে কথাটা অযৌক্তিক। এই মতবাদটার কিছুটা অন্তত মর্যাদা দেওয়া উচিত। পুরাকালে কী ঘটেছে এ-পক্ষ ও-পক্ষ, কোন্ পক্ষ ঠিক, সেটা মনে হয় সঠিকভাবে কোনদিনই জানা যাবে না। তবুও এই মতবাদটা নিয়ে ভাবা উচিত। দূর ছাই বলে জঞ্জাল স্তূপে ফেলে দেওয়া উচিত হবে না।”

নয়

মেজোমেসো অনেকদিন ধরে ধীরে ধীরে যা-কিছু বলেছিলেন, তা দিয়ে আমি মানুষের একটা জন্ম-ইতিহাস মনে-মনে খাড়া করে নিয়েছিলাম। মেজোমেসো এ-ব্যাপারে আমাকে উইভার-এর লেখা একটি প্রবন্ধ দিয়েছিলেন, সেটার থেকেও আমি একটা ক্রমণিকা পেয়েছিলাম। কিন্তু একটা কথা মেজোমেসো বার-বার করে বলে আমার মাথাতে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। সেটা হচ্ছে যে, মানুষবৎ আর পুরোনো মানুষ, এদের যে রকমারি স্তরভেদ, সেটা এখনও হয়তো শেষ কথা না। মাঝে-মাঝে রয়ে গিয়েছে অজানা সব গহ্বর। যতদিন-না আরও আরও ধরনের ফসিল আমরা খুঁজে না পাই, ততদিন কিছুই নিশ্চিত করে বলা যাবে না। হয়তো আগে যে দুটোকে বলা হয়েছে যে ভিন্ন ভিন্ন স্তর, তারা হয়তো পরে দেখা যাবে একই স্তরের প্রাণী। আবার হয়তো আগে যাকে ভাবা হয়েছিল এ-স্তর থেকে ঐ-স্তরে পর্যবসিত হয়েছে, পরে দেখা যাবে যে, তা না। হয়তো ওদের দু'জনের মাঝখানে গজিয়ে

উঠবে অন্য কোনও শাখা, হয়তো প্রশাখাও। আগে যেটা হয়তো মনে হয়েছিল যে এ-স্তরটা শুধু এতটুকুই গিয়েছিল, তারপর হঠাৎ সেটাতে একটা ছেদচিহ্নর মতো সমাপ্তি হয়েছে, পরে হয়তো দেখা যাবে যে সেটার শেষ হয় নি।

মেজোমেসো বলেছিলেন, বড় জটিল মানুষের ইতিহাস। মেজোমেসো বার-বার করে বলেছিলেন— খোলা মন নিয়ে চিন্তা করবে। পরে যদি এই বিষয় নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করো, তখনও খোলা মন নিয়ে কাজে নামবে। তুমি যদি ভুল কর, সেটা স্বীকার করতে দ্বিধা করবে না। তাতে যদি তোমার অর্ধজীবনের কাজও ভুল প্রমাণিত হয়ে যায়, তবু বিদ্যার জগতে জুয়াচুরি করবে না। সাহস রেখে বৈজ্ঞানিক হবে। ভুল করাটা লজ্জার না। লজ্জার কথা হ'ল ভুলটাকে চাপা দেওয়া। জেনে-শুনে অন্য মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যাওয়া।

সে আজ থেকে তিন কোটি তিরিশ লক্ষ বৎসর আগেকার পৃথিবী। আফ্রিকাতে এখন যেখানে মরুভূমি, সেখানে সেদিন ছিল সুন্দর বনাঞ্চল। বেড়ালের মতো ছোট ছোট প্রাণী[৪৮] ওজন মোটে চার কিলো হবে, তারা ঘুরে বেড়াতো সেই জঙ্গলে। তাদের হাত-পাগুলো ছিল বাঁদরদের মতো, কিন্তু দাঁতগুলো সেরকম ছিল না। দাঁতগুলো ছিল তার বনমানুষের মতো। এদের আবার লেজও ছিল না। এরা নাকি সেই দলের প্রাণী যাদের মধ্যে পড়ে বাঁদর, বনমানুষ আর মানুষ[৪৯]। অর্থাৎ কিনা এদের দিয়েই আমাদের শুরু। বৈজ্ঞানিকরা এসব ফসিল আবিষ্কার করে প্রাণীটার নাম দিলেন 'ভোরের বনমানুষ'।

এদের পর যারা এলো, তাদের ফসিল পাওয়া গেল অনেক বিক্ষিপ্ত দেশে। আফ্রিকার কেনিয়া অঞ্চলে[৫০]। ভারতবর্ষে, পাকিস্তানে, চীনে, আবার কিছু পাওয়া গেল ইউরোপে[৫১]। রামাপিথেকাস মানে 'রামের বনমানুষ'। এদের ফসিল আবিষ্কার হয়েছে দিল্লী থেকে মোটে একশো মাইল উত্তরে। আমেরিকা দেশের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এডওয়ার্ড লুই ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে হিমালয়ের শিবালিক স্তরে রামের বনমানুষের ফসিল আবিষ্কার করলেন। রাম ভারতবর্ষের মহাকাব্যের নায়ক। ফসিলটার বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। চোয়ালে শ্বদন্ত লেগে থাকার ফুটোটা দেখে উনি বললেন— প্রাণীটির শ্বদন্তটা ছোট। সুতরাং রামের বনমানুষ নাকি খাঁটি বনমানুষ না। তাছাড়া তার হাতের

বাহুর যে নিম্নাংশটুকু পাওয়া গিয়েছে, সেটা নাকি খুবই পাতলা। সেটাতে ভর দিয়ে নাকি হাঁটা যাবে না। তাহলে কি ওরা বেবুনদের মতো কখনো-কখনো বাঁকা-বাঁকা ছু'পায়ে চলতে চেষ্টা করতো? আমাদের পক্ষে সঠিক জানা সম্ভব না। কে জানে বাহুর যে-হাড়টা পাওয়া গিয়েছে সেটা রামের বনমানুষের হাড় আদৌ কিনা। তবে লুসি তো ভালোভাবেই দ্বিপদ-জীব ছিল। এই দ্বিপদ হওয়াটা কত আগে শুরু হয়েছে তা কে জানে?[৫২] অনেক ঝগড়াঝাঁটি হয়ে এখন বলা হচ্ছে যে, রামাপিথেকাস কিংবা ঐ সমসাময়িক কোন প্রাণীই মানুষের পূর্ব-পুরুষ নয়। হয়তো আরও ফসিল পেলে কী প্রমাণিত হবে কে জানে। কে জানে হয়তো তখন কেউ অন্য কিছু প্রমাণ করবেন। সে-প্রসঙ্গ এখন থাক।

সেই যে বেড়ালের মতো গাছে-থাকা প্রাণীরা হঠাৎ গাছ ছেড়ে মাটির পৃথিবীতে নামলোই বা কেন? এটা একটা বিরাট প্রশ্ন। বৈজ্ঞানিকরা এর উত্তর জানতে গিয়ে সমুদ্রের নিচের মাটি পৃথিবীর ওপরের মাটি, ফুলের রেণুর ফসিল, ডাঙার শামুকের ফসিল, কত-কিছু যে ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন তা কী বলি! তারপর তাঁরা বলছেন যে, আজ থেকে ৬০,০০,০০০ আর ৫০,০০,০০০ বৎসরের মধ্যিখানে পৃথিবীটা হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। তারপর আবার পৃথিবীটা মোটামুটি গরম অবস্থায় ফিরে এসেছে। সমুদ্রের জলও কমে গিয়ে নেমে গেল কোথাও কোথাও ১৯৫ ফিট অবধি। বৃষ্টির ওপরেও এই জলাভাবের প্রতিক্রিয়া পড়লো। পৃথিবীতে অনেক জায়গায় ঘনজঙ্গল কমতে থাকলো। ঘাসের প্রান্তর, ছোট পাতলা ঝোপঝাড়ের জন্ম হ'ল সেসব জায়গায়। বহু ধরনের জংলী হরিণ[৫৩] সে-সময় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। তার জায়গায় এলো ঘাসপাতা-প্রিয় নতুন ধরনের হরিণ। আর সেই সময় হয়তো জন্ম নিল তোমার আমার পূর্বপুরুষ, প্রথম মানুষবৎ[৫৪]। এদের মধ্যে প্রথম দিকে আফারেনসিস আর আফ্রিকানাস। প্রথমটি লুসির জাত, পরেরটি সেই জাত যাদের অনেক ফসিল দক্ষিণ-আফ্রিকাতে গুহার মধ্যে পাওয়া গিয়েছে। মোটামুটি অনেকেই মেনে নেন যে লুসি থেকেই আমরা এসেছি। কিন্তু দ্বিতীয়টি থেকে আমরা এসেছি, না, তার থেকে পরে তৃতীয় আর চতুর্থ স্তরের মানুষবৎ-এর জন্ম হয়েছে, সেটা নিয়ে মতভেদ, অনেক ঝগড়া আছে। সেসব কূট তর্ক থাক। এই চার জনের পর

মানুষ[৫৫], এদের আমরা মানুষ না বলে আধামানুষ বলছি। নয়তো তুমি আজকের মানুষের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলবে। এদের মধ্যে প্রথম হচ্ছে আধামানুষ, হস্ত-নিপুণ। দ্বিতীয় হচ্ছে আধামানুষ, খাড়া-দাঁড়ানো[৫৬]। দ্বিতীয় ভাগের মানুষ হচ্ছে জ্ঞানী মানুষ। এরা তিন রকমের। প্রথম হচ্ছে জ্ঞানী মানুষ, (পুরোনো) দ্বিতীয় হচ্ছে জ্ঞানী মানুষ, নিয়ানডার-থ্যাল[৫৭]। তৃতীয় হচ্ছি আমরা, জ্ঞানী মানুষ, আধুনিক।

মানুষবৎদের ছিল ছোট মগজ, বড় মুখ। মানুষের মধ্যে মুখটা ধীরে ধীরে ছোট হয়ে গেল, মগজটা অন্যদিকে বেড়ে গেল। প্রথম মানুষবৎ-এর চোয়ালটাতে এগিয়ে আছে বড় বড় শ্বদন্ত, আর কাটবার জন্য কর্তকদন্তগুলো ধরে থাকবে বলে। তৃতীয় আর চতুর্থ রকমের মানুষবৎ-এর চিবোবার (পেষকদন্ত) দাঁতগুলো বড় হয়ে গিয়েছে বেশ ভালোরকম। এর কারণ হয়তো যে তাদের খাবার ছিল শক্ত শক্ত বাদাম, পুরু পুরু ছালের ফল, মাটির নিচের কচু, কন্দ। এই চিবোবার দাঁতগুলো ধরে থাকবার জন্য, অর্থাৎ এদের নিচের চোয়ালের পেশিগুলো ধরে থাকার জন্য এদের খুলিতে ব্যবস্থাও ছিল।[৫৮] এরকম অন্য এক পেশির জন্য তৃতীয় স্তরের মানুষবৎ-এর মুখটা হয়ে গেল চ্যাপ্টা। সেই তুলনায় পুরোনো মানুষের কিন্তু পেছন-দিককার দাঁতগুলো বেশ ছোট ছিল। মগজটা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখের ওপর দিকটা বেড়ে গেল।

অপূর্ব সব গল্প বলেছিলেন মেজোমেসো। প্রফেসর ডার্ট[৫৯] যাচ্ছিলেন এক বিয়েতে। সঙ্গে স্ত্রী। এ হেন অবস্থাতে দক্ষিণ-আফ্রিকার[৬০] এক খনিতে কাজ করেন এমন এক লোক দু'বাক্স ফসিল নিয়ে ডার্ট-এর কাছে এলেন। যে-খনিতে সে কাজ করে, সেখান থেকে সে বেবুনের খুলির ফসিল এনেছে ডার্ট-এর জন্য। কিন্তু ডার্ট-এর মন বলতো অন্য কথা। তাঁর মন বলতো যে হয়তো একদিন বেবুনের বদলে সেখানে উনি খুঁজে পাবেন দু'পায়ে-খাড়া কোনও এক মানুষবৎ-এর খুলির ফসিল। তাই তিনি রটিয়ে দিয়েছিলেন সর্বত্র যে, যে-কোনও বেবুনের খুলির ফসিল পেলে, যে ফসিল আনবে তাকে উনি পুরস্কার দেবেন। তার পরিণামে এই লোকটি আজ এই দু'বাক্স ফসিল এনেছে। ডার্ট-এর স্ত্রী তাড়া দিচ্ছিলেন বিয়েতে যাবার জন্য, কিন্তু ডার্ট-এর মন সেখানে কোথায়? গুণী বিজ্ঞানীর চোখকে ধুলো দেওয়া কী যে-সে কথা! দু' নম্বর বাক্সের মধ্যে উনি দেখতে পেলেন একটা ফসিল। মনে হ'ল

বেবুনের খুলির থেকে এটা কিছুটা বড়। বড় শ্বদন্তগুলো বিষদাঁতের মতো বড় না। খুলিটার নিচটা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে প্রাণীটার মাথা খাড়া ছিল। দু'পায়ে হাঁটতো সে। কিন্তু মগজটা ছিল ছোট। সময়ট ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ।

কিন্তু ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তো পিল্টডাউনের খুলি আবিষ্কৃত হয়ে গিয়েছে। বিরাট মগজ সেই খুলির। পিল্টডাউন যে ধাপ্পাবাজি সেটা তখনও প্রমাণিত হয় নি। বিজ্ঞান মহল তাই ডার্ট-এর আবিষ্কারকে সেদিন মূল্য দিল না। ওরা ভেবে নিলো যে এটাও নিশ্চয়ই বেবুন-জাতীয় কোনও প্রাণীর ফসিল।

তারপর ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হ'ল লুসি। ডার্ট-এর মানুষবৎ দ্বিতীয় স্তরের। কিন্তু লুসি প্রথম স্তরের মানুষবৎ। আর তার থেকেও যেটা বড় কথা, পিল্টডাউন-এর জুয়াচুরি ততদিনে ধরা পড়ে গিয়েছে এবার বিজ্ঞানীরা মেনে নিলেন যে, হ্যাঁ, মানুষ দাঁড়িয়েছে আগে। তার মগজ বেড়েছে পরে।

ডার্ট-এর আবিষ্কারের দ্বিতীয় স্তরের মানুষবৎ-এর শরীর কিংব মগজ প্রথম স্তরের থেকে বেশি বড় ছিল না। মগজটা যতটুকু বড় এব যে-জায়গাটাতে বড়, তা দেখে মনে হয় না যে সে হয়তো কথা বলতো পেছনের দাঁতগুলো বড়। সামনের দাঁতগুলো একটু ছোট। এই স্তরে আয়ু ছিল গড়পড়তা মোটে বাইশ বৎসর। মেজোমেসো বললেন— "একথা তোমাকে আগেও বলেছি।

"তৃতীয় স্তরের মানুষবৎ আবিষ্কার-- সেও এক মজার কাহিনী রবার্ট ব্রুম টুকটাক খুলি কিনে বেড়াতেন আফ্রিকাতে। স্থানী বাসিন্দাদের থেকে। উনি জানতেন যে চুনাপাথরের খনিতে কাজ হচ্ছে।[৬১] বোমা দিয়ে ফাটিয়ে দেওয়া হচ্ছে পৃথিবীর ভূগর্ভ। চুনা পাথর জ্বালানো হচ্ছে বিরাট বিরাট চুল্লিতে। আর সেই সঙ্গে ফো চৌচির হয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে— মানুষের প্রাগৈতিহাসিক ইতিহাস।

একদিন ব্রুম দু'পাউণ্ড দিয়ে একটি খনির ম্যানেজারের কাছ থেকে কিনলেন একপাটি ওপরের চোয়াল। এখনও সেখানে একটা চিবোবা দাঁত লেগে আছে। বহু জিজ্ঞাসাবাদের পর ম্যানেজার বললেন যে একটি ইস্কুলের এক ছাত্র[৬২] এনে দিয়েছে এই ফসিলটুকুকে ম্যানেজারের কাছে। ব্রুম দৌড়লেন স্কুলের ছাত্রটির কাছে। সব শুনে ছাত্রটি পকে

থেকে বার করে আনলো ক্রমের ভাষায় "পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা সব-চাইতে সুন্দর চারটে দাঁত।" ছাত্রটি ক্রমকে নিয়ে চলল তার সঙ্গে। উৎরাইয়ের ওপর তার লুকোনো জায়গা থেকে বার করে এনে দিল ক্রমকে চমৎকার একটি নিচের চোয়াল, তাতে তখনও দুটো দাঁত লেগে আছে।

এই যে তৃতীয় স্তরের মানুষবৎ, এর শরীর ছিল ভারী। শরীরে শক্তি এদের বেশি। বড় মুখটা থালার মতো চ্যাপ্টা। ভুরুর জায়গাটা উঁচু কিন্তু কপাল নেই। খুলির ওপর দিক থালার কানার মতো উঁচু হাড় আছে, যার মানে — চিবোবার পেশিগুলো নিশ্চয়ই ছিল শক্তপোক্ত। সামনের দাঁতগুলো মোটামুটি ছোট কিন্তু মশমশ করে খাবার জন্য পেছন দিকে আছে বড় বড় দাঁত। নিচের মজবুত চোয়ালে সেগুলো সাজানো ছিল। সেইজন্য কেউ-কেউ এদের উপাধি দিয়েছেন "সবশেষে চিবোবার যন্ত্র।" বিজ্ঞানীরা বলেন যে জীবনযাত্রা নিশ্চয়ই খুব কঠিন ছিল। আয়ু ছিল গড়পড়তা মোটে সতেরো বৎসর। এরা ছোট বড় হাড় দিয়ে মাটি খুঁড়ে ছোবড়ার মতো অখাদ্য কন্দ জাতীয় খাদ্য খুঁড়ে খুঁড়ে বার করে চিবিয়ে চিবিয়ে খেত। আজ থেকে বিশ লক্ষ বছর আগে এরা পৃথিবীর বুকে এসে আবার কিছুদিন বাদে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এই শাখাটা চলতে থাকে নি। থেমে গিয়েছে।

তেমন করে মানুষবৎ-এর চতুর্থ শাখাও শেষ হয়ে গিয়েছিল। চলতে থাকে নি। এদের আবিষ্কার করেছিলেন মেজোমেসোর চেনাজানা ঐ দম্পতি— লুই আর মেরি লিকি। টাকা ছিল না তাদের কাজ করবার জন্য— পরের দিকে যদিও টাকা এসেছিল চার্লস বয়েজ বলে এক ভদ্র-লোকের কাছ থেকে। জায়গাটা হচ্ছে কেনিয়া দেশের অলডুভী খাদ-এর দু'ধারে। সেখানে পাওয়া গেল এদের ফসিল। এদের মগজ তৃতীয় স্তরের মানুষবৎদের মগজ থেকে বেশি বড় ছিল না। কিন্তু আর সব ব্যাপারে এরা ছিল অসম্ভব মজবুত। এত বিশাল এদের মুখ আর গালের মধ্যের দাঁত, যে এদের ডাক-নাম দেওয়া হয়েছে 'বাদাম-ভাঙা মানুষ'। বলা হয়, এরা ১৮ লক্ষ বৎসর আগে ছিল।

এদের আবিষ্কার করার পরও অলডুভী খাদে কিন্তু কাজ চলতে থাকলো। বিদগ্ধ মহলে এ-জায়গার নাম শোনেন নি, এমন লোক কম। এখানেই ক্রমশ পরে পরে পাওয়া গিয়েছে মানুষের প্রথম চিহ্ন। কেন

হঠাৎ মানুষবৎ থেকে মানুষ এলো তা জানতে হলে জেনে নিতে হবে যে পৃথিবীর আবহাওয়াতে আবার কী এমন ওলট-পালট হ'ল যাতে করে বাঁচবার খাতিরে নতুন মোড় নিল মানুষের ইতিহাস। এ-ব্যাপারে উত্তর দিতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা বলেন যে, আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট লক্ষ বৎসরের মাঝ সময়ে পৃথিবীটা ঠাণ্ডা হয়ে আবার মোটামুটি গরম হয়ে গিয়েছিল। এই গরম-ভাব বেশিদিন চলে নি। পুনরায় আজ থেকে পঁচিশ লক্ষ বৎসর আগে পৃথিবী আবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আবার দক্ষিণ মেরুতে বরফ জমতে আরম্ভ করলো। আবার একবার উদ্ভিদ্ আর প্রাণীজগতে এলো পরিবর্তন। যে-শাখা ধরে আমরা চলছিলাম, সে-শাখাটা এই সময়ে দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে গেল। একটি শাখা চলে গেল তৃতীয় স্তরের মানুষবৎ-এর দিকে, অন্য শাখাটা চলল যার থেকে মানুষ এলো, যার সমাপ্তিতে এলাম আমরা।

মানুষদের বুঝবার জন্য মেজোমেসো আমাকে বলেছিলেন যে, মানুষদের আমি দু'ভাগে বিভক্ত করে যেন বুঝি। মানুষদের এক ভাগ আধা-মানুষ। আর মানুষদের আরেক ভাগ জ্ঞানী মানুষ। প্রথম মানুষ হচ্ছে আধা-মানুষ, হস্ত-নিপুণ। এদের মুখটা সেকেলে। কিন্তু পেছনকার দাঁতগুলো এদের সরু-সরু। কিন্তু মগজটা প্রায় আমাদের মগজের অর্ধেক। কেউ-কেউ বলেন যে, ওদের মগজে কথা বলার স্থানটা আছে। তবে আবার অনেকে বলেন যে, এরা সব রকমের শব্দ করতে, অর্থাৎ আজকের মতো পরিষ্কার কথা হয়তো বলতে পারতো না। তবুও আগেকার স্তরের মানুষবৎদের মতো কথা বলতে যে একেবারেই পারতো না, তা খুব সম্ভবত নয়। মগজের গঠন দেখলে মনে হয় যে গঠনের দৌলতে হয়তো কিছু-একটা ভাষার আদানপ্রদান করতে পারতো এরা। আর পারতো পাথরের সুন্দর অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতে। এবার থেকে মানুষের কৃষ্টি তৈরি হচ্ছে। হাতিয়ারের কৃষ্টি। এখন থেকে বৈজ্ঞানিকদের আর শুধু ফসিল বিশ্লেষণ করে জ্ঞান আহরণ করতে হবে না। জায়গায় জায়গায় খুঁড়ে কিংবা কুড়িয়ে-পাওয়া আধা-মানুষের হাতিয়ার বিশ্লেষণ করবেন। হাতিয়ার পাওয়া মানে বুঝতে পারা, এসব মানুষের ব্যবহারিক জীবনযাত্রা কেমন ছিল।

জড়-করে পাওয়া-যাওয়া হাতিয়ার দেখে সর্বদা বোঝা যায় না যে, যে-জায়গাটাতে ওদের হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছে সে-জায়গাটা ওদের

অস্থায়ী আবাসস্থল ছিল, না কি, সেটা ওদের ছিল বধ্যভূমি। হাতিয়ার যে-বস্তু দিয়ে তৈরি, যেমন ধরো যদি পাথরের হয়, তবে সেই পাথর কত দূর-দূরান্ত থেকে আনা হয়েছে সেটা জানাও জরুরী। কারণ, তার মানে এই যে, তখনকার মানুষ তাহলে ভ্রাম্যমাণ ছিল বুঝতে হবে। সে বয়ে নিয়ে আসতে পারতো ভারি ভারি বোঝা। তারা একজন আর-এক-জনকে এই বোঝা বয়ে নিয়ে আসতে সাহায্য করতো।

লেক টুরকানাতে[৬৩] রিচার্ড কাজ করেছেন। সেখান থেকে চমৎকার এক দ্বিতীয় স্তরের আধা-মানুষ-এর— যার নাম খাড়া-মানুষ বলা যেতে পারে, তার ফসিল রিচার্ডের দল খুঁজে পেয়েছেন। বছরটা ১৯৮৪। ফসিলটি বারো বৎসরের এক কিশোরের। লুসির থেকেও অনেক সম্পূর্ণ কঙ্কালটি। ছেলেটি ছিল ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি লম্বা। হয়তো বেঁচে থাকলে বড় হয়ে ৬ ফুটের মতো ওর উচ্চতা হ'ত। ১৬,০০,০০০ বৎসরের পুরোনো ফসিল সে। কিন্তু টুপি পরিয়ে যদি তার নিচু কপাল আর উঁচু ভুরু ঢেকে দিয়ে আজকালকার পোষাকে সাজানো হয়, হয়তো তাকে তখন আমাদের থেকে পৃথক দেখতে মনে হবে না।

মেজোমেসো বলেছিলেন যে— এদের আমি পর্যটক মানুষ বলি। এরা আফ্রিকার কোল ছেড়ে প্রথম বেরিয়েছিল পৃথিবী-পর্যটনে। চলতে-চলতে হাজির হয়েছিল ভারতবর্ষের নর্মদা উপত্যকায়। জাভা দ্বীপে কিংবা চীন দেশের পিকিং সহরের কাছে।

এদেরও মুখ সেরকমই আগের আধা-মানুষ হস্ত-নিপুণের মতোই। চোয়ালটা এগোনো। চিবুক নেই। ভুরু উঁচু। লম্বা নিচু মগজ, খানিকটা হাওয়া বার করা ফুটবলের মতো দেখতে। দাঁতগুলো আগের থেকে একটু ছোট। কিন্তু মগজটা ? মগজটা বেশ বেড়েছে। এখন সে আগুন জ্বালাতে পারে। রাঁধতে পারে। তার ফসিল যেখানে পাওয়া গিয়েছে তার দু'এক জায়গায় পোড়া কাঠ-কয়লাও পাওয়া গিয়েছে। আর তার হাতের কাজের উন্নতি হয়েছে। এবার যে-হাতিয়ারগুলো তার সঙ্গে পাওয়া গেল, সেগুলোর আকৃতি বেশ সুন্দর। বড়-বড় চোখের জলের আকারের প্রস্তরের তৈরি হাতিয়ার।

এরা পৃথিবী পর্যটক। কিন্তু কেন ? খাদ্যের অভাবে, নাকি জনবৃদ্ধির চাপে ? নাকি এরা বার হয়ে পড়েছিল নিছক শুধু জানবার আগ্রহে ? দেশ থেকে দেশান্তরে, এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে ? কেউ কেউ

প্রশ্ন করেন যে,এদের ব্যবহারিক জীবনযাত্রা কেমন ছিল। এদের খুলিতে বড়-বড় আঘাতের চিহ্ন আছে। কিন্তু কেন? এরা কি নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ করতো? নাকি এরা বড় বড় জানোয়ার শিকার করতে গিয়ে জখম হ'ত ভালোরকম। কুবি ফোরাতে (Koobi Fora) পাওয়া এক ফসিল থেকে দেখা যাচ্ছে যে, প্রাণীটির হাড়গোড় নষ্ট হয়ে পচপচে হয়েছে। দেখলে মনে হয় হয়তো ওর ভিটামিন 'এ' শরীরে অত্যধিক বেশী হয়ে গিয়েছিল। এ-রুগীটিকে কি ওরা দেখাশুনো করতো?

মেজোমেসো বলেছিলেন— এর পরের স্তরের ফসিল আমরা এই প্রথম ইউরোপে আবিষ্কার করলাম। এরা তিন রকমের। এদের আমরা জ্ঞানী মানুষ নাম দিতে পারি। জ্ঞানী মানুষ, পুরোনোর ফসিল দেখলে দেখা যাচ্ছে যে এদের মগজ বেড়ে যাচ্ছে খুব দ্রুত হারে। বিশেষ করে বড় মগজ দেখা যাচ্ছে এর পরের স্তরে, অর্থাৎ জ্ঞানী মানুষ নিয়ানডার থ্যালের। জার্মানীর নিয়ানডার উপত্যকাতে এদের ফসিল আজ থেকে বহু বহু পূর্বে, ডারউইনের বই লেখারও আগে, ১৮৫৬ সালে পাওয় গিয়েছিল। তখন কেউই বুঝে উঠতে পারতেন না যে এই ফসিল কো মানুষের। পর্যটক পুরোনো মানুষের ফসিল যখন জাভা আর চীন দে পাওয়া গিয়েছিল তখন চীন দেশের সাধারণ মানুষ ভাবতো যে ও ফসি কুমির-জাতীয় এক কাল্পনিক প্রাণী (ড্রাগন)-র অবশিষ্ট। কারণ সে সব ফসিলও পাওয়া গিয়েছিল বহু পূর্বে। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে চীন দেশে কিংবা ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে জাভা দ্বীপে। এবারও জার্মানীর সাধারণ মানুষ চিন্তা করলেন যে, নিয়ানডারথ্যালের ফসিল কোত্থেকে এসেছে। কেউ বলতো যে বাইবেলে যে-বন্যার কথা লেখা রয়েছে, এরা সেই বন্যাশেষের বাস্তুহারা। কেউ বলতো, এরা নিশ্চয়ই কোনও মুনি-ঋষির ফসিল। কেউ বলতো যে,নেপোলিয়ানের সঙ্গে যারা যুদ্ধ করতে গিয়েছিল তাদের কোনও কসাক সৈন্যবাহিনীর চিহ্ন এসব।

প্রায় ১০০ জায়গার থেকে নিয়ানডারথ্যালদের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। আমাদের থেকে খুব ভিন্নতর ওরা ছিল না, যদিও ওদের শরীরের গঠন ছিল মজবুত। হাড়গোড়গুলো ভারি-ভারি। সেখানে শক্ত-পোক্ত পেশীর দাগ এখনও মুছে যায় নি। দেখে মনে হয় যে ওরা অসম্ভব সহিষ্ণু ছিল, অসম্ভব পরিশ্রম করতে পারতো। হয়তো একটু খাটো খাটো ছিল পাগুলো, আজকালকার কালের এস্কিমোদের মতো।

এরাই প্রথম মানুষ যারা ঠাণ্ডার দেশে পত্তনি শুরু করেছে। বড় মাথা, বড় মুখ। গালের হাড় পিছিয়ে গিয়েছে, চিবুকও ছোট। চওড়া নাক, এগিয়ে-আসা চোয়াল। কিন্তু আসলে এর মগজ নিয়ে কথা। এদের মগজ আমাদের আধুনিক মগজ থেকেও হয়তো কিছুটা বড়। কিন্তু গঠনটা অন্য ধরনের। কেউ-কেউ বলেন যে, আমাদের মতোও উন্নত ছিল সে-মগজ। অবিশ্যি কথা বলতে পারতো কিনা সেই নিয়ে মতভেদ আছে। আবার কেউ-কেউ বলেন যে,এদের মগজ বড় হলেও মগজের গড়ন ছিল ভিন্ন আকারের। চিন্তা-প্রণালী হয়তো অন্য রকমের ছিল। নাকি মগজ ব্যস্ত থাকতো এদের মজবুত শরীর চালনা নিয়ে? কে জানে কেন যে এরা অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, তা নিয়ে চিন্তা করে সবাই।

ঐ অসম্ভব ঠাণ্ডায় এরা বেশ মানিয়ে-গুনিয়ে বেঁচে ছিল। সামনের দাঁতের ফসিল্স দেখে বৈজ্ঞানিকরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, আজকের এস্কিমোদের মতো ওরাও সামনের দাঁত দিয়ে চামড়া ধরে জীব-জন্তুদের ছাল ছাড়াতো হাতিয়ার দিয়ে। অনেকে বলেন যে— এরা মৃত আত্মীয়-স্বজনকে কবর দিত সম্মান দিয়ে। হয়তো কবরে কোনও হাতিয়ারও রেখে দিত। হয়তো কোথাও পাথর দিয়ে ঘিরে দিত খুলির চারপাশে। কোথাও নাকি গেরুয়া রঙের ছোপও দিয়েছে এক মৃতদেহে। ফ্যাকাসে মৃতদেহে জৌলুস আনার বৃথা চেষ্টা। এদের একজনের ফসিলে দেখা যাচ্ছে যে তার পাঁজরা ভাঙা। কোমরে অসম্ভব বাত। হাড় বেঁকে বেঁকে গিয়েছে। শিরদাঁড়াটা অসুখে নষ্ট হওয়া। মাড়ির অসুখের ফলে প্রায় কোনও দাঁতই অবশিষ্ট নেই। মানুষটির ৪০ বৎসর মোটে বয়স। প্রশ্ন হ'ল যে, এই মানুষটাকে খাইয়ে-দাইয়ে বাঁচিয়ে রাখতো কে? সমাজে কি বৃদ্ধদের রক্ষণাবেক্ষণের প্রথা ছিল?

তারপর একদিন, আজ থেকে যেমন হঠাৎ একদিন, এরা সোয়া লক্ষ বৎসর আগে এসেছিল, তেমনই হঠাৎ আজ থেকে তিরিশ চল্লিশ হাজার বৎসর আগে এরা লুপ্তও হয়ে গেল। এদের কি আমরা ধ্বংস করে ফেলেছি? কেউ-কেউ বলেছেন যে হয়তো আমাদের সঙ্গে বিয়ে-সাদি হয়ে এরা আমাদের মধ্যে মিলেমিশে গিয়েছে।

শেষ স্তরের মানুষ কি নিয়ানডারথ্যাল মানুষ থেকেই এসেছে? তারা কি সেই একই শাখার? নাকি তারা এসেছে আগের অন্য কোনও স্তর থেকে? এ-সম্বন্ধেও মতামত ভিন্ন-ভিন্ন।

নতুন মানুষের ক্রোম্যানিয়ন-এর চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে ৩০,০০০ বৎসর আগে। এরা জ্ঞানী মানুষ, ক্রোম্যানিয়ন। কে জানে, তারা হয়তো এর থেকেও পুরোনো কালের। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের দক্ষিণ পশ্চিমে এদের ফসিল খুঁজে পায় রেলের কাজ করতে গিয়ে। উঁচু কপাল, শক্ত চিবুক, নিচু ভুরু এদের খুলি। আধুনিক মানুষের খুলি এটা, কিংবা হয়তো আধুনিক মানুষের থেকে খুব সামান্য তফাৎ। এত সামান্য যে তা অগ্রাহ্য করলেও চলে।

পঁয়ত্রিশ থেকে দশ হাজার বৎসর আগে অবধি এদের দেখা যাচ্ছে ভবঘুরে শিকারী হিসাবে। এদের আবার বর্শা, তীর-ধনুকও ছিল। অর্থাৎ দূরে থেকেও এরা শিকারকে ঘায়েল করতে পারতো। কখনও কখনও ৫০-৭৫ জন একত্রে থাকতো এরা। পাথরের উনুন ছিল এদের। কারুকার্য করেছে এরা হাড় কিংবা হাতীর দাঁতের ওপর। হাড়ের ছুঁচের ডগায় ফুটো করেছে সেলাই করবে বলে।

ফ্রান্সের আল্টামিরা গুহাতে নাকি মেজোমেসো এদের আঁকা প্রস্তর-চিত্র দেখতে গিয়েছিলেন। শ'য়ে-শ'য়ে আঁকা আছে হরিণ, বাইসন, ঘোড়া, দাঁতালো-হাতী। কিছু আঁকা, কিছু খোদাই-করা। কালো, গেরুয়া, আর হলুদের অপূর্ব চিত্রপট এসব। শিকারই ছিল এদের মুখ্য জীবন-যাত্রা। ছবির মধ্যে বর্শা কিংবা তীর-এর ছবিও আছে বিঁধোনো।

বিবর্তনের বিস্তারিত প্রসঙ্গ বোঝাতে মেজমেসো বলেছিলেন— এর পরে আর মানুষের আকার-গত কোনও বিশেষ বিবর্তন হয় নি। কিন্তু সেদিনকার মানুষ আর আজকের মানুষের কত তফাৎ। তখনকার পাতা কুড়োনো আর শিকারের স্তরের মানুষ এখনও হয়তো পৃথিবীর আনাচ-কানাচ খুঁজলে পাওয়া যাবে। কিন্তু তাদেরও মগজ আমাদের সভ্য মানুষের মগজের মতনই সম্ভাবনাপূর্ণ। তাহলে প্রশ্ন হ'ল যে, তবুও কেন তারা পড়ে রইল অতীত জীবনযাত্রায়। কেন তারা উন্নততর হতে পারলো না? আর, এর উত্তর শুধু একটাই। কৃষ্টিগতভাবে ওদের বিবর্তন হয় নি। সেদিনকার ফ্রান্সের আল্টামিরা গুহার মানুষ আর আজকের ফ্রান্সের সাধারণ মানুষের মধ্যে তফাৎ একটাই। কৃষ্টি-গত তফাৎ। তফাৎ হাতিয়ারের, পশুপালনের, কৃষিকার্যের। হাঁড়ি কলসি বাসন গড়ার। তফাৎ চাকা তৈরি করার। তফাৎ হাট, গঞ্জ, বাজার বসানোর। তফাৎ গ্রামের পত্তনির। শহর তৈরি করার। হস্তশিল্প, যন্ত্র যুগ। অ্যাটম বোমা।

এর পরে কী আছে কে জানে! মেজোমেসো বলেছিলেন—বড় ভয় করে রে স্বর্ণ! ভবিষ্যতে ধ্বংসের করালছায়া ঘনিয়ে আসছে কিনা জানি না।

দশ

রাত্রে আমার ঘুম আসে না। বাইরে একটা কুকুর কেঁউ-কেঁউ করে কোথায় যেন কাঁদছে।

আমি তখন কাকুর কথা ভাবছিলাম। ত্ব'বৎসর আগের কথা। সে-সময়টাতে কাকুর আর আমার মধ্যে খটাখটি লেগে যাচ্ছিল। আমার বহুদিনের সখ, কুকুর-ছানা পুষি। কাকু বাবাকে ডেকে বললেন—"শত্রুতা করবে তো মেয়েকে লেলিয়ে দিয়ে কেন? সোজাসুজি শত্রুতা করলেই পারো।" বাবা কুকুর-ছানা পোষার ব্যাপারটা আগে শোনেন নি। এখন জানতে পেরে মহা-আন্দোলন শুরু করে দিলেন। কুকুর কিরকম ভয়ানক শয়তান জীব, সে-কথা অহরহ আমাকে আর ভাইটিকে বোঝাতে লাগলেন। ওদের বিষে কে কবে মরেছে, কার বাড়ির কুকুর বাড়িসুদ্ধ লোককে ক্ষতবিক্ষত করেছে, সে-সবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার চলল। জেঠি-মাও আপত্তি তুললেন। ভাইটিকে বললেন— "তুমি তো বাপু সাবানের সঙ্গে সম্পর্ক রাখো না। কুকুর পুষলে ঐ ময়লা হাতে খাবে। ছিঃ ছিঃ, তারপর অসুখ করে বাড়িসুদ্ধ লোককে ভাবিয়ে তুলবে।" ঠামা কানে কম শোনেন। তিনি বুঝলেন, বাঁদর পুষতে চাই। বিরাটভাবে বিদ্রোহ করে বসলেন ঠামা, বললেন— "আচার আমসত্ত্ব— এসব কিছু রোদে দেওয়া যাবে না।" একবার হরিদ্বারে ঠামার গালে একটা বাঁদর বিরাট জোরে চড় কষিয়েছিল। ঠামা নাকি এত ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন যে, সেই রাত্রেই ঠামার বসন্ত হয়ে গিয়েছিল। আমি বললাম— "উঃ, তোমাদের বিজ্ঞানের জ্ঞান নিয়ে আর পারা গেল না। বাঁদরে মারল চড়, আর তোমার হ'ল বসন্ত, এ-ত্বটোর মধ্যে কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে?" কাকু বললেন "তবু যাক, মা কুকুরের বদলে বাঁদর শুনেছেন। কুকুর শুনলে মা আর রক্ষে রাখবেন না।"

এত যখন তর্ক বিতর্ক, এ হেন সময়ে অরিন্দমদা'র বাড়ি থেকে ভাইটি এক ছোট্ট এইটুকু সাদা ধবধবে বড় বড় লোমওয়ালা এক কুকুর-ছানা নিয়ে এসে হাজির। বীরবিক্রমে ভাইটি কুকুর-ছানাটা আমার

কোলে দিয়ে বলল— "একে একটু মাংস খাওয়ালেই এ বেশ মোটা-সোটা হয়ে যাবে।" যেন আমাদের বাড়িতে লুকিয়ে-সুকিয়ে কুকুরকে মাংস-খাওয়ানো চাট্টিখানি কথা। কুকুর-ছানাটিকে আমরা সন্তর্পণে এক-তলায় লুকিয়ে রাখলাম। কিন্তু জেঠিমার চোখ এড়ানো খুব কঠিন। প্রথম দিনই জেঠিমা ধরে ফেললেন যে দুধের বাটি থেকে দুধ বেড়ালে খেয়ে পালিয়েছে। বেড়াল এমন দুর্দান্ত বিপদ হয়ে দাড়িয়েছে যে, ভাতের হাঁড়িতেও সে নাকি মুখ দিয়ে ভাত নেড়েচেড়ে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। রান্নাঘরে ছিটকিনি পড়লো।

সকালবেলা কাকু আমাকে ডেকে বললেন— "কাদের বাড়ি থেকে কুকুর-ছানা এনেছে রে? সারারাত কেঁউ-কেঁউ করে কেঁদেছে। এক ফোটা ঘুমোতে দেয় নি।"

আমাদের দারওয়ান রামকৃপাল একতলার ঘরে থাকে। তাকে আমরা হাতে-পায়ে ধরে রাজী করিয়েছিলাম কুকুর-বৃত্তান্ত কাউকে যেন সে না বলে। সকালবেলা উঠে দেখি সে চোখ গরম করে বলছে— "আব ভি মেজমাকো রিপোর্ট কর দেগা। কুত্তা নে কাল রাত কো হামরা জুতি খা লিয়া। জুতিকা ফিতা ভি নেহি বাঁচা।"

কিন্তু অনর্থ ঘটিয়ে কুকুর-ছানার বিরাম হয় নি। সন্ধেবেলা ঠামা বাতি নিভিয়ে সন্ধ্যা করছিলেন। আমি ও ভাইটি ঘরে পড়াশোনায় ব্যস্ত। হঠাৎ কী হ'ল কি জানি, মা এসে আমাদের দু'জনকে বিরক্ত গলায় বললেন— "আচ্ছা, হচ্ছেটা কি? মা সন্ধে করছেন চোখ বুজে। মা-র পাশে কুকুর-ছানা কোত্থেকে এল? খুরিতে রসগোল্লা ছিল— খেয়ে সাবাড় করে দিয়েছে। এতরাত্রে সব মিষ্টির দোকান বন্ধ। মা আজ রাত্রে খাবেন কী?"

এ-বাড়িতে মা-র আমাদের শাসন করবার হুকুম নেই। তা হলেই ঠামা, জ্যাঠাবাবু, জেঠিমা সবাই বলবেন— অনর্থক মা আমাদের পেছনে লেগেছেন। সুতরাং মা-র গলার স্বরটা খুবই নিচু ছিল। কিন্তু ভাইটি কথাগুলো শুনে হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠলো— "কী হবে রে দিদি— ঠামা তো রাত্তিরে আর কিছু খাবেন না।" আওয়াজ শুনে তৎক্ষণাৎ বাবাও ঘরে এসে উপস্থিত। আমরা সবাই মিলে দৌড়ে ঠামার ঘরে গিয়ে দেখি, কুকুর-ছানা রসগোল্লা উদরসাৎ করে ঠামার পা চাটছে। ঠামা অন্ধকারে ওটাকে ঠেলে-ঠেলে দিচ্ছেন, আর নিজের মনে মনে

বলছেন, "দ্যাখো তো বেড়ালটার আস্পর্দা কী বেড়ে গিয়েছে। ছোট খোকা দেখতে পেলে এক্ষুনি এটাকে চটি পেটা করবে— কিন্তু এটা কিছুতেই এত মার খেয়েও শিখবে না।"

ভাইটি আমাকে ঠেলা মেরে আস্তে-আস্তে বলল— "যা না দিদি। ওটাকে নিয়ে আয়। ঠামা তোকে কিছু বলবে না।" আমি ভাইটিকে ঠেলা মেরে বললাম— "আমি নিয়ে এলে ওটা চিৎকার শুরু করবে। সবাই শুনতে পাবে।"

কিন্তু সবাইকে আর শুনতে হ'ল না। রামকৃপাল হাঁউমাউ করে চিৎকার করতে-করতে ওপর তলায় এসে হাজির— "খোকাবাবু আর দিদিমণি, দোনোহি ভয়ানক খারাপ হয়ে গিয়েছে— চোরি ভি শুরু করিয়েছে।" সেসব বার্তা রামকৃপাল জোর গলায় ঘোষণা করা শুরু করলো। বাড়িসুদ্ধ্ সবাই দৌড়ে এলো। রামকৃপাল নাকি সবে রোটি আর ডাল তৈরি করে সুয়েটার খুলে নাহাতে গিয়েছিলো। ও শালা কুত্তাকা বাচ্চা সুয়েটার খেয়ে নিয়েছে। রোটি ডাল ভি খেয়েছে। উধার পিসাব টাট্টি ভি করিয়ে রেখেছে। আউর ডর সে-কুত্তা ভাগ ভি গিয়েছে। লেকিন, রামজি জানেন, খোকাবাবু বিশাওয়াস করে গা হে নী, কিন্তু বাহারকা দরওয়াজা রামকৃপাল বন্ধ রেখেছিল। শালা কুত্তা ভাগা কিধারসে সে রামকৃপালের মালুম হে নী হায়। কুকুর-ছানা ঠিক সেই সময় সোরগোল শুনে রামকৃপালকে অভ্যর্থনা করবে বলে সিঁড়ির সামনে উজ্জ্বল আলোকে এসে ল্যাজ নাড়তে-নাড়তে দাঁড়ালো।

রামকৃপাল এতটা আশা করে নি। কুকুর-ছানাকে দেখতে পেয়ে ও রাগে ফেটে পড়লো। গলার আওয়াজ আরও একগ্রাম বাড়িয়ে চিৎকার করে সে কুকুর-ছানাকে উদ্দেশ করে বলতে থাকলো— "তুম শালা বুড়ামাইজিকা পাসমে ডরসে ভাগকে আয়া হায়, আউর হাম শালা পুরা হুনিয়া তুম্‌কো ঢুঁড়কে মরা। বস্তি মে চোর-চোট্টা কিছু কমতি নেহি হ্যায়। বিলাইতি কুত্তা দেখনেসে পহলেই উসকো চোরি করেগা শালা লোগ। শ' হুশো রুপেয়া ভী মিলেগা। রামজী জানেন এই আন্ধেরামে কিত্না ঠাণ্ডা, সুয়েটার ভি শালা খা লিয়া। হামী পুরা বস্তি খোকা-বাবুকা ডরসে কুত্তাকো ঢুড়কে মরা।"

কাকু একগাছা নারকেল-দড়ি দিয়ে কুকুর-ছানাকে বেঁধে রামকৃপালকে বলল— "উসকো যাও, অরিন্দমকো ঘরমে ওয়াপাস করকে আও।"

এমনিতে বিরাট তাগড়াই চেহারা হলে কী হয়, রামকৃপাল হাত জোড় করে জ্যাঠাবাবুর দিকে ফিরে বলল— "বড়াবাবু, এ-কুত্তা খতর নাক জানোয়ার হ্যায়। হামকো কাট লেগা। ইস গন্দা জানোয়ার ছোনেসে আউর দুসরা বার ফিন নাহানে ভি পড়গো।"

বিরক্ত হয়ে কাকু নিজেই ক্রন্দনরত কুকুর-ছানার দড়ি ধরে টানতে-টানতে অরিন্দমদা'র বাড়ি রওনা হলেন।

আমার আর ভাইটির মুখ হাঁড়ি হয়ে গেল। কিন্তু কাকুর ভয়ে কেউ কিছু বলতে পারলো না। রাত্রে খাবার সময় ঠামা আমাদের অনেক করে বোঝালেন। বললেন— "কুকুর একটা অস্পৃশ্য প্রাণী। তা ছাড়া ওরা কামড়ালে মানুষের পেটে কুকুর-ছানা জন্মায়।" ঠামার বিজ্ঞান-জ্ঞান বর্ষণ হতে থাকলো।

মেজোমেসো এক পাশে বসে খাচ্ছিলেন। পুরোটা কুকুর-পর্ব যখন ঘটছিল উনি তখন একটিও কথা বলেন নি। এবার বললেন— "মাসিমা, কুকুর-ছানার এ-বাড়িতে না থাকাটাই উচিত। ভাইটিকে আঁচড়ে-কামড়ে দিলে তার ফল মারাত্মক হতে পারে। কিন্তু তা বলে একটা নিরীহ প্রাণীকে আপনার ছোটখোকা যেরকম নারকেল-দঁড়ি দিয়ে বেঁধে হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে গেল গালমন্দ করতে-করতে, সেটা আমি সমর্থন করি না।"

জ্যাঠাবাবু বললেন— "আম তো এসব কিছু আগে থেকে শুনি নি। নয়তো একটা ব্যবস্থা করে কুকুর-ছানাটাকে রাখা যেত। বেশ দেখতে ছিল কিন্তু।"

জেঠিমা বললেন— "আমি ভেবেছি বুঝি বেড়াল। আমি দু'চোক্ষে বেড়াল দেখতে পারি না কখনো।" জেঠিমা জানালেন যে, কুকুর-ছানা জানলে অবশ্য উনি আপত্তি করতেন না। জেঠিমাও বললেন যে কুকুর-ছানাটাকে খুব সুন্দর দেখতে ছিল। কেমন দুঃখী-দুঃখী চোখ দুটো। ঠাকুরপোর ঐ-রকম নৃশংস ব্যবহার জেঠিমাও সমর্থন করলেন না। জেঠিমার চোখ ছলছল করে উঠলো।

মা-র দিকে তাকিয়ে রেগে বললেন— "তুই তো বাপু বারণ করতে পারতিস্। আমাকে না-হয় ঠাকুরপো গেরাহ্যি করে না। তোর কথা তো শুনতো। তোকে তো মান্যি করে।"

আলোচনা ঘুরতে-ঘুরতে আমাদের পক্ষেই যেতে লাগলো। জ্যাঠা

বাবু বললেন— "না-হয় ছেলেমানুষরা একটা অন্যায় আবদার করেই ফেলেছিল। তা বলে একদম দড়ি বেঁধে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া ? কুকুর নাকি আসলে ধর্মরাজ।"

এবার জ্যাঠাবাবু উঠে দাঁড়ালেন। অরিন্দমদা'র বাড়ি থেকে কুকুর-ছানা ফেরৎ আনতে চলে গেলেন। কোলে করে ফেরৎ এল কুকুর-ছানা। কাকুকে জ্যাঠাবাবু বললেন— "তোর মেজোবৌদি ওটা রাখতে চায়। তাছাড়া ভাদ্র মাসে কাউকে বাড়ি থেকে বিদেয় করতে নেই। অলক্ষ্মী লাগে।"

ভাইটি আমাকে ঠেলা মেরে বলল—"বাবার কাণ্ডটা দেখলি। পৌষ মাসকে ভাদ্র মাস বলে চালাচ্ছেন।"

কাকুর কাণ্ড ছ্যাখো— পৌষ মাস শেষ হতে চললো, কাকু কি সে-খবর জানে না ? নাকি বড় ভায়ের মুখের ওপর উত্তর করবেন না !

এগারো

আজ আর-একটা শনিবার। গত একসপ্তাহ কেটে গিয়েছে। আমি এদের কর্মব্যস্ত জীবন দেখে-দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই। কোন্ সকালে উঠে যে এরা কাজে চলে যায়, তখনও আমি ঘুমোচ্ছি। খাবার-টেবিলে আমার খাবার সাজানো থাকে। রান্নাঘরে আমার জন্য গরম কফি করা থাকে কফিযন্ত্রে। টেবিলের ওপর চিরকুটে লিখেও রেখে যায় বড়-মাসি —কে কখন ফিরবে, আমি কখন মার্গারেটকে সঙ্গে করে দেখতে বার হব, দিদাকে কী-কী ওষুধ দিতে হবে। দিদা প্রায় সারাদিনই শুয়ে থাকেন। যতটুকু চলাফেরা করেন, তা চান করা আর পুজো করার মধ্যেই আবদ্ধ। কখনও-কখনও ঘরের মধ্যে কিছুটা পাইচারি করেন। আর আমি এসেছি বলে আমাকে দেশের কথা কিংবা একথা-ওকথা জিজ্ঞাসা করেন। ঠামা কেমন আছেন, কাকুর বিয়ে কবে হবে, কিংবা মা সারা-দিন কি করেন।

টুটুলের সারাদিন কাজ। সকালে ও একটা চাকরিতে চলে যায়। বাচ্চাদের নিয়ে কাজ। বাচ্চারা স্কুলের ছুটিতে জন্তু-জানোয়ার, গাছ-পালা এসব সম্বন্ধে ওর কাছে শেখে। একটা পার্কের মধ্যে একটা ঘরে ওরা সবাই মিলে জমায়েত হয়। সেখানে বাচ্চাদের আনা পশু-পাখি

থাকে। তার মধ্যে দু'একটা আহত পশু-পাখিও ওরা রাখে। একটা পাখা-ভাঙা চিল আছে, বুড়ো। কয়েকটা ছোট কচ্ছপ। দুটো সাপ। সাপ দুটোর একটাও বিষাক্ত নয়। আর আছে একটা চামচিকে। তাছাড়া বাচ্চারা নিজেরা নিজেদের বাড়ির পোষা জীব-জানোয়ারও সঙ্গে করে নিয়ে আসে মধ্যে-মধ্যে। যেদিন আমি টুটুলদের ইস্কুল দেখতে গিয়েছিলাম, দেখি একটা মেয়ে তার একটা পোষা-গাধা নিয়ে এসেছে। ওরা সবাই মিলে গাধাটাকে নিয়ে খেলা করছিল। একটা ছেলের নাকি আটটা টিকটিকি আছে। এদেশে টিকটিকি পোষা বেশ কঠিন কাজ। গরম খাঁচায় ওদের রাখতে হয়। পার্কে অনেক কাঠবিড়ালী আছে। মোটা মোটা লোমে ভর্তি কালো-কালো রঙের। কাঠবিড়ালীগুলোর ভয়ডর কম। পার্কের সর্বত্র ওরা স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায়।

বড়মেসো ঘরে পাইচারি করছিলেন। বললেন— "আমি কিন্তু খারাপ শব্দ ব্যবহার করবো। তাতে যদি স্বর্ণ কিছু মনে করে তো আমি নাচার!"

বড়মাসি আমাকে বললেন— "তোর বড়মেসো সারাদিন খারাপ শব্দ ব্যবহার করেন আজকাল। ছিঃ ছিঃ, লোকে শুনলে কী মনে করবে! একটা ভদ্রলোক, অথচ সারাদিন গালাগালি দিচ্ছেন।

গালাগালি অন্য আর কাকে দেবেন বড়মেসো। গালাগালি দেন ভগবানকে। প্রায়ই বলেন—"শালার ভগবান, শালার ভগবান। যা-কিছু সৌন্দর্য, যা-কিছু কামনার, সব শালার ভগবান সাহেবদের দিয়েছেন। আর যা-কিছু দারিদ্র্য, যা-কিছু দৈন্য, যা-কিছু প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অনটন, অঘটন, তা সব দিয়েছেন আমাদের ভারতবর্ষকে। শালাকে যদি একবার হাতে পেতাম!" আবার বলেন, "শালার ভগবান।"

টুটুল বলে— "আমি আঠেরো বৎসরের হলেই দেশে ফিরে যাবো।"

বড়মাসি বলেন— "পড়াশোনাটা শেষ করে তবে ফিরবে দেশে। এখনও অন্তত দু'বৎসর দেরি আছে।"

টুটুল কিন্তু অধৈর্য হয়। আমি যখন নিভৃতে টুটুলকে পাই তখন বলি— "আরে বাবা, তোমরা এই সব-পাওয়ার দেশে থেকে স্বভাব এমন নষ্ট করেছো যে কিছুতেই দেশে ফিরে বেশিদিন থাকতে পারবে না। কেন শুধু শুধু দুঃখবরণ করবো, কষ্ট স্বীকার করবো বলে নিজের মনকে বুজরুকি দাও?"

আমার বাবা সর্বদা বলেন— "এই অবধি তো বেশি দিনের ভালো চাকরি-করা বিদেশের বাসিন্দাদের জন্মের মতো দেশে ফেরৎ আসতে দেখি নি। বেশির ভাগই দেখি, চেষ্টা করে কিছুদিন। তারপর সারা ভারতবাসীদের গালমন্দ করতে-করতে ফিরে চলে যায় ওদেশে। বলে, আমরা ভীষণ অলস। আমরা ভীষণ নোংরা। আমরা গরিবদের ঠকাই। আমরা চাকরিতে, কলেজে, সর্বত্র রাজনীতি করি। অথচ এই আমরাই যখন বিদেশে যাচ্ছি, সবাই নাকি এক-একজন দেবতা বনে যাচ্ছি। সেটা আমাদের দেশের মানুষদের দোষ, না দেশের পরিস্থিতির, কে জানে! অথচ পরিস্থিতি তো মানুষেরই তৈরি।"

কাকু কিন্তু বলেন— "ত্যাখো, প্রথম-প্রথম বড় চাকরি কিংবা আরও টাকার জন্য ভারতীয়রা ওদেশে গিয়েছিল। কিন্তু ওদের ছেলেমেয়েরা এখন সবাই প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ হয়েছে, আমার মনে হয় সেইজন্য এখন ভারতীয় ছেলেমেয়েদের কাছে ভালো বাড়ি, বেশি টাকার মোহ, বেশিদিন টিকে থাকছে না। অনেকেই দেশে ফিরে আসতে চায়। ফিরে এসে ওরা মদত দিতে চায় নিজেদের দেশে। সত্যিই তো যারা সময়ের সঙ্গে চলতে পেরেছে, সাহস করে ওদেশে খাপ খেয়েছে, তারাই ওদেশে থাকতে পেরেছে। তা ছাড়া পেটে অনেক বিদ্যে না থাকলে তো আর ওদেশে ঢুকতে দেয় নি। আমাদের এখানে ভালোমন্দ সব মিলেমিশে আছে। ভালোমন্দ সবাইকে নিয়ে এগোনো কী যে-সে কথা? যেখান থেকে যতটুকুই না কেন আমরা মদত পাই, সবই আমাদের কাজে লাগবে।'

এ-বাড়িটার মালিক যে ভদ্রমহিলা, তার নাম মার্গারেট। তিনি আমাকে নিয়ে ঘুরে বেড়ান দুপুরে। ভদ্রমহিলার বয়স হয়েছে। দুই যমজ মেয়ে, আর-এক পালিত ভারতীয় ছেলে, এই নিয়ে ওঁর সংসার। ভদ্রমহিলা কিছুদিন হ'ল চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। গাড়ি চালিয়ে উনি সারাদিন এর-ওর খবরাখবর নেওয়া, সেবা করা, ইত্যাদিতে সময় কাটান। ওঁর এক চেনা বৃদ্ধার বাড়িতে সোমবার বৃহস্পতিবার গিয়ে ঘরদোর পরিষ্কার করেন, বৃদ্ধার জন্য খাবার তৈরি করে দিয়ে আসেন। বলেন— 'আমি যে দু'দিন ওর রান্না করে দিয়ে আসি, শুধু সেই দু'দিন বেচারা গরম খাবার খেতে পায়। অন্যান্য দিন সব খাবার ঠাণ্ডা খেতে হয়, বরফ আলমারির। তাছাড়া তাঁদের মতো বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের নিয়ে ওঁর

একটা সমিতি আছে। সেই সমিতির সভ্যা উনি। সেই হিসাবেও উনি কখনও-কখনও যারা হাঁটতে পারে না, তাদের ঠেলা-গাড়ী চাপিয়ে কোন কোন দিন চিড়িয়াখানা, কোন দিন লেকের ধার, কোনদিন কোন পার্কে বেড়াতে নিয়ে যান। মার্গারেট বলেন—"আহা, বেচারারা বাড়ির বাইরে গেলে কী-যে খুশী হয়। একটু রোদে বের হবে। একটু মানুষ-জনের মুখ দেখতে পাবে।"

মানুষজনের মুখ দেখার ব্যাপারটা আমিও হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছি। আমরা যে-পাড়াটাতে থাকি সেটা যেন একটা পাষাণপুরী। সুন্দর সুন্দর বাড়ি। চমৎকার সব রাস্তা। চারপাশে বাগান, বড় বড় গাছ, পার্ক। কিন্তু মানুষের মুখ দেখা যায় না একটাও। গাড়ির মধ্যে যা দু'চার জন মানুষের মুখ দেখতে পাওয়া যায়। আর বাচ্চা-কাচ্চাদেরও কমই দেখতে পাই। বাচ্চাদের কচি গলার হাসি কিংবা গল্প তামাশা, কই, দোকান-বাজারে না গেলে, শুনেছি বলে তো মনে পড়ছে না। সোনার কাঠি আর রুপোর কাঠি যেন অদলবদল হয়ে গিয়েছে। সবই আছে কিন্তু আসলটারই যেন অভাব। আমাদের সেই হাওড়ার বাড়ির চার-পাশের ঘিঞ্জি, ভিড়, হল্লা, বাসের হর্ন, সাইকেল-রিক্সার কিড়িংকিড়িং, কুকুরের ঘেউঘেউ, না কিছু নেই সেসব এ-দেশে। মৃত একটা শহর। শুধু প্রাচুর্যে ভরা।

মার্গারেটের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আলাপ হ'ল। ওঁর দুই যমজ মেয়ে। একজন ওঁর সঙ্গে থাকে। মেরী একটা ইস্কুলে পড়ায়। কিছু-দিনের মধ্যেই মেরী বিয়ে করবে। নিজেই রোজগারের টাকা জমিয়ে সেই বিয়ের যোগাড় করেছে সে। কিছু আসবাবপত্র কিনেছে। শোবার খাট, খাবার টেবিল, বরফের আলমারি। কিছু জামা-কাপড়, পর্দা, এসব নিজে সেলাই করে প্রস্তুত করেছে। মার্গারেট ওকে নিজের আগেকার পুরোনো কাঁটা চামচ, একটা গ্যাসের উনুন, আর ওর ঠাকুরমার রেখে-যাওয়া একজোড়া দুল বিয়েতে উপহার দেবে। যে-ছেলেটির সঙ্গে ওর বিয়ে হবে সে-ছেলেটি দেবে নিমন্ত্রণের খরচ। সে একটা গাড়ি কিনেছে। আর ছেলেটির মা দিচ্ছে বিছানার চাদর, বালিসের ওয়াড়, কাঁচের বড় একটা ফুলদানি, আর খুব নাম-করা শিল্পীর আঁকা একটা ছবি।

মার্গারেটের অন্য মেয়ের নাম বেটী। সে আরও দুটি বান্ধবীর সঙ্গে ঘড়ভাড়া করে সহরের অন্য প্রান্তে থাকে। সে এখনও পড়াশোনা

করছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেই পাড়াতেই থাকে। সে মেরীর মতো অত স্বার্থপর কিংবা সংসারী নয়। খানিকটা মা-র মতো স্বভাবের। সারাদিন নিছক কারণে কর্মব্যস্ত। পড়াশোনা ছাড়াও পরোপকার করে অনেক সময়। আমাকে বলেছে, একদিন ওদের বিশ্ববিদ্যালয়টা দেখাতে নিয়ে যাবে। তাছাড়া নিয়ে যাবে এখানকার কলাভবনে। বড় সুন্দর ছবি আঁকে বেটী। আমার একটা ছবি আঁকবে বলেছে। বলেছে, "তুমি চুল খুলে পেছন দিক ফিরে দাঁড়াবে। আর একটা হলুদ রঙের শাড়ি পরবে।"

মার্গারেটের যে ভারতীয় পালিত-পুত্র, তার নাম অর্জুন। সে গত বৎসর ভারতবর্ষে গিয়েছিল। কলকাতা শহরে যেতে পারে নি। আমার কাছে অর্জুন কলকাতার গল্প শোনে। বলে, টুটুল তো কলকাতার খবর দিতে পারে না। তুমি আমাকে বলো, কতটা দারিদ্র্য সেখানে? বম্বের থেকেও বেশি? কতটা নোংড়া ও-শহরটা? পুরোনো দিল্লীর থেকেও বেশি?

অর্জুন আর টুটুল দেশে ফিরে যাবে। ওরা জল্পনা কল্পনা করে। বলে— "আসল সমস্যা আমাদের পেট নিয়ে। ওদেশে গেলেই আমাদের পেট খারাপ হওয়া শুরু হয়। এই সমস্যাটা যদি জয় করতে পারি, তো আর-কিছু নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না।"

অর্জুন ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশের ছেলে তা সে নিজেও জানে না। লম্বা চওড়া চেহারা ওর। আমি বলি— "কে জানে! তুমি হয়তো পাঞ্জাবী।" অর্জুন বলে— "যেটা জানা যাবে না, সেটা জানার জন্য আমি ব্যস্তও নই। আমি ভারতীয়, সেটাই আমার বড় পরিচয়। দক্ষিণ-ভারতীয়, না, উত্তর-ভারতীয়, না পশ্চিম-ভারতীয়— আমার তাতে যায় আসে না।" মার্গারেটের স্বর্গীয় স্বামী যখন আফ্রিকার উগাণ্ডা দেশে ডাক্তারি করতেন, তখন এক দাঙ্গার মধ্যে মার্গারেট অর্জুনকে এক হাসপাতালে আহত অবস্থায় আবিষ্কার করেছিলেন। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে অর্জুনকে ওঁরা পোষ্য হিসাবে দেশে নিয়ে ফিরেছিলেন। অর্জুন তখনো খুব ছোট। কথা বলতে পারতো না। অর্জুনের নামকরণও মার্গারেটের স্বামী করেছিলেন। বলেছিলেন যে, "আমি শুনেছি যে অর্জুন ভারতীয় মহাকাব্যের মহানায়ক। আমাদের অর্জুনও বড় হয়ে ওর দেশের মহানায়ক হবে।" অর্জুনকে যে দেশে ফিরে যেতে হবে, সেই

মহামন্ত্র উনিই অর্জুনের কানে-কানে শুনিয়ে গিয়েছিলেন। মারা যাবার আগেও বলে গিয়েছিলেন—"তুমি আমাদের কাছে গচ্ছিত সম্পত্তি। ঋণ হিসাবে এনে রেখেছি। সময় এলে তুমি দেশে ফিরে যাবে। তোমার কর্মক্ষেত্র তোমার দেশে, ভারতবর্ষে, এ-দেশে না।"

টুটুল আর অর্জুন জল্পনা কল্পনা করে। আমাকে দলে টানতে চেষ্টা করে। বলে—"আমরা কর্মজগতের মানুষ। কর্মজগৎটাই হচ্ছে আসল জগৎ। তোমাদের চিন্তাজগৎটা আমাদের কর্মজগতের ঘাড়ে বসে পর-গাছার মতো আমাদের শোষণ করছে। তুমি নেমে এসো তোমার মিথ্যে সিংহাসনের ওপর থেকে। এসো, আমাদের মেহনতী হাতে হাত মেলাও। তুমি তো নিজেই বলো, মানুষ অনেকটা হাতের অবদান। তবে আর হাত দিয়ে কাজ করতে ভয় কেন? মাথা দিয়ে বেশি দূর কাজ এগোয় না। উল্টে আকাশকুসুম রচনা করা ছাড়া আসল কিছু হয়ে ওঠে না। তুমি এসে আমাদের সঙ্গে হাত মেলাও। তুমি ভাইটিকে দেখে শেখো।"

তবু আমি প্রাণের মধ্যে জানি যে, আমি নেহাত ভারতবাসী না। আমি নেহাত কোন দেশের মধ্যে আবদ্ধ নই। আমারপ্রথম পরিচয় যে, আমি মানুষ। আর সেই পরিচয়ের ইতিহাস আমাকে নিজেই রচনা করে নিতে হবে। তা আমাকে যদি তার জন্য আফ্রিকা থেকে হেঁটে দক্ষিণ-আমেরিকা অবধি যেতে হয় তা আমি তাতেও রাজী। আমার পরিচয় জাতীয়তাতে সীমাবদ্ধ নয়। আমি আন্তর্জাতিক। "আমি লুসির উত্তরপুরুষ।"

বারো

টুটুল বলে— 'আচ্ছা, স্বর্ণ, আমার শেষ অবধি কী দশা হবে বল দেখি? আমি যে শুধু লম্বাই হয়ে চলেছি, শেষ অবধি আমি কি আকাশ অবধি পৌঁছুবো? কী যে করি জানি না।"

আমি বললাম— "হ্যাঁ, যখন সরকারি দূরদর্শনে তোমাকে মহা সমাদরে ভারতবর্ষে চাকরি দেবে। আর আমাদের আবহাওয়া জানবার জন্য ইন্স্যাট এ বি (Insat A B)-র প্রয়োজন থাকবে না। তুমি একটু ভালো মতন ডাইনে-বাঁয়ে তাকিয়েই বলে দিতে পারবে যে 'আজ

আমাদের আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হচ্ছে যে ভারতবর্ষের দক্ষিণে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ মেঘাচ্ছন্ন থাকবে, উত্তর-পূর্বে অরুণাচলে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে, উত্তরে কাশ্মীরে··· ।"

টুটুল বলে— "ইয়ার্কি না। আমি রীতিমতো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।"

আমরা সবাই বাগানে বসে ছিলাম। রবিবারের দুপুর। সুন্দর একটা গরম রোদ-ঝলমলে দিন। চারপাশে নীল প্রসারিত আকাশ। সবুজ গাছে দিগন্ত ঘেরা। একটা বড় বাদামগাছের নিচে চাদর পেতে আমরা দ্বিপ্রহরের ভোজন আরম্ভ করলাম। বরফের টুকরো দেওয়া আনারসের সরবৎ খেতে-খেতে চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম, রকমারি খাদ্যসামগ্রীর আয়োজন। সব-কিছুর নামও জানি না ছাই! গাছে-গাছে ফল। নিচে খেত-ভরা আনাজ। রঙ-বেরঙের ফুলের সমারোহ। একটা জংলী তিতির খালটার ওপারে মাটি খুঁটে-খুঁটে কী যেন খেয়ে বেড়াচ্ছে। ওটাকে আমি রোজ দুপুরেই দেখি। দেখলে মনে হয় না যে, মানুষজনকে দেখে ও ভয় পায়। আমিও মনে-মনে বড়মেসোর মতো বললাম, "শালার ভগবান"।

বড়মাসি টুটুলের দিকে তাকিয়ে বললেন— "তুমি দেখতে পাচ্ছি আজকাল মাঝে-মাঝেই লম্বা হয়ে যাচ্ছ বলে হা-হুতাশ করছো। মনে হয় এর মধ্যে দুটো ব্যাপার আছে। প্রথমত, তুমি এ-দেশে জন্মেছো। এ-দেশের খাদ্য পুষ্টিকর। তাছাড়া এ-দেশে ভালো স্বাস্থ্যের জন্য ছেলেমেয়েদের খেলাধুলোর আর ব্যায়ামের ব্যবস্থাও খুব সুন্দর। উত্তর-আমেরিকাতে কয়েক-পুরুষ থাকলে অনেকের মধ্যেই উচ্চতার বৃদ্ধি হয়। আফ্রিকা থেকে যেসব কালো মানুষ এদেশে এসেছিল তাদের মধ্যে দেখা যায় যে কয়েক পুরুষ ধরে এ-দেশে যারা থেকেছে তাদের উচ্চতা দেশে-থাকা আফ্রিকার— সমগোষ্ঠিদের থেকে বেশি। হয়তো তোমারও তাই হয়েছে, যদিও এটা তুমি তোমার বাবার সূত্রেও পেয়ে থাকতে পারো। কে জানে! তাছাড়া ভারতীয়রা এদেশে এখনও বেশি পুরুষ ধরে আসে নি যে জানা যাবে উত্তর-আমেরিকায় ভারতীয়রাও আফ্রিকার কালো মানুষের মতো বেশি লম্বা হয়ে যাবে কিনা। প্রকৃতিতে কিন্তু মেয়েদের মধ্যে ছেলেদের থেকে বড় হওয়া কোন-একটা ব্যতিক্রমের কথা না। বরং সেটাই সাধারণত নিয়ম। জীব-জানোয়ারদের মধ্যে সাধারণত মেয়েরাই বড় হয়।

টুটুল আগ্রহী হয়ে বলল— "সত্যি বলছো মা ?"

আমি বললাম— "এটার কি কোন কারণ আছে ?"

বড়মেসো চাদরের ওপর চোখে চশমা এঁটে ঘুমোচ্ছেন। হয়তো স্বপ্ন দেখতে সুবিধা হয়। বড়মাসি খাবার জিনিসগুলো গোছাতে-গোছাতে বললেন— "সৃষ্টিতে মেয়েরা কেন বড় হয় সেটা বুঝতে হলে বুঝতে হবে সৃষ্টিতে মেয়েদের বিশেষ কাজ কোন্‌টা। মেয়েদের বিশেষ কাজ সেইটাই, যে, মেয়েরা বাচ্চার জন্ম দেয়। বাচ্চার জন্ম দেবার সঙ্গে মেয়েরা যুক্ত আছে বলে সৃষ্টিতে সাধারণত মেয়েদের আয়তন বড় হয়।"

বড়মাসি বলে চললেন— "একটা বাচ্চার জন্ম হয় কি করে ?"— বলে নিজেই উত্তর দিলেন— "একটা বাচ্চার জন্ম হয় একটা ডিম্বকোষ আর একটা শুক্রকোষের মিলনে। মা দেয় ডিম্বকোষ। বাবা দেয় শুক্র-কোষ। শুক্রকোষটা আসলে একটা মোড়ক। ছোট্ট একটা মোড়ক যাতে করে শুধু খানিকটা ডি এন এ সরবরাহ করা হয়। ডি এন এ কী-জিনিস— সেটা এখনই আমি উত্তর দেব না। পরে সুবিধা হলে বুঝিয়ে বলবো।"

ডি এন এ সৃষ্টিতত্ত্বের একটা গভীর তত্ত্ব। বড়মাসি বললেন— "সেকথা থাক।" তারপর বলতে থাকলেন, "শুক্রকোষ যেমন শুধুমাত্র কিছুটা ডি এন এ-র মোড়ক মাত্র, ডিম্বকোষ কিন্তু শুক্রকোষের মতো ডি এন এ-র মোড়ক ছাড়াও অতিরিক্ত আরও কিছু। ডিম্বকোষে খানিকটা খাবার সঞ্চয় করা থাকে। শুক্রকোষ তৈরি করবার জন্য বাবার শরীরকে যতটা মেহনত করতে হয় তার থেকে অনেক বেশি মেহনত করতে হয় ডিম্বকোষ তৈরি করবার জন্য মা'কে। পাখিদের মধ্যে এমনও ঘটে যে, একটা পাখির ডিম পা খিটার ওজনের চার ভাগের এক ভাগ। এটা থেকেই বুঝতে পারবে যে বাচ্চা সৃষ্টির ব্যাপারে মা'র অবদান বাবার থেকে বেশি।

"প্রথম দিককার প্রাণী ছিল মাছ। তারপর উভচর। এদের ডিম্বের চারপাশের খোলসটা হয় নরম। এই নরম খোলস ভেদ করে শুক্রর পক্ষে ডিম্বর সঙ্গে মিলন হওয়া কোন কঠিন ব্যাপারই নয়। মা-মাছ ডিম্ব ছেড়ে যাবে জলের পাশে পাশে। পুরুষ-মাছও ঘুরে-ঘুরে শুক্র ছেড়ে যাবে জলের পাশে-পাশে। বাতাসে দুলতে-দুলতে ওরা এক জায়গায় গিয়ে পৌছোয়। শুক্র তার সরু মুখ দিয়ে ডিম্বর নরম খোল ভেদ করে

ভিতরে প্রবেশ করে। শুরু হ'ল একটা নতুন মাছের জন্ম।

"কিন্তু যেহেতু জলের ওপর নির্ভরশীল এদের বাচ্চারা, মাছ আর উভচর জলের পাশ থেকে নড়তে পারে না। ওরা জলে-বদ্ধ প্রাণী। বাচ্চা সৃষ্টির তাগিদে। কিন্তু পৃথিবীতে তো শুধু তিন ভাগ জল। এক-ভাগ স্থলের কী হবে? তাহলে কি বলতে হবে ডাঙা জমি পড়ে থাকবে খাঁ-খাঁ? কোনও প্রাণীর অগম্য স্থান? কিন্তু সৃষ্টিতত্ত্বে তো তা হবার জো নেই। ডাঙা জমিতে কত গাছপালা। পোকামাকড়। এককোষ প্রাণী, বীজাণু। এরা সব খাদ্য। তাহলে কি সেখানে খাদকের উদ্ভব হবে? না। খাদ্য থাকলে খাদ্য বিফলে যায় না। সেখানে খাদকের উদ্ভব হবেই হবে। সৃষ্টিতত্ত্বে কিছুই অতিরিক্ত হয় না। ফেলা যায় না।

"কিন্তু জলের বাইরে জন্ম কি করে হবে? জলের বাইরে জমিতে সূর্যের প্রখর তাপ। শুক্‌নো হাওয়া বইছে। সেখানে ডিম্ব ত্যাগ করা মানেই, ডিম্বের নরম খোলসের আবরণ ভেদ করে সূর্যের তাপ, শুক্‌নো হাওয়া ভেতরে প্রবেশ করে ডিম্বকে শুকিয়ে কাঠ করে ছাড়বে। ডিম্বই যদি মরে গেল তো সৃষ্টি হবে কী করে! আবার অন্যদিকে, ডিম্বের ওপরে যদি খোলসটা শক্ত হতে শুরু করে তাহলে সেই শক্ত খোলসের আবরণ ভেদ করে শুক্র ডিম্বের ভিতরে প্রবেশ করবে কি করে?

"কিন্তু তার আগে কতকগুলো মজার মজার কথা বলি।" বড়মাসি টুটুলের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন— "তোর শ্রাবণীমাসিকে মনে পড়ে?" টুটুল বলল—"খুব মনে পড়ে। ঠিক ব্যাটাছেলের মতো দেখতে শ্রাবণীমাসিকে। তাই না মা?"

বড়মাসি বললেন— "বেচারা শ্রাবণী। ওর এক আমেরিকান বন্ধু ছিল। ডন তার নাম। একদম পাগলা ছিল ছেলেটা। ও কাজ করতো ব্যাঙ-এর ওপর। অর্থাৎ কি না, উভচরের ওপর। কতরকম প্রণালীতে ব্যাঙ-এর বাচ্চা হয়— সে-ই ছিল ডনের বিষয়। ব্যাঙের ওপর কাজ করবার জন্য ডন যায় দক্ষিণ-আমেরিকায়। ঘন কাদা প্যাচপেচে জঙ্গলে। শ্রাবণী যেত ওর সঙ্গে। বিরাট-বিরাট রবারের হাঁটু-অবধি জুতো পরে কাদায় প্যাচপ্যাচ করে সারাদিন ঘুরে বেড়াতো ওরা দু'জনে জঙ্গলে। শ্রাবণীর কাঁধে থাকতো ক্যামেরার সরঞ্জাম। গভীর জঙ্গলের মধ্যে, গাছ থেকে টপটপ করে জল পড়ে অবিশ্রান্ত। গাছে ঝুলে থাকে মাকড়সার জালের মতো সব শ্যাওলা। সাপখোপ, পোকামাকড়, টপটপ করে

গায়ে পড়ে। ঐ গরমে বর্ষাতি, টুপি আর জুতো। আর ঐ বিরাট ভারি ক্যামেরা। মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর দু'জনে ব্যাঙের খোঁজে হেঁটেছে। তারপর একদিন বিরক্ত হয়ে শ্রাবণী ঠিক করলো ডন-এর সঙ্গে ওর ভবিষ্যতে ঘর করা সম্ভব না। সারাদিন জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরবে কে? ও বিয়ে করলো ভাস্করকে।"

টুটুল বললো— "কিন্তু মা, আমার মনে হয় না শ্রাবণীমাসি সুখী হয়েছেন। ভাস্করমেসো তো শুধু টি-ভির সামনে দিবারাত্র বসে আছেন আর বাদাম, বিস্কুট, আলুভাজা, ভুট্টার খই— সারাদিন সেসব খাচ্ছেন। কী মোটা, মনে আছে তোমার ভাস্করমেসোকে?"

বড়মাসি বললেন— "সত্যিই তাই। শ্রাবণী মনে হয় না সুখী হয়েছে। অবশ্য ডনকে বিয়ে করাও অসম্ভব ছিল। ...ব্যাঙদের যে কত-রকমভাবে বাচ্চা হয়! যতদিনে ব্যাঙের জন্ম হয়েছে, ততদিনে জল ভরে গিয়েছে নানারকম প্রাণীতে। খাদ্য-খাদকের সেখানে প্রচণ্ড সংগ্রাম। তাই ব্যাঙ গেল ডাঙাজমিতে চরে বেড়াবে বলে। কিন্তু বাচ্চা হবার বেলায় কী হবে! সেই তো জলে ফিরে আসতে হবে বেচারাকে। কিন্তু জলে ওদের ডিম কে-না-কে খেয়ে নেবে কে জানে, ডাঙাতেও বহু বিপদ। নরম খোলার ডিম— কীট-পতঙ্গ সবাই খেয়ে নেবে। ডাঙায় তখনও বড় প্রাণীর পত্তন হয় নি। কিন্তু কীট-পতঙ্গ, বীজাণু, এককোষ-প্রাণী, কীট-পতঙ্গর বাচ্চারা অর্থাৎ শূক কীট— সব ছিল। তাদের ব্যাঙের ডিম খাবার মতো পেটে খিদেও ছিল।

"উভচররা সাধারণত সর্বভুক। যখন তারা ডাঙার পত্তনি প্রথম শুরু করেছিল, ওরাই তখন ছিল একমাত্র বড় আয়তনের খাদক। তখনও তো ডাঙায় না ছিল সরীসৃপ, না পাখি, না স্তন্যপায়ী। অনেক উভচরের দাঁত আছে। তবে সে-দাঁত চিবিয়ে খাদ্যকে নরম করে খেতে সাহায্য করে না। সে-দাঁত শুধু খাদ্যকে দাঁত দিয়ে কামড়িয়ে গিলে খাবার মতো উপযুক্ত। উভচরের চোখ মাছের চোখের মতো গড়নের। তবে ওরা শুধু জলের মধ্যে দিয়ে না— বাতাসের মধ্যে দিয়েও দেখতে পায়। চোখের মণিটা পরিষ্কার রাখার জন্য চোখের পাতার সৃষ্টি হওয়া শুরু হ'ল। চোখের পাতা টেনে-টেনে সে চোখের মণি পরিষ্কার করে। মাছ জলের মধ্যে মিশ্রিত অক্সিজেন নেয়। উভচরদের হাওয়া থেকে অক্সিজেন নিতে হয়। সে-সব তো তোমরা ইস্কুলে পড়েছো। কিন্তু মাছ আওয়াজ

শোনে জলের ঢেউয়ে-ঢেউয়ে। হাওয়ার মধ্যে দিয়ে শুনবার জন্য কানের পর্দার প্রয়োজন। আর মাছেরা শব্দ করে না। কিন্তু ব্যাঙের চিৎকার—সে যে কী প্রচণ্ড হতে পারে তা সবাই যারা ব্যাঙের ডাক শুনেছে তারা জানে।"

আমি বললাম— "কিন্তু তুমি তো বাচ্চা হবার কথা বলবে বলছিলে। ডনের কথা।"

বড়মাসি বললেন— "তাই তো। কী বলতে গিয়ে কী বলছি। বেশির ভাগ ব্যাঙের স্ত্রী পুরুষ জলের কাছে আসে বাচ্চার জন্ম দিতে। বেশির ভাগ ব্যাঙের জন্মই ব্যাঙাচির মাধ্যমে। খুব কমই ব্যাঙ আছে যাদের বাচ্চারা প্রথমেই ছোট ছোট ব্যাঙ হিসেবে জন্মগ্রহণ করে।

"যেসব ব্যাঙদের ডিম্ব আর শুক্রের জলে মিলন হয়, তাদের একটা বিরাট ভয় থাকে যে, অন্যান্য জলের প্রাণী কিংবা জলের ধারের প্রাণী ওদের খেয়ে নেবে। খোলসগুলো তো ওদের নরম। অনেক ব্যাঙ সেজন্য বহু বহু ডিম পাড়ে। ধরো, বিশ হাজারটা ডিম পাড়লো কোন কোন ব্যাঙ। একটা না একটা তো তার মধ্যে বেঁচেই যাবে।

"এক রকমের ব্যাঙ আছে যে অল্প কয়েকটা ডিম পাড়ে, আর তার পর তাদের পাহারা দেয়। যেমন, পিপা (Pipa toad) ব্যাঙ, এদের মেয়েরা ডিম্ব ত্যাগ করলে পুরুষ তার সঙ্গে তক্ষুনি শুক্রের মিলন ঘটায়, আর তখুনি পুরুষটি এই প্রাণবন্ত ডিম্ব (fertilised eggs) কুড়িয়ে নিয়ে মা-ব্যাঙের পিঠের ওপর ডিমগুলো বুলিয়ে বুলিয়ে দেয়। প্রাণবন্ত ডিমগুলো মা-র পিঠে লেপটে-লেপটে দেবার পর মা-র পিঠের ওপর ডিমগুলো ঢেকে একটা পর্দার সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে ডিমগুলো থাকে চব্বিশ দিন। চব্বিশ দিন বাদে বাচ্চাগুলো মা-র পিঠের পর্দা ফুটো করে একে-একে বেরিয়ে এসে জলে সাঁতার কেটে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নেয়।"

তেরো

বড়মাসি বললেন— "একটা কথা তোমাদের এখানে বলি: ডিম্বকোষ অর্থাৎ ডিম্ব একটা জীবন্ত জিনিস। কিন্তু ডিম্বর আয়ু খুব কম, শুক্রের মিলনে তারপর সে বেঁচে থাকতে পারে একটা পুরো-জীবন।

ডিম্ব আর শুক্র মিলবার পর যে-প্রাণটার সৃষ্টি হয় সেটা হতে পারে একটা প্রাণবন্ত ডিম্ব। —যেমন, আমরা একটা সাপের, একটা পাখির ডিম দেখতে পাই। তাছাড়া ডিম্ব আর শুক্র মিলে একটা প্রাণী, তা ব্যাঙাচি, ব্যাঙ যা-ই হোক না, তারও জন্ম হতে পারে। এসব যখন বলছি তখন সর্বদা মনে রাখবে যে ডিম্ব আর প্রাণবন্ত ডিম্ব দুটো আলাদা জিনিস। প্রাণবন্ত ডিম না বলে আমি বলব ডিম।"

বড়মাসি বললেন— "তারপর যা বলছিলাম। এক ধরনের ব্যাঙ আছে যারা তাদের বাচ্চার জন্য নিজস্ব, স্বতন্ত্র পুকুর আবিষ্কার করে যার মধ্যে তারা তাদের বাচ্চাদের অন্যান্য খাদকদের থেকে দূরে রেখে বড় করে। অনেক জঙ্গলে বড় বড় শাঁসালো নরম কচু গাছের মতো গাছ হয়। এসব গাছের কাণ্ড আর পাতার জোড়ার মুখে মুখে ধরা থাকে খানিকটা করে জল। কোন মাছ সেখানে বেয়ে উঠে ব্যাঙাচি খেয়ে নিতে পারবে না। ব্রেজিল দেশে (Brazil) একরকম ব্যাঙ আছে ডোবার ধারে ধারে মাটি তুলে ছোট্ট ছোট্ট নিজস্ব জলের কুঁজোর মতো তৈরি করে সে তার মধ্যে বাচ্চাদের রেখে দেয়।

"উভচররা ভাবলো যে জলের মধ্যে বাচ্চাগুলোর বেঁচে থাকা কঠিন। কিন্তু জলের বাইরে ওদের ডিম বাঁচবে কি করে? শুকিয়ে যাবে তো। তা ছাড়া, ব্যাঙাচিগুলো যখন ডিম থেকে বার হবে তাদেরও তখন জল চাই। তাহলে? ইউরোপে এক ধরনের ব্যাঙ আছে (Midwife Toad), তারা ডাঙাতে ডিম্ব ত্যাগ করে শুক্রর সঙ্গে মেলায়। তারপর মিনিট পনেরোর মধ্যে ওদের পুরুষরা যেন সুতোতে বাঁধা তেমন ক'রে বাঁধা লম্বা একটার পর একটা ডিম পায়ের সঙ্গে ঘুঙুরের মতো বেঁধে নিয়ে ঘুরে-ঘুরে বেড়ায়। যখনই ডিমগুলো শুকিয়ে আসে, তখনই সে গিয়ে জলের মধ্যে পা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর যখন ডিম থেকে বাচ্চা বেরোবার সময় হয়, তখন সে জলের ধারে গিয়ে ডিমগুলো ছেড়ে দেয়। সেখানে সে ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে যতক্ষণে ব্যাঙাচি-গুলো ফুটে বের হয়। তারপর ও নিজের কাজে নিজে চলে যায়।

"দক্ষিণ-আমেরিকার বিষাক্ত ব্যাঙ (Poison Frogs)-এর ডিম-গুলো ভেজা মাটিতে ওরা ত্যাগ করে। তারপর পুরুষ-ব্যাঙ ডিম-গুলোকে বসে পাহারা দেয়। ব্যাঙাচিগুলো জন্মেই বাবার পিঠে সোওয়ার হয়ে বসে। বাবাও পিঠ থেকে পিছল-পিছল রস ক্ষরণ করে

বাচ্চাগুলোকে ভিজিয়ে রাখে আর সেঁটেও রাখে পিঠের সঙ্গে।

"শ্রাবণীরা একবার আফ্রিকাতে গিয়ে কতকগুলো গেছো-ব্যাঙের (Tree Frogs) ছবি তুলে এনে আমাকে দেখিয়েছিল। এরা জলের ওপর ঝুলে আছে এমন ডালে, ডিম্ব শুক্রর মিলন ঘটায়। তারপর মা তার শরীর থেকে খানিকটা তরল পদার্থ ক্ষরণ করে। মা আর বাবা সেই তরল পদার্থটা ফেটিয়ে-ফেটিয়ে খানিকটা সাবানের ফেনার মতো একটা গোলক তৈরি করে। আর সেই ভেজা গোলকের মধ্যে অদৃশ্য-ভাবে ডিমগুলোকে লুকিয়ে রাখে। অনেক জাতের মধ্যে আবার ফেনার বাইরের আবরণটা শুকিয়ে শক্ত হয়ে যায় আর ভেতরে ভেজা ফেনার মধ্যে সযত্নে রক্ষিত হয়ে থাকে ডিম। মা-ব্যাঙেরা নিয়ম করে নিচে জলের মধ্যে ডুবে ডুবে শরীরের মধ্যে জল আহরণ করে ডালের ওপর এসে মূত্রাকারে তা ত্যাগ করে সাবানের ফেনাটাকে ভিজিয়ে দিয়ে যায়। ডিম ফুটে ব্যাঙাচিরাও ঐ ফেনার মধ্যেই বাস করে। তারপর একদিন ফেনার গোলকের নিচটা গলে গলে যায়, আর ডাল থেকে টুপ টুপ করে জলের মধ্যে এসে পড়ে ব্যাঙাচিগুলো।

"কতকগুলো ব্যাঙের অবশ্য সোজাসুজিই ব্যাঙ-বাচ্চা হয়। যেহেতু ব্যাঙাচিরা নিজেরা নিজেদের আহার সংগ্রহ করে, যেসব ব্যাঙের ডিম থেকে ব্যাঙাচি ফোটে তাদের মা-ব্যাঙদের অনেক বেশি খাদ্য ডিম্ব অবস্থায় জোগান দিতে হয় না। সুতরাং এসব মা-ব্যাঙদের পক্ষে অনেক ডিম্ব ত্যাগ করা কঠিন না। কিন্তু যেসব ব্যাঙের ব্যাঙাচি না হয়ে সোজাসুজি বাচ্চা তৈরি হয় তাদের ডিম্বতে অনেক খাদ্যের জোগান রাখতে হয়। সেইজন্য এসব ব্যাঙের মায়েদের বেশি বাচ্চা জন্মায় না। এক ধরনের ব্যাঙ আছে (Whistling Frog) যাদের মাত্র এক ডজন ডিম হয়। ডিম থেকে বাচ্চা ফুটতে লাগে কুড়ি দিন। যেহেতু এদের ব্যাঙাচি হিসাবে জন্মাতে হয় না, এরা ডাঙা জমিতেই জন্মাতে পারে। কিন্তু সবচাইতে অবাক লাগে দক্ষিণ-আমেরিকার এক ব্যাঙের কথা শুনে (Gastrotheca)— এদের মেয়ের পিঠে জন্ম থলি থাকে। ডিম্ব আর শুক্রর মিলনের পর পিঠের ওপর ঐ জন্ম-থলিতে ধরে রাখা হয়। কুড়ি দিন ধরে ওরা ওখানে থাকে। একসঙ্গে থাকে প্রায় দু'শো ডিম। এদেরই এক জাতের মধ্যে মোটে কুড়িটা ডিম জন্ম-থলিতে থাকতে পারে। তাদের ডিম্বে খাদ্য বেশি থাকে। তারা সরাসরি ব্যাঙ

হয়ে জন্মায়। ব্যাঙাচি হতে হয় না। ব্যাঙগুলোর জন্মের পর মা পা দিয়ে পিঠ থেকে ওদের টেনে-টেনে বের করে আনে।

"দক্ষিণ-আমেরিকাতে আর-এক রকম ছোট ছোট ব্যাঙ আছে (Rhinoderma)। ভেজা মাটির উপর ডিমগুলো ঘিরে বাবারা পাহারা দেয়। ডিমের নরম খোলের মধ্যে যেই ব্যাঙগুলো নড়াচড়া শুরু করে ফুটে বের হবার সময় হয়, তখনই বাবারা নিচু হয়ে এমন ভাব করে যেন বাবারা সব ডিম খেয়ে নিল। কিন্তু আসলে ডিমগুলো ওদের গলার মধ্যে থলিতে থাকে। সেখানেই তারা বড় হয়। তারপর একদিন দেখা যায় যে বাবারা যেন হাই তুলছে আর মুখের মধ্যে থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে নামছে পুরোদস্তুর গোটা-গোটা ব্যাঙের বাচ্চা।

"কিন্তু সব থেকে যেসব ব্যাঙ প্রায় স্তন্যপায়ীর মতো ব্যবহার করে, অর্থাৎ কিনা, মা নিজের শরীরের পুষ্টি দিয়ে বাচ্চার শরীরটাকে নিজের শরীরের মধ্যে বড় করে, তাদের পাওয়া যায় পশ্চিম-আফ্রিকাতে (Nectophrynoides)। যখন বৃষ্টি আসে তখন দলে-দলে এ-জাতের ব্যাঙ পাথরের নিচে থেকে বার হয়ে আসে। মায়ের শরীরে শুক্র প্রবেশ করে ডিম্বকে প্রাণবন্ত করে। মায়ের শরীরের মধ্যে ডিমগুলো তারপর বৃদ্ধি পায়। যখন ব্যাঙাচিগুলো জন্মায় তারা তখন মা-র শরীরের মধ্যে যে গুঁড়ো গুঁড়ো সাদা জিনিস শরীরের মধ্যেকার দেওয়াল দিয়ে ঝরে ঝরে দুধের মতো পড়ে, সেগুলো খেয়ে ন'মাস মা-র শরীরের মধ্যে বেঁচে থাকে। তারপর আবার যখন বর্ষা আসে তখন মা বাচ্চাদের জন্ম দেয়। এসব ব্যাঙদের শরীরের মধ্যে কোন পেশী নেই— যেগুলো দিয়ে ঠেলে-ঠেলে মা বাচ্চার জন্ম দিতে পারবে। বাচ্চার জন্ম দেবার জন্য মাকে শরীর ফুলিয়ে-ফুলিয়ে ফুসফুসটাকে বড় করতে হয় শরীরের ভেতর, যাতে করে ফুসফুসের ঠেলা খেয়ে বাচ্চাগুলো ধাক্কাতে বেরিয়ে আসে।

"মধ্য-আমেরিকার মরুভূমির মধ্যে ব্যাঙের থাকার কারণ নেই। কারণ, মরুভূমিতে জল কোথায়? কিন্তু সেখানেও ব্যাঙ থাকে। দু-এক দিনের জন্য হঠাৎ বর্ষা এসে ছোট ছোট খানার সৃষ্টি হয়। ঠিক সেই সময় পাওয়া যায় অঢেল কীট-পতঙ্গ। এক ধরনের ব্যাঙ (Cyclorana) ঐ জলে ডিম পাড়ে। সেখান থেকে রাতারাতি ব্যাঙাচি জন্মায়। মরুভূমিতে জল শুকিয়ে যেতে সময় লাগে না। তার মধ্যে ব্যাঙ, ব্যাঙাচি জল টেনে নেয় যে যার শরীরের ভেতর চামড়ার মধ্যে দিয়ে যতক্ষণ না

সবাই এক-একটা ফোলা গোল ধরনের জীবের মতো আকৃতি ধারণ করে। তারপর তারা ভেজা মাটির নিচে ঢুকে পড়ে। সেখানে গিয়ে যে যার শরীর থেকে একটা করে পর্দার আবরণের সৃষ্টি করে। দেখলে মনে হবে প্লাসটিকের একটা করে মোড়ক। এই মোড়ক ভেদ করে জল শুকোবে না। অবশ্য নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে কিছুটা জল শুকোয় বৈ কি। এরকম করে কখনও-কখনও দু'বৎসরও সে থাকতে পারে। কে জানে, পরের বৎসর বৃষ্টি না-ও আসতে পারে। মরুভূমি বৈ তো নয়!"

এতক্ষণে বড়মেসো ঘুম ভেঙে চোখ খুলে হঠাৎ বড়মাসিকে জিজ্ঞাসা করলেন—"শ্রাবণী এসেছিল না? আমাকে ঘুম থেকে ডাকলে না কেন? কতদিন মেয়েটাকে দেখি নি। একটা অলস লোককে বিয়ে করে বেচারীর জীবনটা গেল। কত হাসিখুশি ছিল মেয়েটা। অট্টহাস্য করে হাসতে পারতো। আমেরিকা, আফ্রিকা করে বেড়াতো। আর এখন দেখ সারা-দিন রান্নাঘরে রাঁধছে আর অপদার্থ বরটাকে খাওয়াচ্ছে।"

তারপর বড়মেসো হঠাৎ বড়মাসির দিকে তাকিয়ে বললেন—"তা বেচারা শ্রাবণীকে আর কী করে দোষ দেওয়া যায়। ব্যাঙের ছবি তুলতে-তুলতে বেচারা তিতিবিরক্ত হয়ে গিয়েছিল। যে-বার শেষমেষ ডনকে ও ত্যাগ করলো সে-বার ওরা গিয়েছিল আফ্রিকাতে। নীল নদের তীরে ছবি তুলবে বলে। গভীর রাত্রি। ক্যামেরা নিয়ে ওরা বড়-বড় টর্চ জ্বালিয়ে ব্যাঙ খুঁজে বেড়াচ্ছে। আর তখন হঠাৎ শ্রাবণী দেখে কী, ইয়া বড় এক কুমির। তার পিঠে সে পা ফেলেছে। সেই যে আর্তনাদ করে আফ্রিকা ছাড়লো, আর ও জীবনে ব্যাঙ শিকারে যায় নি। এখন নিজেই বেচারা গজকচ্ছপ ভাস্করের শিকার হয়ে বসে আছে।"

চোদ্দ

চা করে এনে বড়মেসো দিয়ে গেলেন। দুপুর গড়িয়ে বিকেল এসেছে। আকাশে ভেসে ভেসে যাচ্ছে পাল তোলা মেঘ। একটা পাখি চিক্-চিক্ করে ডাকছে, আপেল গাছে দোল খেতে-খেতে। আমি বললাম—"বড়মাসি, টুটুল কেন লম্বা হয়েছে, প্রাণীদের মধ্যে সাধারণত মেয়েরা কেন বড় হয়, তুমি কিন্তু সেটা না বলে ব্যাঙের মহাভারত শোনালে।"

বড়মাসি বললেন—"আজকে বেশ একটা ছুটির দিন। তাই না

রে ? বেশ লাগছে শুয়ে থাকতে। কতদিন-যে একটু বিশ্রাম করি নি। বেশ লাগছে। তাই না রে ?"

টুটুল বলল— "তুমি একটু বিশ্রাম করো না মা। কতদিন আমরা এইরকম একসঙ্গে শুয়ে-বসে গল্প করি নি। রাত্রে তোমাকে আজ রান্না করতে হবে না। আমি ফোনে রেস্টুরেন্ট থেকে খাবার দিয়ে যেতে বলবো। কাল মোটে মাইনে পেয়েছি। তোমাদের খাওয়াবো।"

বড়মাসি বললেন— "হ্যা।" তারপর আবার বললেন— "যা বলছিলাম। শুক্র অনেক সময় মা-র শরীরে প্রবেশ করে। প্রাণীদের শরীরের ভেতরটায় জোলো আবহাওয়া। সেখানে ডিম্বের নরম খোলসের মধ্যে শুক্র গিয়ে মেলে। তারপর দু'রকমের ডিম তার থেকে সৃষ্টি হতে পারে। একরকমের হ'ল শক্ত খোলসের ডিম। যেমন— সাপদের, কুমিরের, কচ্ছপের, পাখিদের জন্মায়। আর-একরকম ডিম আছে যারা শরীরের মধ্যে বড় হতে থাকে। যেমন— মানুষের ভ্রূণ। যেমন— স্তন্যপায়ীদের মধ্যে। ডিম যতদিন ডিম হিসাবে থাকে, যতদিন-না সে ফুটে বার হয় ততদিন সে ডিমের বাইরে থেকে পুষ্টি নিতে পারে না। ভ্রূণ কিন্তু মা-র শরীরের থেকে নিজের শরীরে পুষ্টি আহরণ করে। জন্মাবার পরও সে মা-র শরীর থেকে দুধ খেয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ডিম পাড়লেও কিন্তু ডিমের মধ্যে মা-র শরীরের থেকে খাবারের জোগান দিয়ে রাখতে হয়। সেইজন্য সৃষ্টিতত্ত্বে বাবার থেকে মা-র দায়িত্ব বেশি এবং সেটা পূরণ করবার জন্য তার শরীর বাবার শরীরের থেকে কিছুটা বড় হবার প্রয়োজন পড়ে। আর যাদের ভ্রূণ জন্মায়, তারা তো নিজের পুষ্টি দিয়ে ভ্রূণকে বৃদ্ধি পাওয়ায়। তাদের শরীর বাবার শরীরের থেকে নিশ্চয়ই বড় হওয়া প্রয়োজন। স্তন্যপায়ীদের বাচ্চারা ডিমে-ফোটা বাচ্চা থেকে বেশি উন্নত। ডিমের শক্ত খোলার মধ্যে বাচ্চাটা বেশি বাড়তে পারে না। কারণ, তাহলে ডিমগুলো হয়ে যেত অসম্ভব ভারী। মা-র পক্ষে সে-সব ভারী ডিম দেওয়া সম্ভব না। চামড়ার মধ্যে থাকে ভ্রূণ। চামড়া ইচ্ছে মতো বড় হতে পারে। তাই চামড়ার মধ্যে একটা বাচ্চা বাড়তে পারে অনেকখানি, প্রসব করাটা যতক্ষণ না খুব কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। সেইজন্য স্তন্যপায়ীদের বাচ্চারা উন্নত মানের।" বড়মাসি বললেন — "এ-প্রসঙ্গে একটা কথা বলি : মা-র শরীরের মধ্যে সরাসরি শুক্র চালান করবার জন্য দরকার হয় পুরুষাঙ্গের। সরীসৃপদের মধ্যে

পুরুষাঙ্গের প্রথম প্রবর্তন হয়। শুধু এক রকমের সরীসৃপ আছে যার নাম টুয়াটারা— যাদের পুরুষাঙ্গ নেই। তবে টুয়াটারা অনেক ব্যাপারেই খুব পুরোনো কালের সরীসৃপ। তা ছাড়াও বেশির ভাগ পাখিরই পুরুষাঙ্গ নেই।"

বড়মাসি আরও বললেন— "এখন প্রশ্ন হ'ল যে সৃষ্টি-জগতে বেশির ভাগই বাচ্চার বৃদ্ধির দায়িত্ব মা-র ওপর ন্যস্ত থাকে। তা সত্ত্বেও কেন কখনও-কখনও পুরুষ-প্রাণী নারী-প্রাণীর থেকে বড় হয়? কী করে বাঘ-বাঘিনী থেকে বড় হয়? সিংহ সিংহীর থেকে বড় হয়?"

টুটুল বলল — "কেন?"

বড়মাসি বললেন— "তাই এবার তোমাদের প্রকৃতির যেগুলো সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য সেগুলোর কথা বলবো। প্রকৃতি কী চায়? সে চায় যে একটা প্রাণী বেঁচে থাকুক। এইজন্য প্রাণীটাকে খেতে হবে। শত্রু থেকে পালাতে হবে। তাছাড়া প্রকৃতি চায় প্রাণীটার উত্তরপুরুষের সৃষ্টি হোক। অর্থাৎ কিনা, এক পুরুষ থেকে আরেক পুরুষ প্রাণীটা টিঁকে থাকুক। এখন দ্যাখো, প্রথমটা করবার জন্য প্রাণীটার কী-কী দরকার। তার দরকার শরীর। যে-শরীরটাতে থাকবে তার নাক, চোখ, কান, ইত্যাদি—যার থেকে তার খাদ্য আর শত্রুর খবর সে পাবে। তাছাড়া তার থাকবে একটা হাঁ-মুখ, যেটা দিয়ে সে খাদ্য শরীরে পরিবেষণ করবে, অর্থাৎ তার লাগবে একটা মুখ! তাছাড়া তার দরকার একটা পেট— যেখানে সে খাদ্য হজম করবে। আর লাগবে দুটো হাত— যা দিয়ে সে খাদ্য সংগ্রহ করবে। আর লাগবে দুটো পা— যা চালিয়ে সে চলাফেরা, পালিয়ে যাওয়া, ইত্যাদি করবে।"

বড়মাসি বললেন— "অবশ্য বেশিরভাগ প্রাণীরই হাত নেই। তারা মুখে ধরে খায় কিংবা পায়ে ধরে খায়। সেসব কূট কথা এখন থাক। বেঁচে থাকার জন্য প্রাণীটার চাই একটা সুস্থ শরীর।

"তাছাড়াও প্রকৃতির আর-একটা গতি কি? না, প্রকৃতি চায় উত্তরপুরুষের সৃষ্টি হোক। উত্তরপুরুষ-সৃষ্টির ব্যাপারটা একটু ভেবে বোঝাবার বিষয়।" বড়মাসি বললেন— "বাঙালীদের পুরুষদের হয়তো বিশ্বাস করানো যাবে না, কিন্তু প্রাণীজগতে উত্তরপুরুষের জন্ম দেবার জন্য কোন্ নারী কোন্ পুরুষকে বরণ করবে সেটার সম্পূর্ণ সুযোগ নারীর ওপর ন্যস্ত।"

টুটুল বলল— "কেন তুমি এভাবে বাঙালীদের নিন্দে করো মা? এ-দেশেও কি ছেলেরা এটা সহজে মেনে নেবে? বেশির ভাগ দেশের ছেলেরাই পুরুষকেন্দ্রিক। সহজে মানতে চায় না যে নারীদের কত-সুবিধা প্রকৃতিগতভাবে বর্তমান।"

বড়মাসি একটু থতিয়ে গেলেন। তারপর বললেন— "যাক, এসব তর্ক বাদ দেওয়া যাক। তোমার আমার মতের মিল হবে না। তুমি আমাদেব দেশে থাকো নি। তুমি কিছুই জানো না।"

টুটুল বলল— "তাহলে আমিও বলবো যে তুমি এদেশে বিয়ের পর এসেছো। কিছুই বোঝো না।"

তারপরই টুটুল আবার বলল— "যাক। ওসব তর্ক থাক।"

বড়মাসি বলতে থাকলেন— "যারা ডিম্ব শুক্র বাইরে ত্যাগ করে তাদের কথা থাক। যদিও আগেই বলেছি ডিম্বে থাকে আহার। তা ছাড়াও অনেক সময় মা ডিম্ব ত্যাগ করার পরও তার রক্ষণাবেক্ষণ করে। আর মাছদের মধ্যে কিংবা উভচরদের, এমনকি সরীসৃপদের মধ্যে, অনেক সময় ডিম না দিয়ে বাচ্চার জন্ম হয়। যেমন— মাছদের মধ্যে হাঙর, গাপ্পি (Guppy), সামুদ্রিক ঘোড়া (Sea horses) কিংবা উভচরদের মধ্যে স্যালামাণ্ডার, কয়েক রকমের ব্যাঙ, সাপদের মধ্যে স্কিংক (skink), কিংবা র‍্যাট্‌ল স্নেইক (Rattle snake)। কিছু প্রাণীর মধ্যে মা-র শরীর বড় হওয়া দরকার। কিন্তু আরেক রকমের প্রাণী আছে যাদের মধ্যে শুক্র মা-র শরীরে প্রবেশ করাতে হয় ডিম্বের সঙ্গে মিলন হবার জন্য। যেমন— সরীসৃপ, পাখি, স্তন্যপায়ী। এদের মধ্যে তার মানে উত্তরপুরুষ জন্ম দেওয়ার জন্য কোন্ নারী কোন্ পুরুষ গ্রহণ করবে তার সবটুকু দায়িত্বই বর্তায় মেয়েদের ওপর।

"এখন ধরো, যখন একটি নারী একটি পুরুষকে গ্রহণ করবে তখন এমন হতে পারে যে দূর-দূরান্তের মধ্যে সচরাচর সেই জাতের পুরুষ সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। ধরো মাছদের কথা বলছি, সমুদ্রের গভীর নিচে, মাইলের পর মাইল জায়গা জুড়ে একটি কিংবা দুটি পুরুষ হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে। সমুদ্রের খুব গভীরে খাবারের অসম্ভব অকুলান, খাবার নেই বলে প্রাণীসংখ্যাও কম। সেখানে সহজে একটি নারীকে পুরুষরাও খুঁজে পাবে না। তেমনই একটি নারীও সহজে একটি কি দুটির বেশি পুরুষ খুঁজে পাবে না৷ সেখানে এই নারীটি যাতে

ওদের মধ্যে একজন পুরুষকে গ্রহণ করে তার জন্য পুরুষদের নিজেদের মধ্যে খুব বেশি প্রতিযোগিতা করতে হয় না। এই রকমটা অনেক সময় গভীর জঙ্গলে, কিংবা বিরাট মরুভূমিতে, কিংবা ঠাণ্ডা শীতের জায়গায় ঘটে থাকে। খাবার অকুলান হলে প্রাণীসংখ্যা কম। সেখানে পুরুষদের মধ্যে নারী সংগ্রহ করার প্রতিযোগিতা হয়তো কম। এরকম একটা জায়গায় একটি পুরুষ প্রাণীর শরীর কীরকমভাবে অনেকসময় ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে যায় তার একটা নমুনা হিসাবে বড়শী মাছ[৬৪] (Angler fish)-এর কথা বলি।' —বলে বড়মাসি বড়শী-মাছের গল্প বললেন। বললেন—"উত্তরপুরুষের জন্মের জন্য দরকার শুক্রকোষ সরবরাহ করা। এটা পুরুষদের কাজ। শুক্রকোষ হচ্ছে এমন একটা মোড়ক যাতে ডি এন এ থাকে। ডি এন এ সম্বন্ধে এখন বিস্তারিত বলবো না। শুধু এইটুকু বলবো যে এতে থাকে আমার শারীরিক আর মানসিক অনেক গুণাবলি যেটা আমি উত্তরপুরুষকে দিয়ে যেতে পারি। আমার উত্তরপুরুষের জন্ম মানে হচ্ছে, আমার শরীরের প্রতিটি কোষের কিছু না কিছু, তা যত সামান্যই হোক না কেন, আমার উত্তরপুরুষের মধ্যে বর্তমান থেকে যাচ্ছে। আমি অমর হয়ে থাকছি। আমার মা-র শরীরের আদ্ধেক ডি এন এ আমার শরীরে থাকবে। তার নাতনী টুটুলের শরীরেও থাকবে তার চতুর্থাংশ। টুটুলের সন্তানের মধ্যেও থাকবে। যদিও কমে যাবে। যা-ই হোক, শুক্র হচ্ছে শুধুমাত্র ডি এন এ-র মোড়ক। শুক্র সরবরাহ করতে শরীর বড় হবার দরকার নেই। কারণ ডি এন এ-গুলি অসম্ভব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। তাহলে পুরুষ-প্রাণীর শরীর বড় হয় নিজে বেঁচে-বর্তে থাকার জন্য। খাবার খুঁজে বেড়ানোর জন্য। শত্রু থেকে আত্ম-রক্ষার জন্য। তাছাড়াও আর-একটা কারণে পুরুষ-প্রাণীর শরীর বড় হবার প্রয়োজন। সেটা হচ্ছে পুরুষদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে নারীর মন হরণ করে উত্তরপুরুষের জন্ম দেবার জন্য। প্রতি-যোগিতার ব্যাপারটা এখন থাক। পরে বলবো। আগে বলি বড়শী-মাছের কথা।

"বড়শী-মাছ থাকে সমুদ্রের গভীর অতলে। মেয়ে বড়শী-মাছ সমুদ্রের গভীর নিচে ঘাপটি মেরে বসে থাকে। তিন থেকে দশ হাজার ফুট অতল অন্ধকারে চুপ করে বসে পুরুষ-মাছের জন্য অপেক্ষা করে সে। এ-রকম জায়গায় খাবারের ভীষণ অভাব। মেয়ে-মাছের নাকের কাছে

একটা কাঁটা গজায়। দেখতে হয় ঠিক বড়শীর মতো। এত হুবহু দেখতে যে বড়শীর সামনে একটা নকল হাড়ের টোপের মতো মাছও ঝোলে। সে যা-ই হোক, পুরুষ-মাছ বহু খুঁজে খুঁজে যখন একটি নারী-মাছ দেখতে পায়, তখন সে বেশ ভালোভাবে জানে যে আবার নতুন করে অন্য আর-একবার সে নারী-মাছ না-ও খুঁজে পেতে পারে।" বড়মাসি বললেন— "আমি অবশ্য অবৈজ্ঞানিকের মতো কথা বলছি। মাছেরা এত ভেবেচিন্তে কাজ করে না। কারণগুলো আমরা, বৈজ্ঞানিকরা, মাথা ঘামিয়ে বার করি। মাছেরা কাজ করে প্রকৃতির তাড়নায়। যাক গে, সেকথা। যা বলছিলাম— পুরুষ-মাছ যখন নারী-মাছকে দেখতে পায় তখন ও যাতে করে সমুদ্রের স্রোতে ভেসে না চলে যায় সেজন্য নারী-মাছের শরীরে কামড়িয়ে বসে যায়। ধীরে ধীরে পুরুষ-মাছের ঠোঁট দুটো নারী-মাছের শরীরে মিশে যায়। চোখে দেখে ওকে আর খাবার খুঁজতে হয় না, কিংবা নারী-মাছ খুঁজতে হয় না। তাই কখনও-কখনও ওর চোখ দুটো অবধি নষ্ট হয়ে যায়। পুরুষ-মাছ ঠিক যেমনভাবে বাচ্চারা মা-র শরীর থেকে পুষ্টি আহরণ করে, তেমন করে নারী-মাছের শরীর থেকে পুষ্টি আহরণ করে। পুরুষ-মাছ নারী-মাছের রক্ত নিজের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সরবরাহ করে। হৃদ্‌পিণ্ডটা অবধি নিজেরই থাকে। কিন্তু না-থাকে নিজস্ব রক্ত, না-থাকে খাদ্য হজম করবার জন্য নিজস্ব পাকস্থলী, ইত্যাদি। দাঁতগুলোও ধীরে-ধীরে ওর খসে যায়। যে-ক'টা দাঁত অবশিষ্ট থাকে তা দিয়ে ও শুধু নারী-মাছের শরীরটা কামড়িয়ে ধরে বসে থাকে। ধীরে-ধীরে ওর নিজের শরীরটার আয়তন দশ ভাগের এক ভাগ হয়ে যায়। ওর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য এখন শুধু শুক্র সরবরাহ করা এবং বেঁচে থাকা।"

বড়মাসি বললেন— "বুঝতেই পারছো, শুক্র সররাহ করার জন্য বড় শরীরের দরকার পড়ে না।"

পনেরো

বড়মাসি বললেন— "শরীরের বড় হবার দরকার নিজে বেঁচেবর্তে থাকবার জন্য। দ্বিতীয় কারণে শরীর বড় হবার দরকার যখন বাচ্চার রক্ষণাবেক্ষণ পুরুষকেই করতে হয়। যেমন ধরো, পাখিদের পুরুষদের।

পাখিদের ডিমে তা দিতে হয়। সরাসরি বাচ্চা, যেমন মাছ, কিছু উভচর, কিছু সরীসৃপের মধ্যে হয়, তেমন সরাসরি বাচ্চা কোন পাখিরই হয় না। বাচ্চা গর্ভে নিয়ে উড়তে গেলে শরীর হয়ে যাবে অসম্ভব ভারী। ওরা ডিম পাড়ে। ডিমে তা দিতে হয়। কারণ, পাখিদের রক্ত গরম। ডিমের মধ্যে বাচ্চার রক্ত গরম রাখবার জন্য পাখিদের ডিমে তা দিতে হয়। এ-ব্যাপারে ওরা সরীসৃপের ডিমের থেকে পৃথক। পাখিদের বাচ্চা হবার পর বাচ্চারা খাবার জোগাড় করতে পারে না। খাইয়ে-দাইয়ে তা দিয়ে বাচ্চা বড় করতে হয়। একা মা-র পক্ষে এতটা করা সম্ভব না। বাবা-পাখিকে সাহায্য করতে হয়। সুতরাং নারী-পাখিদের তুলনায় পুরুষ-পাখিদের শরীর খুব ছোট হলে চলে না, বরং উল্টে অনেক সময় বড়ও হয়। কারণ, পুরুষ-পাখিরা নারী সংগ্রহ করবার জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে। তবে প্রতিযোগিতা শুধু শরীরের আয়তন নিয়েই হয় না। রং-বেরঙের পেখম, পালক, গান, এমনকি বাসা নিয়েও হয়। অনেক পাখির মধ্যে পুরুষরা বাসা বানিয়ে নারী-পাখি অর্জন করে।"

বড়মাসি আরও বললেন— "এর পর বলি প্রতিযোগিতার কথা। পৃথিবীটা বড় শক্ত ঠাঁই। এখানে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন কাজ। ডারউইন বলেন— পৃথিবীতে খাদ্য যতটা আছে, সেই তুলনায় প্রাণী জন্মায় অনেক বেশি। এদের বেশির ভাগই মরে যায় অকালে অনাহারে। অনেকে খাদকের মুখে খাদ্য হয়ে প্রাণ হারায়। বেঁচে থাকে মাত্র দু-একটি। সুতরাং এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন স্বাস্থ্য।

"সাধারণত যেসব পাখির ডিম হয় তাদের বৎসরে দু'একবারের বেশি ডিম হয় না। অর্থাৎ কিনা একটা মেয়ে-পাখি জীবনে কতগুলো ডিম দেবে সেটা সংখ্যার হিসেবে সীমিত। আবার যেমন প্রাণী-জীবনে কতগুলো সরাসরি বাচ্চার জন্ম হবে তার সংখ্যাও সীমিত। সেই তুলনাতে পুরুষের শুক্র জন্মায় লাখে লাখে। সৃষ্টিতত্ত্বে বাচ্চা জন্মানোর ব্যাপারে নারীর অবদান (investment) পুরুষের তুলনায় অসম্ভব বেশি। আর সেই কারণে থাকে নারীর হাতে চাবিকাঠি। কোন্ পুরুষ সে বরণ করবে সেটা তার আয়ত্তাধীন। নারী চাইবে, যে-বাচ্চাটার সে এত কষ্টে জন্ম দিল সে বেঁচেবর্তে থাকুক। কিন্তু আগেই বলেছি, পৃথিবী বড় শক্ত ঠাঁই। এখানে বেঁচে থাকা কঠিন। এবং সেই কঠিন কাজ সমাধা করার জন্য চাই স্বাস্থ্য।

সেই কারণে যে-পুরুষ যত স্বাস্থ্যবান্, যার যত বেশি মজবুত শরীর, শরীরের বেশি বল, শরীরে ক্ষিপ্র গতি, সেই পুরুষ নারীর কাছে তত মনোগ্রাহী। এই আর-একটা কারণে পুরুষদের শরীর বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হবার প্রয়োজন। এই কারণে পুরুষদের পেখম, রং, গান, বাসা হয়েছে। এই কারণে পুরুষদের চিত্রবিচিত্র গায়ের চামড়া, অসম্ভব সুন্দর সব শিং হয়েছে। চমৎকার হয়েছে নৃত্যপটুতা। সিংহের কেশর, হাতির দাঁত, এমনকি হরিণের মৃগনাভি অবধি হয়েছে।"

বড়মাসি আরও বললেন—"প্রাণী-জগতে সাধারণত মেয়েরাই বড়। এমনকি স্তন্যপায়ীদের মধ্যেও। যেমন ধরো, খরগোশ, চামচিকে, তিন প্রকারের তিমি মাছ, অনেক রকমের সীল মাছ, দু'রকমের হরিণ-জাতীয় অ্যানটিলোপ (antilope)। তিমি মাছ পৃথিবীতে খুব বড় প্রাণী। সব থেকে বড় প্রাণী পৃথিবীর নীল তিমি মাছদের মধ্যে নারীরা প্রায়শই পুরুষের থেকে বড় হয়। তাই পৃথিবীতে সব থেকে বড় প্রাণী যে, সে নারী। প্রায় একশো ফুট লম্বা নারী-তিমি পাওয়া গিয়েছে। নিচু পর্যায়ের প্রাণীদের মধ্যে, অর্থাৎ, মাছ, কীট, পতঙ্গের মধ্যে তো কথাই নেই। নারীরাই বেশি বড়। স্তন্যপায়ীদের থেকে কিংবা এমনকি পাখিদের থেকেও নিচুস্তরের প্রাণীই সংখ্যায় বেশি হয়। সুতরাং নারীরা সংখ্যাতেও বৃহদাকার।"

বড়মাসি আরও বললেন—"প্রতিযোগিতার কথা যখন বলছি, তখন প্রাণী-জগতের জুটির কথাও বলা উচিত। জুটি কেমন হবে, অর্থাৎ এক পুরুষ এক নারী জুটি, এক পুরুষ বহু নারী জুটি, কিংবা এক নারী বহু পুরুষ জুটি— সেটাও এই সঙ্গে বলা চলে। কারণ প্রতিযোগিতা হচ্ছে উত্তরপুরুষের জন্মের জন্য। জুটিটা কার কিরকম হবে, তার ওপর উত্তর-পুরুষ কত সংখ্যায় হবে, কিরকম হবে, তা নির্ভর করে।

"জুটি কেমন হবে, সেটা প্রাণীজগতে একটা বিরাট প্রশ্ন। এই প্রশ্নের সম্পূর্ণ জবাব আমরা এখনও জানি না। কিছুটা আঁচ করতে পারি অবশ্য। একথা বাচ্চা কতটা অসহায় অবস্থাতে জন্মায়, তাকে মানুষ করতে কার দায়িত্ব, মা-র না বাবার, সেটার ওপর অনেক সময় জুটি নির্ভর করে। যেমন ধরো, পাখি। বাচ্চাটাকে বড় করতে এদের মা-বাবা দু'জনকেই পরিশ্রম করতে হয়। পাখিরা সাধারণত এক-নারী এক-পুরুষ জুটি নব্বই শতক পাখির মধ্যেই এটা ঘটে। কিছু না হোক,

অন্তত এক ঋতুর জন্যও ওরা এক-নারী এক-পুরুষ জুটি। নয়তো ওদের বাচ্চারা বাঁচবে না।

"ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। যেমন ধরো, কমলা রঙের মধু-নির্দেশক পাখি (orange rumped honey guide)। এই পাখিরা মৌচাকের মধু পান করে জীবনধারণ করে। পাহাড়ের গায়ে-গায়ে কোথায় মৌচাক ঝুলছে, তা এসব পুরুষ-পাখিরা খুঁজে বের করে। তারপর সে যায় একটি ভাল্লুকের খোঁজে। ভাল্লুক এসব পাখি দেখলেই তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলতে শুরু করে। পাখি ভাল্লুককে রাস্তা দেখিয়ে মৌচাকের কাছে নিয়ে আসে। ভাল্লুক মৌচাক ভেঙে মধু খেয়ে মৌচাক ফেলে দিয়ে চলে যায়। কিন্তু তখনও মৌচাকে যেটুকু মধু অবশিষ্ট থেকে যায়, এই পাখির পক্ষে তা পর্যাপ্ত। মধু হচ্ছে এমন একটি আহার যা সম্পূর্ণভাবে শক্তি-দায়ক। এত শক্তির জোগান কম খাদ্যই দিয়ে থাকে। যে পুরুষ-পাখিটি মৌচাকটির প্রভুত্ব পায়, দলে-দলে নারী-পাখি সেই পুরুষটির কাছে আসে। মৌচাক ঘিরে অপেক্ষা করে। তারা চায় তাদের সন্তান ঐ মধু-ভাণ্ডারের ওপর নির্ভর করে জন্মগ্রহণ করুক। সন্তানরা খাদ্য পাবে অনেক পরিমাণে। ফলে এসব পাখির মৌচাক আয়ত্তে থাকলে হয় এক-পুরুষ বহু-নারীর জুটি। খাদ্যের ওপর এই জুটি কিংবা উত্তরপুরুষের দেখভালের ওপর এ-জুটি নির্ভর করে। তবুও বলি, পাখিদের মধ্যে এটা মোটামুটি ব্যতিক্রম।

"একজন পুরুষ-গোরিলা একটি স্ত্রী-গোরিলার থেকে আয়তনে প্রায় দ্বিগুণ বড়। পুরুষ-সীল মাছও স্ত্রী-সীল মাছের দ্বিগুণ। ছেলেদের মধ্যে যে সর্ববৃহৎ, সে-ই সাধারণত নারী সংগ্রহ করতে পারে। ফলে হয় কী, যে গোরিলা এবং সীল মাছদের মধ্যে যে পুরুষরা আয়তনে একটু কম বড় সে নারী সংগ্রহ করতে পারে না। সে নিষ্ফল পুরুষ। অন্যদিকে বৃহৎ যে-সব পুরুষ, তাদের আয়ত্তে থাকে বহু নারী। এরা এক-পুরুষ বহু-নারীর জুটি। হারেমে (Harem) যেমন এক-বাদশা বহু-বেগম নিয়ে বিরাজ করেন, তেমন এদেরও হারেম-জুটি। এইরকম হারেম-জুটি হয় হনুমানদের কিংবা বেবুনদের।"

বড়মাসি বললেন—"ধরো, উল্লুক। এরা গভীর জঙ্গলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। উল্লুকরা যে-ধরনের খাবার খায়, তা অনেকটা বড় জায়গা না হলে দু'জনের অকুলান হয়। এদের ছেলেদের মধ্যে

প্রতিযোগিতা নেই। তাই এদের পুরুষ-নারী দু'জনেরই সমান আয়তন। এরা এক-পুরুষ এক-নারী জুটি।

"শিম্পাঞ্জীদের আবার অন্য রকমের জুটি। এদের দলে বহু-পুরুষ বহু-নারী একসঙ্গে থাকে। পুরুষে-পুরুষে এদের মধ্যে মোটেই বেশি প্রতিযোগিতা নেই। তাই নারী নিয়ে তাদের মধ্যে না-আছে ঝগড়া, না-আছে বিবাদ। সেই তুলনায় বেবুনদের পুরুষদের মধ্যে অসম্ভব বেশি ঝগড়া থাকে। শিম্পাঞ্জী-নারীদের যখন গর্ভ-সম্ভাবনার সময় আসে, পুরুষরা তখন দল বেঁধে প্রার্থী হয়ে এসে দাঁড়ায়। নারীও তাদের একের পর এক গ্রহণ করে। কাউকেই সাধারণত প্রত্যাখ্যান করে না, যতক্ষণ না পুরুষটি তার নিজের ভাই কিংবা ছেলে হয়। যে-বাচ্চাটা জন্মালো সেটা কোন্ বাবার, তা নিয়ে পুরুষ-শিম্পাঞ্জীরা মাথা ঘামায় না। হয়তো ঐ কারণেই ওদের দলের ছেলেরা মেয়েদের থেকে মোটে কুড়ি শতক বড় হয়।"

আমি বললাম—"মেজোমেসো বলছিলেন লুসির থেকে তখনকার কালের মানুষবৎ-এর পুরুষরা মনে হয় অনেকটা বড়।[৬৪] তার মানে কি যে মানুষবৎদের মধ্যেও ঐরকম বহু-পুরুষ এক-নারীর জুটি ছিল? নাকি তখনকার পুরুষরা মেয়েদের থেকে বিশ শতক বড় ছিল — যেমন আজকালকার মানুষদের মধ্যে!"

বড়মাসি বললেন— "জীব-জগতে মানুষকে পারত-পক্ষে অন্যান্য প্রাণীদের সঙ্গে সহজে তুলনা করা আমার সমুচিত মনে হয় না। মানুষদের মধ্যে বাচ্চা মানুষ করা ব্যাপারটা এমন একটা জিনিস যে, এর তুলনা আর জীব-জগতে বেশি নেই। মানুষের মতো বড় শৈশব খুব কম জীব-জানোয়ারেরা আছে। আর মানুষের মতো অসহায় শৈশবও অন্য প্রাণীদের মধ্যে নেই। শিম্পাঞ্জীর মতো সাবালক বাচ্চা মানুষের কোথায়? আমার ধারণা, পাখিদের সঙ্গে এ-ব্যাপারে মানুষের হয়তো মিল থাকা উচিত। তবে খাদ্যের ওপরও ব্যাপারটা অনেকটা নির্ভরশীল। যে-পুরুষের টাকা আছে, তার হয়তো বহু-নারী সংগ্রহ করা সম্ভব। তিব্বতে শুনেছি এক-নারী বহু-পুরুষের জুটি কখনও-কখনও হয়। আমার জানতে ইচ্ছে করে যে ওখানে কি ছেলেদের বদলে মেয়েরা বাপ মা-র টাকার উত্তরাধিকারী হয়? কে জানে! তবে সভ্য মানুষদের মধ্যে না-হয় টাকা জমি বাড়ির ব্যাপার আছে। আগেকার কালে কী হ'ত কে জানে!

হয়তো পুরুষরা বৃহদাকার না হলে নারীরা তাদের গ্রহণ করতো না। আর হয়তো সেই কারণেই মানুষদের মধ্যে পুরুষদের প্রতিযোগিতা করতে হয়েছিল এবং এর ফলে পুরুষ-মানুষ নারী-মানুষের থেকে আয়তনে বড় ছিল। তবে এখন তো মানুষ আর শুধুমাত্র প্রকৃতিগত নেই। মানুষ এখন কৃষ্টিগত জীব। সুতরাং এখন তার জুটির কথা সম্পূর্ণ পৃথক।”

আমি বললাম—“কৃষ্টিগত ব্যাপারটা কি ?”

বড়মাসি বললেন— “মানুষের বাচ্চারা যখন জন্মায় তখন তাদের মগজটার পূর্ণ বৃদ্ধি হয় নি। তার মগজের বৃদ্ধি চলে শৈশব জুড়ে। এই সময় সে তার বাড়ির, পাড়ার, গ্রামের, দেশের সব গোষ্ঠী থেকে জ্ঞান আহরণ করে। এটাকে বলে কৃষ্টিগত শিক্ষা। এ-সম্বন্ধে বলতে গেলে অনেক কথা বলা দরকার। থাক, ও-আলোচনায় প্রবেশ না করাই উচিত।”

বড়মাসি আবার বললেন— “বরং একটা দরকারী কথা বলি। জীব-জগতে নারীর পক্ষে অসম্ভব প্রয়োজনীয় জানা যে, যে-পুরুষটিকে সে গ্রহণ করছে সে তার বাচ্চার যত্নআত্তি ভালোভাবে করবে কি না। এটা বিশেষ করে পাখিদের মধ্যে খুব প্রয়োজনীয়। অনেক ঠাণ্ডার দেশে বৎসরের শুধু কয়েকটা মাস খাদ্যের প্রাচুর্য থাকে। সেই ঋতু যদি বিফলে যায় তবে বাচ্চার বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব না। সুতরাং পাখিদের মধ্যে নারী-পাখি খুব যাচাই করে পুরুষ-পাখি নির্বাচন করে। বাজিয়ে-বাজিয়ে সে পুরুষ-পাখির স্বাস্থ্য যাচাই করে। যাচাই করে পুরুষ-পাখি তার বাচ্চাদের দেখভাল করবে কি না। সেই কারণে অনেক জীবের মধ্যে, বিশেষ করে পাখিদের মধ্যে, পূর্বরাগ একটা খুব প্রয়োজনীয় জিনিস। অসহায় শৈশবাবস্থা আর খাদ্যের অকুলান— দু'অবস্থাতেই পূর্বরাগের প্রয়োজন। তাছাড়াও পূর্বরাগের মাধ্যমে পুরুষ যাচাই করে নেয় যে, নারীরও ইতিমধ্যে গর্ভসঞ্চার হয়েছে কি না। সেই কারণে পূর্বরাগ চলে অনেক সময় ধরে।

পনেরো

বড়মাসি বললেন— “জীব-জগতের আর-একটা দরকারী কথা বলি। সেটা হচ্ছে যে, এমন কোনও সন্দেহ থাকে না যাতে করে নারী প্রাণীর

উত্তরপুরুষ জন্মাবে না। অর্থাৎ কিনা, যতই কুৎসিত, অস্বাস্থ্যবতী, বিকলাঙ্গ হোক না কেন সেই নারী-প্রাণী, তার পুরুষসঙ্গী একটা না একটা জুটবেই। তার উত্তরপুরুষের জন্ম হবেই হবে। কারণ সৃষ্টির খেলাতে নারীর অবদান সর্বদাই প্রায় পুরুষদের থেকে বেশি। সুতরাং, এই অসম উদ্যোগে নারীর সঙ্গী জুটবেই জুটবে।"

বড়মাসি বললেন— "সেই কারণে, ধরো, আমি একটা স্তন্যপায়ী। অর্থাৎ কিনা আমি একটা প্রকৃতিগত প্রাণী। কৃষ্টিগত প্রাণী না। এখন ধরো, আমার যদি একটা মেয়ে জন্মায়, আমি জানবো যে, সে পুরুষ সংগ্রহ করতে পারবেই পারবে। অর্থাৎ কিনা তার উত্তরপুরুষের সৃষ্টি হবেই হবে। সে-ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ হতে পারি। আমি আগেই বলেছি যে, উত্তরপুরুষের জন্ম প্রকৃতির একটা বড় উদ্দেশ্য। প্রকৃতির সেই উদ্দেশ্য যতবার মেয়ের জন্ম হবে, ততবার পূরণ হবে। এবার ধরো, একটা বনমানুষের কথা বলি। সে একটি নারী-বনমানুষ এবং তার স্বভাব খুব ভীত, সন্ত্রস্ত। সে সর্বদা ঘাবড়িয়ে থাকে, দলের সবাই তাকে যখন যা খুশি অপমান করছে। এ হেন মায়ের সাধারণত দেখা যায় যে মেয়ে-বাচ্চা জন্মায় বেশি। এর কারণ নিয়ে কিছু-কিছু গবেষণা হয়েছে। প্রথমত বলা হয়, এসব ধরনের দলে হীনস্থানের বনমানুষের বাচ্চারাও মা-র কাছ থেকে ঐরকমের ভীত-সন্ত্রস্ত স্বভাবের উত্তরাধিকারী হবে। অর্থাৎ কিনা, ওর স্থানও দলে হীন হবে মা-র মতো। এখন এই বাচ্চাটা যদি ছেলে হ'ত, তবে সেই হীনস্থানের ছেলেটার পক্ষে নারী সংগ্রহ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াতো। ফলে, উত্তরপুরুষ-এর জন্ম ওখানেই থেমে যেত। কিন্তু বাচ্চাটা যদি নারী-সন্তান হয় তবে যতই না কেন সে হীনস্থানের হোক, তার পুরুষ জুটবেই জুটবে। এবং উত্তরপুরুষ জন্মাবেই জন্মাবে। বাঁদর আর বনমানুষের মধ্যে সেইজন্য বিশেষ করে দেখা যায় যে, হীনস্থান নারীদের বেশির ভাগ সময় নারী-সন্তান হয়। কারণ, ভ্রূণ হিসাবে পুরুষ ভ্রূণ অনেক সহজে গর্ভচ্যুত হয়। প্রাণীজগতে ভ্রূণ কিংবা সন্তান হিসাবে সর্বদাই পুরুষ নারী অপেক্ষা অনেক কমজোরি হয়। সহজেই গর্ভচ্যুত হয়ে যায়। ভীত-সন্ত্রস্ত মা এত চিন্তিত থাকে, ঘাবড়িয়ে থাকে, যে সে সহজে পুরুষ-সন্তান গর্ভে বেশি দিন বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। সুতরাং তার নারী-সন্তান বেশি জন্মায় এবং এতে করে প্রকৃতিরও উত্তরপুরুষের পরম্পরা রক্ষিত হয়।"

বড়মাসি আরও বললেন— "একটা কথা আমাদের মনে রাখার প্রয়োজন। উত্তরপুরুষের যখন জন্ম দেওয়াটাই উদ্দেশ্য, এটার মানে হ'ল প্রাণীটার নিজের উত্তরপুরুষের জন্ম দেওয়াটা বিবর্তনের উদ্দেশ্য। দলের যে কারো উত্তরপুরুষ জন্মাক, এটা তার উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং শিম্পাঞ্জী জুটির ব্যাপারটা ঠিক কেন হয় সর্বদা সেটা বোঝা যায় না। নয়তো হনুমানদের মধ্যে যদি একটা পুরুষ-হনুমান অন্য আর-একটা পুরুষ-হনুমানকে যুদ্ধে হারিয়ে তার হারেমটা দখল করতে পারে তখন দেখা যায় যে দলের যতগুলো ছেলে বাচ্চা আছে তাদের সবাইকে সে হত্যা করে মেরে ফেলে। কারণ, ও চাইবে না যে অন্য পুরুষের উত্তরপুরুষের ও রক্ষণাবেক্ষণ করুক।

"অনেকে বলেন যে এটা যদি হবে, তবে, যে-যে প্রাণী দলবেঁধে কিংবা ঝাঁকবেঁধে থাকে তাদের এক রকমের ব্যবহারের কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। ধরো, একদল হরিণ চরে বেড়াচ্ছে। ধরো, একটা সিংহ সেখানে এল। দলের মধ্যে যে-হরিণটা ওকে আগে দেখতে পেয়ে জানান দেবে, সিংহের সেটার দিকেই প্রথম দৃষ্টি পড়বে। আর সেটাই প্রথমে প্রাণ হারাবে। তিতিরদের বেলাতেও তাই। ঝাঁকের যে-তিতিরটা প্রথম শিয়ালটিকে দেখতে পাবে, সেটাই যমালয়ে যাবে আগে। এখন প্রশ্ন হ'ল, নিজের উত্তরপুরুষ বাঁচিয়ে রাখারই যদি প্রকৃতির উদ্দেশ্য হয়, তবে এই হরিণটা কিংবা এই তিতিরটি দলকে জানান দেবে কেন? এর উত্তর পাওয়া কঠিন। তবে অনেকে বলেন, যে দলে কিংবা ঝাঁকে আসলে থাকে নিজেদের স্বগোত্রীয় সবাই। তাদের মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে আমার নিজেরই ডি এন এ। যেমন আমার মা, বাবা, দুই বোন, বুবলা, স্বর্ণ, সবাইকার মধ্যে আছে আমার অনেকটা ডি এন এ। এরা সবাই মিলে বাঁচা আমার একার বাঁচার থেকে বড় কথা। কারণ, এদের সবাইকার যোগফল ডি এন এ, আমার নিজের সন্তানের ডি এন এ-এর থেকে অধিক। তবে ডি এন এ-এর কথা না জানলে এ-খবরটা হৃদয়ঙ্গম হবে না জানি। সে-কথা এখন থাক।"

বড়মাসি বললেন— "সব শেষে একটা কথা বলবো। সেটাও প্রাণী-জগতের খুব মূল্যবান সংবাদ। প্রাণীদের মধ্যে নিকট-আত্মীয়দের মিলনে বাচ্চা বিকলাঙ্গ হয়। অস্বাস্থ্যবান, কমজোরি, বিকলাঙ্গ বাচ্চা যাতে না হয় তার জন্য প্রাণীজগতে কতকগুলো প্রচলিত নিয়ম আছে। দল

থেকে তারা হয় ছেলেকে, নয় মেয়েকে বিতাড়িত করে। তারা গিয়ে অন্য দল হয় তৈরি করে, নয়তো অন্যদলের দলভুক্ত হয়। একটা পুরুষ-গোরিলা যেদিন থেকে কৈশোর-প্রাপ্ত হয়, ওকে দলের সবাই দল থেকে বহিষ্কৃত করে দেয়। সে কিছুদিন বাইরে-বাইরে দলের সঙ্গেই ঘুরতে চেষ্টা করে। দলের নেতা ওকে দেখলেই আক্রমণ করে। ক্রমে ক্রমে ছেলেটি বাইরে গিয়ে তৈরি করতে চেষ্টা করে একটি নতুন দল। কয়েকটি নারী সংগ্রহ করে। এই নারীদের মধ্যে তার রক্তের সম্পর্কের কোন নারী থাকা সম্ভব না। সুতরাং, এবার বাচ্চা কমজোরি কিংবা বিকলাঙ্গ হবার ভয় নেই। দল তৈরি করতে না পারলে সে হবে নিষ্ফল পুরুষ।

"আবার আরেক রকমের দল আছে। সেখান থেকে নারী বহিষ্কৃত করা হয়। যেমন— শিম্পাঞ্জী। ওদের মেয়েদের অন্য দলে গিয়ে যোগ দিতে হয়।"

আমি বললাম— "আর মানুষদের মধ্যে? আমি বিয়ে করলে আমাকে শিম্পাঞ্জীর মতো দল ছেড়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু যদি আমি মেঘালয়ের মেয়ে হতাম, তো ওদের মধ্যে পুরুষদের দলের বহিষ্কৃত করা হয়। মেয়েদের বাড়িতে এসে স্বামীরা বাস করে।"

বড়মাসি বললেন— "আজ এই অবধি।" টুটুল টিপ্পনি কাটলো— "অথ সমাপ্তি।"

ষোলো

সবাই চুপচাপ বসে। এখনও আমরা সেই আগের মতোই বাগানে বসে আছি। অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছে আমরা রেস্টুরেণ্ট থেকে আনা ভোজন সমাপ্ত করেছি। সবাইকারই মন খারাপ। সবাইই অনুভব করছি যে আমার এবার ফিরে যাবার সময় এগিয়ে আসছে। কালই আমরা দু'সপ্তার ছুটিতে শহরের বাইরে বেড়াতে চলে যাব। ফিরে এসেই আমাকে রওনা দিতে হবে লণ্ডন। টিকিটের দিন ধার্য হয়ে গিয়েছে।

বসে-বসে ভাবছিলাম অনেক দিন কলকাতা থেকে চিঠিপত্র পাই নি। কাল চলে গেলে কলকাতা থেকে আরও দু'সপ্তাহ চিঠি পাব না। ফোন পাওয়াও অসম্ভব। দিদা ব্যস্ত মা-র খবরের জন্য, আমি ব্যস্ত ভাইটির

খবরের জন্য। বুকের মধ্যে একটা অজানা আতঙ্ক আমার। একটা গুড়্-গুড়্ ধ্বনি। মন ভরে আছে আমার অভিমানে। কেউ না হোক, অন্তত জ্যাঠাবাবুও তো একটা চিঠি দিতে পারতেন। জ্যাঠাবাবু আমাদের বাড়ির সবচাইতে দায়িত্বশীল লোক। মনটা ধীরে ধীরে ভারাক্রান্ত হয়ে আসছে। আমার জন্য কি কেউ মন খারাপ করছে না? আমি কী ঐ হাওড়ার বাড়ির কেউ নই! আমি থাকলে কিংবা না-থাকলে কী কারও যায় আসে না! এমনকি ঠামারও না?

রাত না জানি কত হ'ল। মধ্যরাত পার হয়ে গিয়েছে। অন্ধকার বাগান ঘিরে ঝাপসা গাছের সারি। ঝিঁঝিঁ ডাকছে। মশার সামান্য গুঞ্জন। খালটার নিচে জোনাকির ভিড়। অন্ধকারে খসখস করে ঘাসের ওপর দিয়ে কী যেন একটা চলে গেল। দেখতে পাওয়া গেল না।

আকাশে একটা বড় চাঁদ। কিন্তু যেন একটা সাদা ঘোমটা টানা। বড়মেসো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কোথায় যেন একটা পাখি ডেকে উঠলো।

একটা সুর। কয়েকটা কলি। বড়মাসি গান গাইছেন। মহাসিন্ধুর ওপার থেকে যেন তরঙ্গ ধ্বনি এসে আমাদের আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। একটার পর একটা গান গেয়ে চললেন বড়মাসি। বড়মেসোর মুখে কথা নেই। উনি শুধু একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যাচ্ছেন। টুটুল বাসনপত্র রাখতে গিয়েছিল রান্নাঘরে। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে মুগ্ধ নয়নে বড়মাসির দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে রইল।

বড়মাসি গাইছেন—"আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি."

সুরের জগৎ এক পৃথক রাজ্য। সে-রাজ্য অনেকে বলেন, আমাদের ছোটখাটো 'সুখদুঃখে দোদুল্যমান জগৎ থেকে পৃথক। সে-জগৎ ঊর্ধ্ব-লোকের। অন্য জগতের। আমরা সবাই যেন ধীরে ধীরে নিম্নভূমি ছেড়ে সৌন্দর্য-জগতে প্রবেশ করছি। চোখ বুজে আধশোয়া বড়মেসো। চোখ-ভরা-জল নিয়ে টুটুল। হাঁটুর ওপর মাথা রাখলাম আমি। বুক ভেঙে কান্না আসছে আমারও। সীমা পেরিয়ে অসীমে এই ক্ষণকালের প্রবেশ, বেদনা মেশানো ভালো লাগা।

রাত যখন অনেকটা হয়েছে টুটুল তখন বড়মাসির গলা জড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলো— "মা, তোমার দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না?"

তখনও ওর গাল দুটি ভেজা।

বড়মাসি ঘাড় নাড়লেন। বললেন, "না, ভারতবর্ষ আমার দেশ না। এটাই আমার দেশ। এখানেই আমি মর্যাদা পেয়েছি। দেশে থাকতে আমরা বড্ড কষ্ট পেয়েছি টুটুল। প্রত্যেক দিনের খাবার জুটবে কিনা সেটা প্রত্যেক দিন জানতাম না। আমি ছিলাম বাড়ির বড় মেয়ে। তোমাদের মেজোমাসি আর আমি চার বৎসরের পিঠোপিঠি। বড় কষ্টে আমাদের মা আমাদের মানুষ করেছেন। আত্মীয়-স্বজন বলে কেউ ছিল না সাহায্য করবার মতো। বড় অপমান সহ্য করে আমরা মানুষ হয়েছি। স্বর্ণর মা তখন সবে কথা বলতে শুরু করেছে। সে-সময়টাতে ভারতবর্ষ দেশটা একটা-না-একটা দুর্দশার মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। প্রথমে যুদ্ধ, তারপর দুর্ভিক্ষ, তারপর হিন্দু-মুসলমানদের দাঙ্গা, তারপর বাস্তুহারার স্রোত। হয়তো অনেকের সঙ্গে তুলনা করলে তবু চাট্টি খেয়ে-পরে আমরা বেঁচে ছিলাম। তবু বড্ড দুর্দশার দিন গিয়েছে। মাকে নিয়ে তিনটি অল্পবয়সী মেয়ে— একজন আর-একজনকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকা।

"যখন বড় হলাম, একটু লম্বা হলাম, সবাই মাকে ভয় দেখাতে শুরু করলো— বিয়ে হবে কি করে? তিন-তিনটে ধাড়ি মেয়ে— বিয়ে দেবে কি করে তুমি? কিন্তু মা আমাদের বলে রেখেছিলেন— ওরা যতই কেন বলুক না, আমি বুকের রক্ত দিয়েও তোমাদের পড়িয়ে যাব। তবে আমরাও ইস্কুলে জলপানি পেতাম। কিন্তু সে ক'টা টাকা? একটা লজেনচুষের দোকানে আমি কাজ করতাম বিকেলবেলা। তোদের মেজো-মাসিও সেখানে চাকরি নিল পরে, তখন ওর মোটে বারো বৎসর বয়স।"

টুটুল বলল—"কিন্তু মা, বেশির ভাগ বাঙালীরাই তো সে-সময় তোমাদের মতনই কষ্ট পেয়েছে। সবাইকারই তখন দুর্দশার দিন গিয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর সবাই কষ্ট করেছে। কিন্তু তারা তো দেশ ছেড়ে দিয়ে আমাদের মতো চলে আসে নি জন্মের মতো।"

বড়মাসি মানলেন না। বললেন—"সে তুই বুঝবি না। আমাদের মা ছিলেন অল্প বয়সের বিধবা। তিনি সুন্দরীও ছিলেন যথেষ্ট। তার ওপরে গরিব হওয়া সত্ত্বেও আমরা হার মানি নি। আমরা ভয় পেয়ে সাত-তাড়াতাড়ি একটা করে বিয়ে করে বসি নি। তাছাড়া পাড়ার সবাইকার থেকে আমরা ছিলাম পৃথক প্রকৃতির। আমাদের পাড়ার

মেয়েরা টিটকিরি দিত যে, আমরা নাকি বড় হয়ে জজ-ম্যাজিস্টর হবো। তারপর আমরাও ছিলাম সুশ্রী সুন্দর। অথচ পাত্রের জন্য দৌড়দৌড়ি, লোকদের হাতে-পায় ধরা— কিছুই করলেন না মা। পরে আমিও মা-র মতো ছোট একটা চাকরি নিলাম ইস্কুলে। তারপর আমার বোনও। অত যে মেধাবী আমরা ছিলাম, দেশে থাকতে আমরা পড়া শেষ করার সুযোগ অবধি পাই নি।"

টুটুল বলল—"কিন্তু তারপর? একদিন দিন পাল্টালো ঠিক ভোজ-বাজির মতো? তাই না?"

বড়মাসি বললেন—"প্রায় তাই। একহাঁটু ধুলো নিয়ে এক মুখ দাড়ি, একটা গরিব না-খেতে-পাওয়া ছেলে, পূর্ববাংলার একটা গ্রাম ছেড়ে আমাদের বাড়ি এসে উঠলো। সে না-বলতে জানে ভালো ভদ্রোচিত বাংলা, না-জানতো সে কোনও আদবকায়দা। এসে মাকে একটা চিঠি দিল সে। মা বললেন—"আরে, তুমি বুঝি মালতিদি-র ছেলে? আমাদের গ্রামের মালতিদি!"

"ছেলেটির চাকরি ছিল না। কিন্তু তবুও মা তার সঙ্গে আমার বিয়ে দিলেন। আমি রোজগার করতাম, ছেলেটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তো। আমাদের অভাবের সংসারে আর-একটি পুষ্যি বাড়লো। কিন্তু এতদিনে আমাদের বাড়িতে একটা পুরুষমানুষ অভিভাবক এসেছে। আমাদের সমাজে একটা স্বীকৃতি এসেছে। কিন্তু কিছুদিন বাদেই ছেলেটি স্কলারশিপ পেয়ে সসম্মানে বিদেশে পড়তে চলে গেল। এমন-কিছু রোজগার-পাতি ছিল না ছেলেটির। আমরা কলকাতাতেই পড়ে রইলাম।

"আবার দুর্দিন শুরু হ'ল। এবার সবাই ভয় দেখাতে শুরু করলো, ছেলেটি আর দেশে ফিরবে না। মেম বিয়ে করেছে নিশ্চয়ই। পাড়ায় পাড়ায় টি-টি পড়ে গেল। আমরা সমস্ত অপমান সহ্য করতে লাগলাম চুপ করে। চাকরি করে যেতে লাগলাম। ওরা বিশ্বাস করতো না যে ছেলেটি আমাদের চিঠিপত্র দেয়। ওরা বলতো যে আমরা মিথ্যে কথা বানিয়ে বলছি। মাথা নিচু করে সমস্ত সহ্য করে যেতাম আমরা। আমরা যে পরনির্ভর না হয়ে আত্মনির্ভর ছিলাম, এর জন্য কেউ আমাদের ক্ষমা করে নি। ওরা বলতো, "মেয়েছেলেদের এত দেমাক কেন? ওদের গুমোর একদিন ভাঙবেই ভাঙবে।

"তারপর ক'বছর বাদে আমাদের তিন বোন আর মা-র জন্য বিদেশ

থেকে জাহাজের টিকিট এল, সঙ্গে কিছু টাকা। ছেলেটি চাকরি শুরু করেছে। উন্নতিও হয়েছে। ওর কাছে গিয়ে থাকতে বলেছে আমাদের। আমরা বিদেশ পাড়ি দিলাম। এবার সবাই বলতে থাকলো সব ছেড়ে-ছুড়ে হারা উদ্দেশ্যে কোথায় যাচ্ছি আমরা। কিছু না হোক, বস্তির বাসা-বাড়িটা তালা দিয়ে বন্ধ করে রেখে দিয়ে যাও। হয়তো ফিরে আসতে হবে। কিন্তু সেদিন থেকে আর আমরা কারও কথায় ফিরেও তাকাই নি। আমাদের ফিরে আসতেও হয় নি।"

টুটুল বলল— "তবু চলো-না মা, আমরা এবার দেশে ফিরে যাই। আমাদের দেশটা তো কত পালটিয়েছে।"

বড়মাসি বললেন—"না। আমার ভয় করে। কী অসম্ভব খেটেছিলাম আমরা। তবুও এক পা-ও এগোতে পারি নি। বাবা মারা যাবার সময় যেই দুর্দশার শুরু হয়েছিল, পালিয়ে আসার সময়ও সেই একই রকম দুর্দশা ছিল। এতটুকুও উন্নতি করতে পারি নি। এদেশে কিন্তু উন্নতি হয়। রীতিমতো চেয়ে দেখতে পাওয়া যায়— এমন উন্নতি!"

টুটুল বলল – এটা একটা রাজনৈতিক আলোচনা তুলে ফেলছো তুমি। কোন্ দেশটা ভালো, কোন্ দেশটা মন্দ। এ-দেশের বিপক্ষে আমিও অনেক কথা তোমাকে বলতে পারি। কিন্তু তুমি তা শুনতে রাজী হবে না।"

বড়মাসি বললেন— "আমি একবার দেশে যাবো মাকে নিয়ে। এক-দমের মতো কিন্তু ফিরে যেতে আমি রাজী নই। তবে তুমি যদি দেশে চলে যাও তো শেষ অবধি আমি কি করবো, সেটা অবশ্য জানি না। তোমাকে ছেড়ে থাকবো কি করে তা আমি জানি না।

বড়মেসো বললেন— "কিন্তু আমি তো ফিরে যেতে চাই টুটুলের সঙ্গে। কলকাতা শহরটা আমার দেশ নয়, সেটা সত্যি। কিন্তু আমার দেশটা তো কবে সই করে দিয়ে দেওয়া হয়েছে অন্য দেশের হাতে। অথচ এই দেশটাকে স্বাধীন করবার জন্য আমার বাবা প্রাণ দিয়েছিলেন স্বাধীনতা-সংগ্রামে। আমার মা পুলিশের অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করে-ছিলেন। কিন্তু শেষ অবধি দেশটাকে নিজের করে রাখতে পারেন নি। পূর্ব-পাকিস্তান হয়ে গেল। তারপর বাংলাদেশ। তবু বলবো বাঙালী আমি। কলকাতা ছাড়া আমার গতি নেই। আমাদের বাঙালীদের আর আস্তানা কোথায় আছে? সেখানেই ফিরে যেতে চাই আমি।

টুটুল যদি সাহস দেয় তো আমারও ফিরতে শখ হয়। অনেক তো রোজগার হ'ল। এবার চলো ফিরে যাই। নিজের দেশে। নিজের স্বস্থানে।"

আবার চুপচাপ আমরা। সব কথা যেন ফুরিয়ে গিয়েছে। সব তর্কের সাঙ্গ হয়েছে। পৃথিবী নীরব হয়ে গিয়েছে। রাত বোধহয় ছুটো। কোথায় যেন একটা গাড়ি থামলো আওয়াজ করে। ব্রেকের ক্রন্দন। দরজার কলিং-বেল। বেজেই চলেছে, বেজেই চলেছে।

কৈ না তো? এ তো টেলিফোন বাজছে। কোথায় যেন টেলিফোনের ঘণ্টা বাজছে? আমাদেরই বাড়ির ঘরের মধ্যে টেলিফোন বাজছে। আমরা বাগান ছেড়ে বাড়িতে ছুটলাম।

টেলিফোন তুলে নিলেন বড়মেসো। হ্যালো? হ্যালো? বড়মেসো শুধু ছু'একটা হ্যাঁ, ছু'একটা না, তারপর বললেন—"পেছন দিকের বাগানে ছিলাম। তাই বাড়িতে পাও নি।" বড়মেসো ফোনটা রেখে দিলেন।

শ্লথ গতিতে বড়মেসো গিয়ে চেয়ারে বসলেন। বললেন—"টুটুল, যাও তো মা। চিঠির বাক্সে একটা চিঠি দিয়ে গিয়েছে সুনন্দারা। ওরা আজই কলকাতা থেকে টরোন্টো ফিরেছে। তোমাদের কাকু একটা চিঠি দিয়েছেন। সুনন্দা নিয়ে এসেছিল। আমাদের বাড়িতে পায় নি। ফোন করে-করেও পাচ্ছে না। জরুরী চিঠি। আমরা কাল চলে যাবো। তাই এত রাত্রে জানিয়েছে যে চিঠিটা ডাক-বাক্সে ফেলে গিয়েছে।"

সত্যিই চিঠি এসে পড়েছিল বাক্সটাতে। কাঁপতে-কাঁপতে খুলে চিঠিটা বার করলাম। চোখের সামনে লেখা অস্পষ্ট। মনে হচ্ছে, চিঠিটা ছুলছে। প্রত্যেকটা শব্দ ছুলছে। প্রত্যেকটা অক্ষর ছুলছে।

কাকু লিখেছেন:

"প্রিয় স্বর্ণ,

আমরা সবাই তোমার চিঠি পেয়েছি। কিন্তু কেউই উত্তর দিতে পারি নি। কারো পক্ষে উত্তর দেওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ, আমাদের বাড়িতে সেই ছুর্ঘটনাটা আবার ঘটেছে। আর ঘটেছে অসম্ভব মারাত্মকভাবে।

"ভাইটি নাকি নির্মলার বৌদিকে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। চুক্তি ছিল বৌদি আমাদের কাছের ইস্কুলে জল তুলে দেবে সব

ছাত্রীদের জন্য। বিনিময়ে তাকে কাপড় বুনতে শেখাবে ওরা। দিনের মধ্যে ছয়-সাত ঘণ্টা তাই বৌদিকে আটকে থাকতে হবে সেখানে। খবরটা পেয়ে নির্মলাদের বাড়িতে শেফালির ওপর কী অত্যাচার শুরু হ'ল সেটা বুঝতেই পারছো। ঝগড়া, অত্যাচার চলল ক'দিন ধরে। তারপর একদিন বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়লো ওদের বাড়ি। সেদিন তোমাদের ওখানে তোমার দিদার জন্মদিন।

"দিনটা আমাদের দেশে ছিল রবিবার। রবিবারের তুপুর। মেজো-বৌদি চান সেরে এসে ফোন করছেন। আমি চান করতে গিয়েছি। দাদারা খেতে বসেছেন। বড়বৌদি আর মা পরিবেষণ করছেন। ভাইটি খেয়ে-দেয়ে উঠে মেজোবৌদির ঘরে পড়তে বসেছিল সবে। এমন সময় চীৎকার। শেফালির আর্তনাদ একটা। 'ভাইটি বাঁচাও আমাকে।' তার পরেই শুনতে পেলাম মেজোবৌদির চীৎকার— 'ভাইটি যেও না।'

"আমি যখন কলঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসি, সিঁড়ির নিচে দেখলাম খানিকটা তারের প্রান্তে পড়ে আছে একটা ছেঁড়া টেলিফোনের হাতল। ওটা উপড়িয়ে তুলে নিয়ে আসা হয়েছে সেখানে।

"শেফালিদের বাড়িতে এসে দেখি একটা বালতি গড়াগড়ি খাচ্ছে উঠোনে। একরাশ কাচা-কাপড় একদিকে। উঠোনময় সাবানের ফেনা। আর তার মধ্যে মাটিতে পড়ে আছে শেফালি। শেফালিকে জড়িয়ে ভাইটি। ভাইটিকে জড়িয়ে মেজোবৌদি। শেফালির স্বামীর হাতে ডাণ্ডা। ওর দেওরের হাতে বেত। আর ওর শ্বশুর চীৎকার করছেন— 'তোমাদের সংসারে আমরা মাথা ঘামাতে যাই না। তুমি ছোকরা বড়লোকের ছেলে বলে কোন্ সাহসে আমার বাড়িতে অশান্তির সৃষ্টি করো।' বারান্দাতে দাঁড়িয়ে নির্মলা আর নির্মলার মা। তু'জনেই কাঁদছিল।

"শেফালির কপাল ফেটে গিয়েছিল। মেজোবৌদির গায়ে আঘাতের চিহ্ন। ভাইটির হাঁটুতে চোট লেগেছিল। দেখে বোঝা যায় নি কতখানি গুরুতর আঘাত সেটা।

আজ ভাইটি এক সপ্তা হাসপাতালে আছে। আমরা সবাই কলকাতা সহর ঘুরে ফ্যাকটার এইট দেওয়া রক্ত খুঁজে পাই নি। ওকে আমাদের নিজের গায়ের টাটকা রক্ত দেওয়া চলেছে। মুখ্যত। অন্য কারও রক্ত ওর চলবে না।

"ভাইটি এখন গুরুতর অবস্থা কাটিয়ে উঠেছে। কিন্তু হাঁটুতে ওর রক্ত

জমে আছে এখনও। ফ্যাকটার এইট দেওয়া রক্ত পাওয়া গেলে ওর হাঁটুতে অস্ত্রোপচার করা হবে। হয়তো তার পর ও কিছুটা হাঁটতেও পারবে। যতদিন অস্ত্রোপচার না হচ্ছে, ততদিন কিছু বলা যাচ্ছে না। কিন্তু ভাইটি এখন সুস্থ— যদিও ওর নাকে নল পরানো আছে খাওয়াবার। একদিকে ড্রিপ চলছে। ক্যাথিটার লাগানো আছে। তবে রক্তপাত বন্ধ হয়েছে। তুমি চিন্তা কোরো না। হঠাৎ করে দেশে ফিরে এসো না। আমি কথা দিচ্ছি যে, যদি দরকার হয়, এবার তোমাকে তক্ষুনি আমরা খবর দেব। নতুন ডাক্তার বলেছেন, কোনও ভয় নেই। তুমি নতুন দেশে গিয়েছো, ভালো করে সে-দেশটা দেখে এসো। আবার বলছি, যদি কোনও ভয়ের আশঙ্কা ঘটে, আমি তক্ষুনি তোমাকে আসতে লিখবো।

আমাদের প্রত্যেকের ভালোবাসা তোমাকে জানাচ্ছি। ইতি

আশীর্বাদক— কাকু